রম্যাণি বীক্ষ্য

৮, মগধ পর্ব

এই লেখকের লেখা

উপন্যাস-রসসিক্ত-ভ্রমণ-কাহিনী

রম্যাণি বীক্ষ্য

১। দক্ষিণ ভারত পর্ব ২। দ্রাবিড় পর্ব ৩। কালিন্দী পর্ব
৪। রাজস্থান পর্ব ৫। সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬। মহারাষ্ট্র পর্ব
৭। উৎকল পর্ব ৮। মগধ পর্ব ৯। উত্তর ভারত পর্ব
১০। হিমালয় পর্ব ১১। কাশ্মীর পর্ব ১২। কামরূপ পর্ব

ছোটদের জন্য

আমাদের দেশ

১। উড়িষ্যা ২। অন্ধ্র ৩। মহিশুর

ভারত-সভ্যতার মর্মকথা

শাশ্বত ভারত

১। দেবতার কথা ২। ঋষির কথা ৩। অসুরের কথা

কয়েকটি উপন্যাস

তপন্? মণিপদ্ম। তুঙ্গভদ্রা। আয় চাঁদ। আরও আলো। মৌন মন।
তারার আলোর প্রদীপখানি। একজন লামা ও মানস সরোবর।

ভ্রমণ-কাহিনীর সংকলন

শতবর্ষের পথযাত্রা

শতাব্দীর অভিযান

মগধ পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২

RAMYANI BEEKSHYA
Magadha Parva
(A Bengali Travelogue)
By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ (পূর্ণাঙ্গ মগধ পর্ব) : ভাদ্র, ১৩৪৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

মুদ্রাকর
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

রম্যাণি বীক্ষ্যের উত্তর ভারত পর্ব প্রকাশের পরে অনেকে অনুযোগ করেছিলেন যে এই গ্রন্থে উত্তর ভারতের কথা অসম্পূর্ণ—বিহার ও উত্তর প্রদেশ এই দুটি রাজ্যের সম্বন্ধেই আরও অনেক কথা বলা উচিত ছিল। বর্তমানে বিহারে বাস করে বিহার ও উত্তর প্রদেশ আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখে আমিও উপলব্ধি করেছি যে এই অনুযোগ অবাস্তর নয়—বিহার ও উত্তর প্রদেশ নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখা উচিত ছিল।

এইবারে এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। উত্তর ভারত পর্বের প্রথমাংশের সঙ্গে নূতন তথ্য সন্নিবেশ করে মগধ পর্ব প্রকাশিত হল। যথা-সময়ে ঐ পর্বের শেষাংশও নূতন ভাবে উত্তর ভারত পর্ব নামেই প্রকাশিত হবে।

৩৫০, অফিসার্স কলোনি
দানাপুর (পাটনা)

গ্রন্থকার

শিক্ষা ণ ইন্দ্র রায় আ

পুরু বিদ্বা ঋচীষম।

অবা নঃ পার্যে ধনে॥

—ঋ. ৮।৯২।৯ ; সা.১৬৪৪

Teach us, God, to win wealth,

Thou Omniscient, adorable with hymns,

Help us in the decisive battle.

—Rigveda, VIII. 92. 9 ; S. 1644

বুদ্ধগয়ার মন্দির। ফটো—লেখক

অনিমেষলোচন মন্দির, বুদ্ধগয়া। ফটো—লেখক
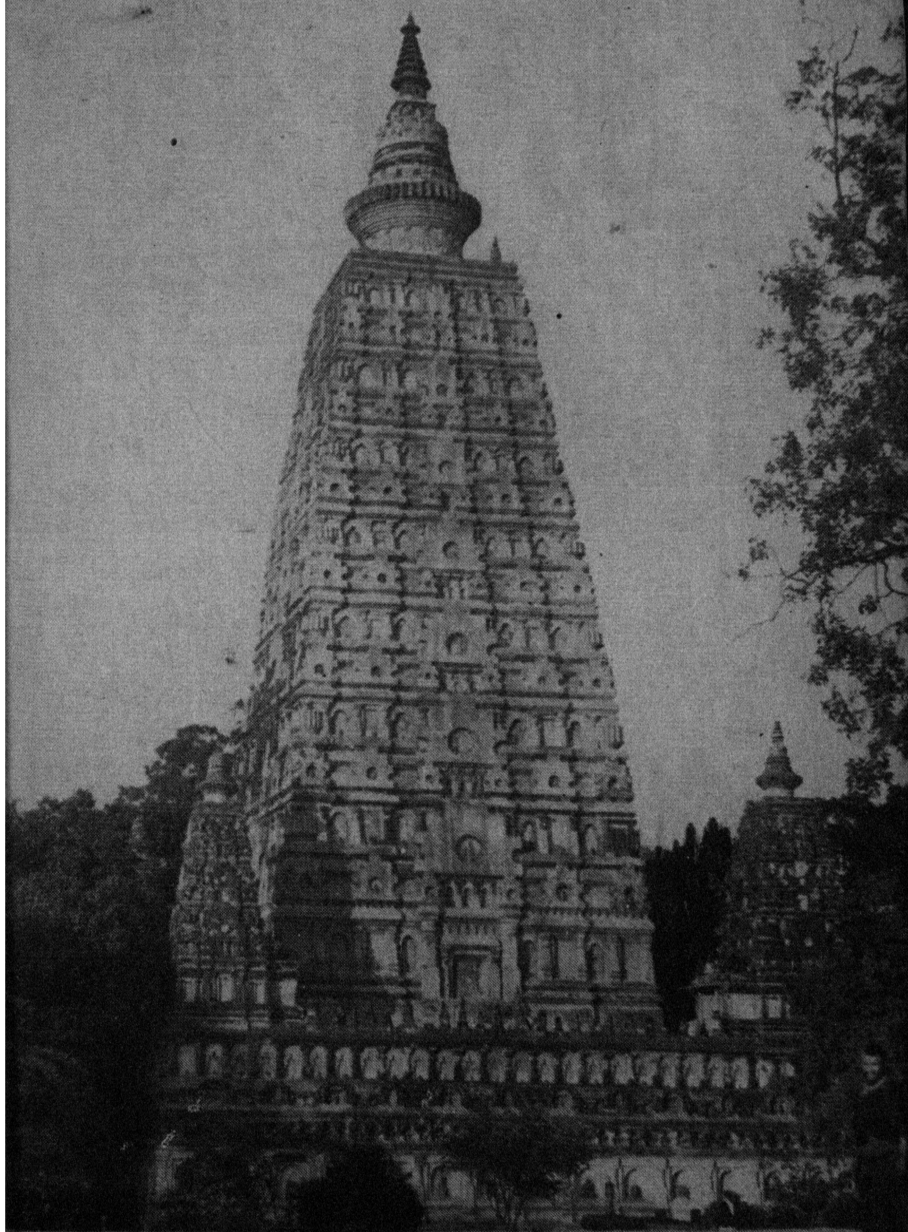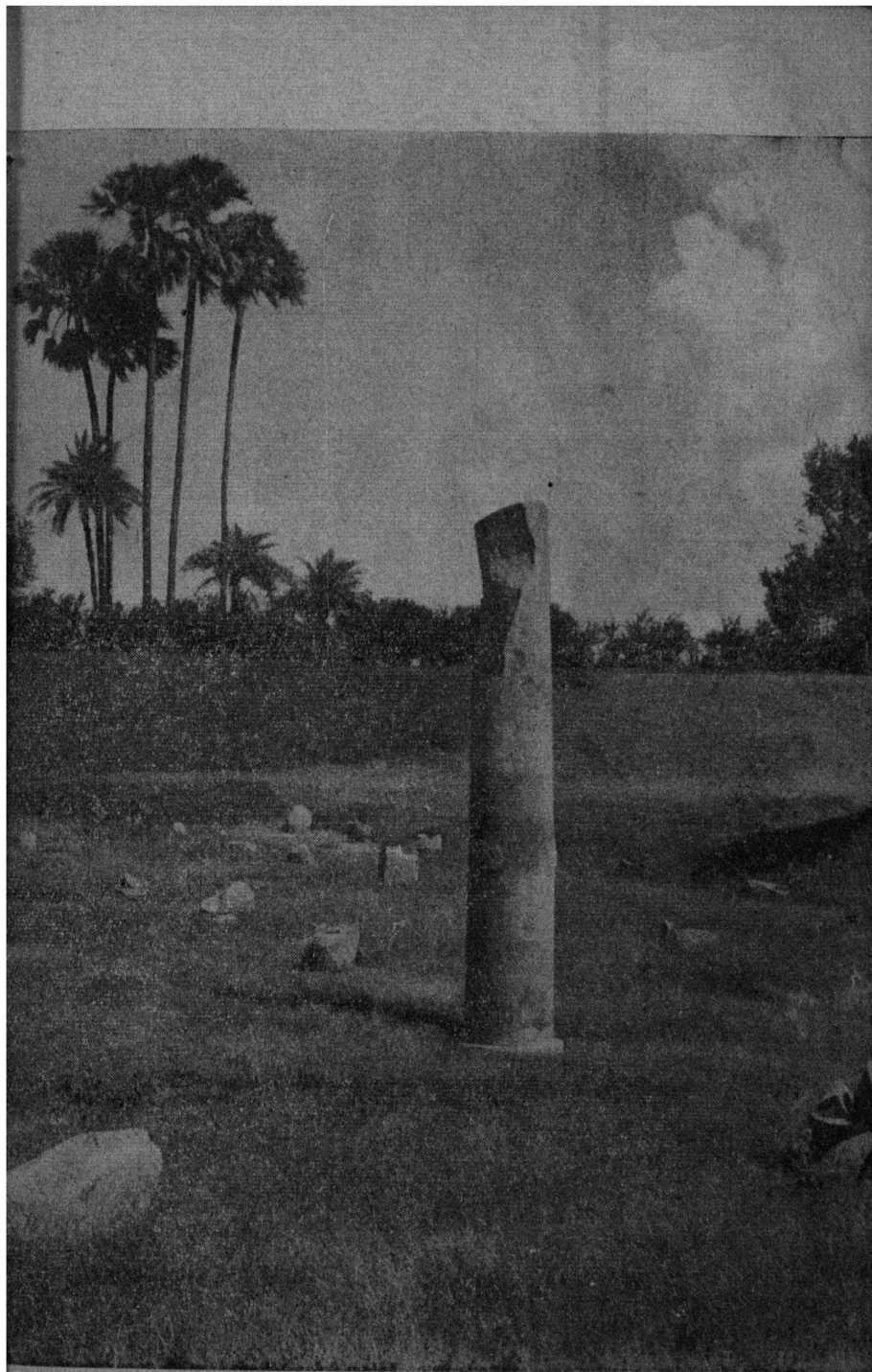
পাটলিপুত্রে সম্রাট অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

ফটো—লেখক

গোলঘর, পাটনা
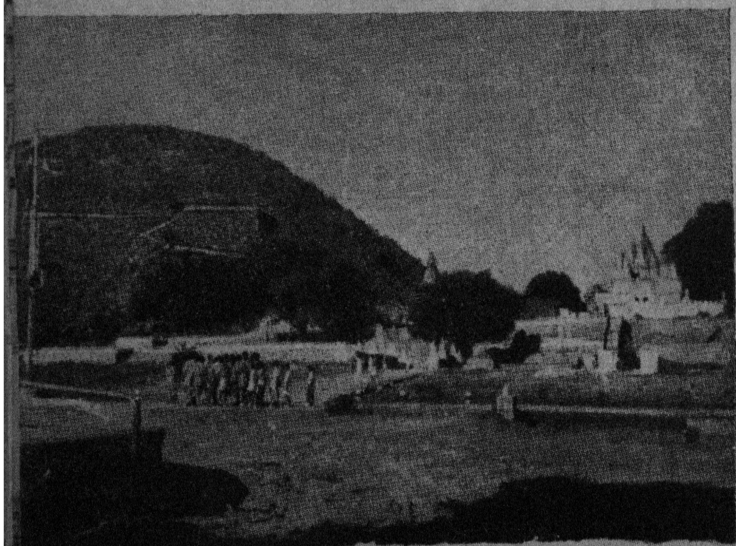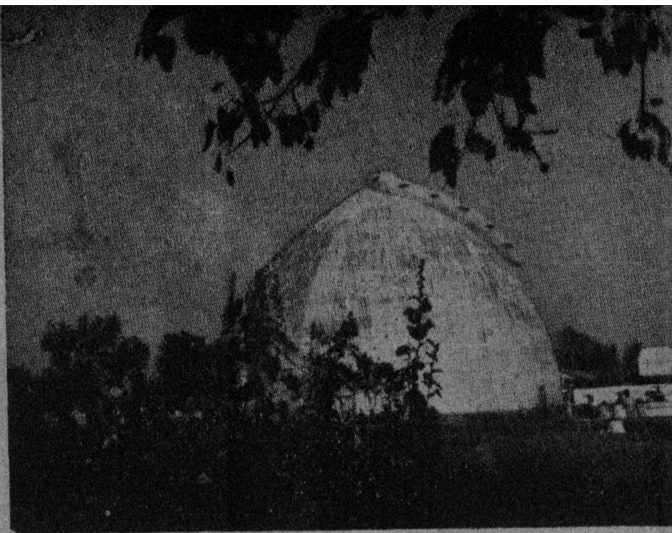
রাজগির
ফটো—সুধীন্দ্রকু
আ

নালন্দা

ফটো—লেখ
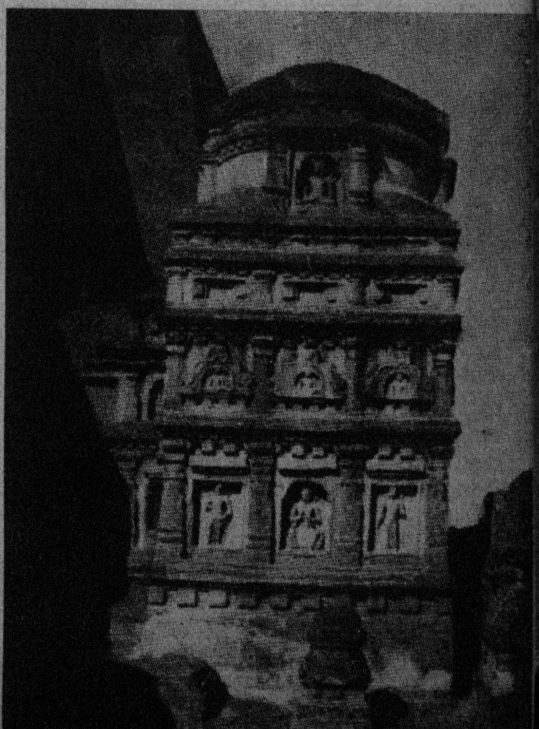
নালন্দা

টো—সুধীন্দ্রকুমার বসু,
আসানসোল

উপরে—সুবর্ণরেখার তীরে।

নীচে—নেতার হাট, ছোটনাগপু

ফটো—ডঃ শীতাংশু

টুসু উৎসব, বিহার।
টো—ডঃ শীতাংশু মিত্র,
সালকিয়া

দরকার হরিদ্বারে।

হাসবার চেষ্টা করে মনোরঞ্জন বলল : ভয় পাচ্ছ নাকি! হর কি পৌড়িতে স্নানের জন্যে যাচ্ছি না, স্বর্গদ্বারে আশ্রম খুঁজতেও না। কাশীতে ভৃগুর সন্ধান পেয়েছি।

তাহলে হরিদ্বারে যাচ্ছ কেন?

মনোরঞ্জন মাথা নেড়ে বলল : এ প্রশ্ন তোমার সঙ্গত। যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি কখনও কাশীতে কখনও হরিদ্বারে থাকেন।

তবে কি কাশীতে তাঁর দেখা পেলে হরিদ্বারে আর যাবে না!

তোমার ভাবনা নেই। তোমার সঙ্গে আমি নরকে যেতেও রাজী আছি।

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। সেই শব্দ শুনে মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল : কেন, পছন্দ হলনা বুঝি?

বললুম : নরকের দিকে তো আমার দৃষ্টি নেই, তাই আনন্দের ব্যাপারে অনেকটা ব্যাঘাত হবে।

আমার উত্তর শুনে মনোরঞ্জন অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল : বুঝেছি।

কী বুঝেছ?

মনোরঞ্জন গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল : যা বোঝবার, তাই বুঝেছি।

তবু শুনি।

মনোরঞ্জন আরও খানিকটা গাম্ভীর্য সঞ্চয় করে বলল :

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান,
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

আমি চকিতে তার দিকে চেয়ে বললুম : মানে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল : সেরকম সঙ্গী তো আমি নই।

তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল : দেখি চেষ্টা করে।

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

২

মনোরঞ্জন আরও ভাল করে পাঁজি পুথি দেখেছিল, মিলিয়েছিল আমার কোষ্ঠী-ঠিকুজীর সঙ্গে। তারপরে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিল: এই যাত্রা তোমার সত্যিই শুভ হবে।

শুভ হবে কিনা জানিনে, তবে ক্ষতি যে হবে না তা মানি। লাভ হবে নতুন দেশ দেখার আনন্দ। দু বছর আগে দক্ষিণ ভারত দেখেছি, দেখেছি দ্রাবিড় দেশ। কালিন্দীর তীরে তীর্থ ও জনপদ দেখেছি। তারপর রাজস্থান সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র। উৎকলও দেখা হয়েছে। কিন্তু উত্তর ভারত ভালো করে দেখা হয় নি, দেখা হয় নি হিমালয়ের তীর্থগুলি।

এতে বোধহয় বিস্ময়ের কিছু নেই। যা আছে হাতের কাছে, তার সম্বন্ধেই আমরা কম জানি। ছুটি পেলে বাঙালী বাঙলার বাহিরে যায় বেড়াতে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাঁরা ঘুরে এসেছেন, তাঁরাও হয়তো গৌড়-পাণ্ডুয়া কিংবা বিষ্ণুপুর ও মুর্শিদাবাদ দেখেন নি। নবদ্বীপ বা তারকেশ্বরই বা কজন দেখেছেন! নিজের বাড়ির বর্ণনাই কি সকলে দিতে পারেন!

এক বন্ধু একটি মজার গল্প বলেছিল। এক চাকরির পরীক্ষায় তাকে নিজের ঘড়ির ডায়েলটি আঁকতে বলা হয়েছিল না দেখে। এমন বিপদে সে নাকি আগে কখনও পড়েনি। কীরকম অক্ষরে এক দুই তিন লেখা, তাই তার মনে পড়ছিল না। তারপর কোন্ অক্ষর আছে, আর কোন্টা নেই। শেষ পর্যন্ত ভুল হয়ে গেল চার লিখতে। চারটে দাঁড়ি দিয়ে যে অনেক ঘড়ির চার লেখা থাকে, ভুল করেই তা সে প্রথম জানল। অথচ এই ঘড়িটি সে প্রতিদিন কতবার করে দেখে, তার হিসেব সে দিতে পারবে না।

অমৃতসর মেলের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে আমি এই সব কথা ভাবছিলুম। সারারাত আমরা এই গাড়িতে বসে থাকব। সকালে একটু বেশি বেলায় নামব বেনারসে। বাঙলার কোন শহর দেখব না, অন্ধকারে পেরিয়ে যাব বিহার রাজ্য। এবারেও আমাদের অনেক দূরের যাত্রা।

উপরের বাঙ্কে বিছানা বিছিয়ে মনোরঞ্জন নিচে বসে ছিল। ঠাৎ বলে উঠল : আর তোমাকে আপশোস করতে হবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কেন ?

গাড়ি থেকে নেমেই মনের মতো সঙ্গী পেয়ে যাবে।

বলে মনোরঞ্জন মুখ ফিবিয়ে নিল।

আমি তার চোখে কোন কৌতুকের চিহ্ন দেখলুম না, কণ্ঠস্বরেও ছিল না কোন বিদ্রূপের আভাস। গাড়ির অনুজ্জ্বল আলোয় আমি তার কোন ভাবান্তরই দেখতে পেলুম না।

জানালার বাহিরে অন্ধকার ঘনিয়ে আছে আদিগন্ত, আর লোহার চাকার খট খট শব্দ উঠছে অবিশ্রান্ত ভাবে। কত গ্রাম কত প্রান্তর পেরিয়ে দুরন্ত ট্রেন সামনে ছুটে চলেছে। কিন্তু মন আমার এগোল না, অশান্ত অতীতে আমি সহসা হারিয়ে গেলুম।

সে বুঝি বছর দু-তিন আগের ঘটনা। মনোরঞ্জন তখন জ্যোতিষ চর্চা করত না, সাময়িক পত্রেও লিখত না সাপ্তাহিক ফল। বরং সেবারে পূজার সময় আমার দেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে পড়ে পরিহাস করেছিল। পরিহাসের কারণও ছিল। পয়সার অভাবে আমাকে ভ্রমণের বাসনাটা বাতিল করতে হয়েছিল।

অফিস যে দিন ছুটি হল, চারটে কুড়ির লোকালটা সে দিন ধরতে পারি নি। সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেছিলুম মাদ্রাজ মেল দেখতে। রায় সাহেব অঘোর গোস্বামীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়ে গেল। বছর কয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যখন তাঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে

দেখা করতে গিয়েছিলুম, তখন আমাকে চিনতে পারেন নি। আমার মা তাঁর পাতানো বোন ছিলেন। সেই সম্বন্ধে মামাবাবু। নিজের বোনকেই লোকে আজকাল ভুলে যাচ্ছে, তায় পাতানো বোন। আব গরিবকে চেনাও তো বিপদের কথা।

সেই মামা আমাকে এমন ভিড়েব ভিতব চিনলেন। তাঁবা বিপদে পড়েছিলেন, তাঁদের চাকব গিয়েছিল হাবিয়ে। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে বামেশ্ববে যাবাব সাহস তিনি পাচ্ছিলেন না।

মামা বললেন ঃ বাবা, বামেশ্বরেব নামে যাত্রা করে বেবিয়েছি, তুমি আমাদেব সঙ্গে যেতে পাব না গোপাল ? .

মামা আমাব হাত জড়িয়ে ধবলেন। বড় অসহায় মনে হল তাঁকে। জানালাব ভিতব মামীব চোখ ছুটো দেখলুম, ছলছল করছে বেদনায়। আব দবজায় দাঁড়িয়ে তাঁদেব মেয়ে স্বাতি উত্তরেব প্রতীক্ষায় ছিল বড় বড় চোখ মেলে।

আমি জাত-বাউণ্ডুলে। বাহিবেব আকাশ আমাকে টানে। সেই টানে ঘরে আজও মন বসল না। ভাববাব সময ছিল না। দবজা দিয়ে ঠেলে মামাকে তুলে দিয়ে আমি চলতি ট্রেনে উঠে পড়েছিলুম।

তাবপর এক দিন ছু দিন নয়, দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে ভ্রমণ কবেছি। মাদ্রাজ থেকে মহাবল্লীপুব, কাঞ্চীপুব থেকে ত্রিচিনপল্লী, মাছুবা থেকে ধনুষ্কোডি, বামেশ্বর থেকে কন্যাকুমারী। এই পরিবাবেব সঙ্গে শুধু পরিচয় হয় নি, সম্বন্ধ অন্তরঙ্গ হয়েছে। দেশে ফিবে আমাকে অনুগ্রহ কবতে চেয়েছিলেন, প্রত্যাখ্যান করে আমি তাঁকে আঘাত করেছি। স্বাতিকে বলেছিলুম ঃ এই দিনগুলো আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল—

বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হাবা স্বপ্নের মূবতি।

স্বাতি এ কথার প্রতিবাদ করেছিল কঠোর ভাষায়, বলেছিল : ভুল। এ হচ্ছে দুর্বলের মনোভাব। আঙুর খেতে না পেয়ে তাকে টক ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা।

মনে মনে আমি তার এ ভর্ৎসনা মেনে নিয়েছিলুম।

মনোরঞ্জন আজ আমাকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিল। সমবেদনা জানাল, না পরিহাস করল, আমি তা বুঝতে পারলুম না।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটছে।

৩

এক সময় মনোরঞ্জন আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল : ঘুমলে নাকি ?

তার প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। বললুম : না।

তবে এমন চুপ করে চলেছ কেন ?

বললুম : গল্প কর।

মনোরঞ্জন ভাবল খানিকক্ষণ, তার পর বলল : তোমার কালিন্দী পর পুরোপুরি ভ্রমণকাহিনী হয় নি, উত্তর-ভারতের কথাও তাতে সম্পূর্ণ নয়।

ত্রুটি স্বীকার করি।

তবে কি এবারে ভাগীরথী পর্ব লিখবে ?

বললুম : উত্তর-ভারতের গঙ্গাকে তো ভাগীরথী বলে না, ভাগীরথী বাঙলার গঙ্গা। বাঙলা সম্বন্ধে যদি কোন দিন লিখতে পারি, তার নাম দেব ভাগীরথী পর।

তবে এবারে কোন্ পর্ব হবে ?

উত্তর প্রদেশ ও বিহারের বৃত্তান্ত উত্তর-ভারত পর্বেই লিপিবদ্ধ হোক।

মনোরঞ্জন তার ঝোলা থেকে টাইম টেবল বার করল। খামের ভিতর একখানা মানচিত্র আছে। চোখের সামনে সেটি মেলে ধরবার সময় বলল : কালিন্দী পর্বটি তোমাকে নূতন করে লিখতে হবে।

বললুম : তথাস্তু।

মনোরঞ্জন মন দিয়ে মানচিত্রটি দেখছিল। বলে উঠল : অন্য কোন গাড়িতে উঠলে আমরা গয়ার উপর দিয়ে যেতে পারতুম।

তেমন কোন গাড়িতে উঠলে রাঁচিও পৌঁছনো যেত।

তুমি তামাশা করছ, অথচ আমি তোমার জন্যেই এই কথা ভাবছি।

কী রকম ?

ক দিন আগে তুমি উৎকল পর্ব শেষ করলে, এইবারে তোমার উত্তর-ভারত পর্ব হবে। অথচ আমরা গোটা বিহারটা ডিঙিয়ে উত্তর প্রদেশে গিয়ে নামছি। বিহারের কথা না লিখলে তোমার কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে।

খুবই সত্যি কথা। মগধের প্রাচীন ঐতিহ্য ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃত।

মগধ সম্বন্ধে কতটুকু জানি ভাবতে গিয়ে কয়েকটি শহবের নাম শুধু মনে পড়ল। একবাব এক বন্ধুর মোটরে চেপে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলুম। বন্ধু দামোদব ভ্যালি কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার, কাজের জন্যে সবকারী গাড়ি পেয়েছিল একখানা। সেই গাড়িতে শুধু দামোদর ভ্যালি নয়, হাজারিবাগ থেকে রাঁচি পর্যন্ত দেখিয়ে দিয়েছিল।

মনোরঞ্জন বলল ঃ গয়া ও বুদ্ধগয়ার কথা আমি তোমাকে বলতে পারব।

বললুম ঃ রাজগির নালন্দা আমরা দেখে এসেছি।

মনোরঞ্জন গম্ভীর ভাবে বলল ঃ বাকিটা টুকে মেরে দিয়ো।

হেসে উত্তব দিলুম ঃ চমৎকার পরামর্শ।

মনোরঞ্জন বলল ঃ হাসলে কেন !

ভ্রমণ-কাহিনী কি কেউ না দেখে লেখে !

লেখে না মানে ! এইতো সে দিন আমাদের পাড়ার অধ্যাপক হাতে একখানা ভ্রমণ-কাহিনী নিয়ে বেড়িয়ে এল। তার কাছেই শুনবে যে কী নাস্তানাবুদ সে হয়েছে। বইএ দেখেছিল যে পথের ধারেই ধর্মশালা। তাই বাস থেকে নেমে পড়েছিল। তারপর শোনে

যে পাঁচ মাইল তাকে হাঁটতে হবে। মালপত্র নিয়ে তার দুর্গতির কথা ভাব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কার কথা তুমি বিশ্বাস করবে?

মনোরঞ্জন বলল : অধ্যাপক কেন মিথ্যা কথা বলবে!

লেখকেরই বা মিথ্যে কথা লিখে লাভ কী!

লাভ নয়! বই লিখে নামও হল, পয়সাও এল।

বললুম : তাহলে তো বলতে হয়, লেখকের ভুল ধরে অধ্যাপকেরও পাণ্ডিত্য দেখানো হল।

অসহিষ্ণু ভাবে মনোরঞ্জন কোন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললুম : একটা অনুরোধ তোমাকে জানাব। কারও সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে গেলে নিজে দেখে শুনেই তা করতে হয়, অন্যের মন্তব্য শুনে নয়। নিজের বুদ্ধিতে ডুবলেও শান্তি আছে।

মনোরঞ্জন এ কথার উত্তর দিল না। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নীরবে বসে রইল।

লোকালের মতো মেল ট্রেন প্রতি স্টেশনে থামে না। মনে হয় কোন স্টেশনেই বুঝি থামবে না। এই গাড়ির ধ্বনিতে একটা অবিশ্রাম চলার ছন্দ আছে। আবহাওয়ায় একটা ঘরছাড়া বৈরাগীর মেজাজ। কেন জানি না, মনোরঞ্জনের মতো আজ আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারছিলুম না, বারেবারেই আমি অতীতে ফিরে যাচ্ছিলুম। কিছু দিন পূর্বেও আমার কোন অতীত ছিল না। সম্প্রতি এই শব্দটি আমার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে চলার বাসনা আমার অতীতের কাঁটা তারে হোঁচট খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। একদা যে স্মৃতি সুখের ছিল, তাই এখন বেদনাদায়ক হয়েছে। কিন্তু এর জন্য কি আমি দায়ী!

কন্যাকুমারী থেকে আমরা সোজা ফিরি নি। ফিরেছিলুম মহীশূর হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভিতর দিয়ে। ব্যাঙ্গালোরের ওয়েটিং রুমে স্বাতির সঙ্গে যে গল্প হয়েছিল, তাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

আমি বলেছিলুম ঃ একটা মনের আয়নায় আর একটা মনের ছায়া একবার পড়েছিল। মন টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও সে ছায়া কোন দিন মুছে যাবে না।

কেন ?

এই নিয়ম। এই লোহা-লক্কড় ধোঁয়া ধুলো আর ইঞ্জিনের শব্দের ভেতব আমাব কথাটা হয়তো বেয়াড়া শোনাবে, কিন্তু সন্ধ্যা বেলায় লালবাগে কিংবা বৃন্দাবন গার্ডেনে তা মনে হবে না। ফাঁকি থাকলে তো ফাঁক থাকবে !

তোমার কথা আজ হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে।

বলেছিলুম ঃ সহজ ভাবে বললে তুমি লজ্জা পাবে।

পাব না।

সেই লজ্জাতেই তো তুমি আমার সঙ্গে আসছিলে না।

আমি লজ্জাবতী লতা নই যে তোমার কথাতেই বুজে যাব।

তবে কি আমি ছুঁলে তুমি পাপড়ি মেলবে ?

সে উত্তাপ কি তোমার আছে !

বলেছিলুম ঃ আগুনের উত্তাপে দেহ ঝলসে যায়, আব পাপড়ি মেলাব উত্তাপেব জন্যে তার সাবা রাত্রির সাধনা।

স্বাতি জিজ্ঞাসা কবেছিল ঃ তুমি কবিতা লেখ না কেন গোপালদা ?

বলেছিলুম ঃ তোমাব বিয়ের পরে লিখব।

অত দিন অপেক্ষা করে থাকবে ?

তার বিয়েব কথা আমি মামীর কাছে শুনেছিলুম। বললুম ঃ অঘ্রাণের আর দেরি নেই। জামাকাপড়ও তো কেনা হয়ে গেল।

স্বাতি হেসেছিল। আমি গভীর ভাবে তাকিয়েও সেই হাসির অর্থ খুঁজে পাই নি। কন্যাকুমারীর সমুদ্রবেলায় স্বাতি আমাকে বলেছিল ঃ দেশে ফিবে গিয়ে আমাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু যাকে করতে হবে, তাকে আমি মানুষ ভাবি না।

আমি দৃষ্টি দিয়ে আমার প্রশ্ন জানিয়েছিলুম।

স্বাতি বলেছিল: লোকটা আট বছর বিলেতে কাটিয়েছে। মনুষ্যত্ব খিকিয়ে সাহেবিয়ানা এনেছে সেখান থেকে। তার সহধর্মিণীর প্রয়োজন নেই, আছে বান্ধবীর। আর সে প্রয়োজনটাও নিতান্ত জৈব।

সহসা আমার মনে হয়েছিল যে তার বিয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করি নি। তাই বলেছিলুম তেপান্তর পেরবার গল্প: কার্তিকের মতো রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এল। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজকন্যা তাকে দেখছিল। বলে উঠল, রাজপুত্তুরের যে খোঁড়া পা। পক্ষীরাজের পিঠ থেকে নামিয়ে দিলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। রাজবৈদ্য দেখে বললেন, সর্বনাশ। পায়ে যে কুষ্ঠ হয়েছে। নিচে থেকে পচছে।

আর্ত স্বরে স্বাতি বলে উঠেছিল: কী বলছ এ সব?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বলেছিলুম: উলটো ধার থেকে একটা জোয়ান আসছে চাষাড়ে গোছের, শক্তসমর্থ সবল চেহারার পুরুষ। ত্বপদাপ করে নেমে পড়ল তেপান্তরের মাঠে। কী করে পার হবে! তার পক্ষীরাজ কোথায়! নাই বা থাকল। সুস্থ দেহ আছে, সাহসী মনও আছে। তেপান্তরের মাঠ কি সে পেরতে পারবে না! দেখতে পেয়ে রাজা বলল, সাবাশ! রাণী বলল, ওর একটা পক্ষীরাজ নেই! আর রাজকন্যা কী বলল বল তো?

লোকটা বেদম বোকা।

ঠিক বলেছ। রাজকন্যা অমন করে চেয়ে আছে, অথচ তাকে দেখতেই পেল না!

রাজকন্যার যেন খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই!

তবে বোকা বলল কেন?

অমন পক্ষীরাজ ঘোড়ার পাশ দিয়ে গেল, খোঁড়ার কাছ থেকে ঘোড়াটা কেড়ে নিতে পারল না!

রাজপুত্রের সেপাই সান্ত্রী যে বল্লম হাতে পাহারা দিচ্ছে। হাত বাড়ালেই পেট ফুটো কবে দেবে।

স্বাতি বলেছিল ঃ হুঁ।

সেই সঙ্গেই যেন একটা দীর্ঘ শ্বাসেব শব্দ পেয়েছিলুম। স্বাতি কি দুঃখ পেল! হেসে বলেছিলুম ঃ লোকটা বড়ই বেবসিক। বাজকন্যাব দিকে একবাবটি তাব চাওয়া উচিত ছিল। কী বল?

চায় নি আবাব! খানিকটা এগিয়েই সুড়সুড় কবে ফিবে আসবে।

তারপবেই বলেছিল ঃ আমাব কী মনে হচ্ছে জান? তুমি আজ কোন নেশা কবেছ।

বলেছিলুম ঃ আজ নয়, দিন কয়েক আগে। মনে হচ্ছে, এ নেশাব খোব সহজে কাটবে না।

সত্যিই কাটে নি। এ ঘটনাব পবে অনেক দিন তো গত হল। কিন্তু স্বাতিকে তো ভুলতে পাবলুম না। পবিচয় যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, নেশাব ঘোবও তত বাড়ছে। এব পবিণাম কী হবে জানি না।

৪

গমগম করে আমাদের গাড়ি একটা পুল পেরতেই মনোরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। বলল: ওদের একবার দেখে আসি।

আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলুম: কাদের?

উত্তর না দিয়ে মনোরঞ্জন একটু হেসে গেল।

হাওড়াতেই আমার মনে হয়েছিল যে তার পরিচিত কোন পরিবার এই ট্রেনে চলেছেন। আমি যখন প্ল্যাটফর্মের ঠেলাগাড়িতে বই দেখছিলুম, সে তখন অন্যত্র ব্যস্ত ছিল। কোথায় তা লক্ষ্য করি নি। কোন কৌতূহল হয় নি। ট্রেন এমন জিনিস যে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খুঁজে বেড়ালে দু-একজন চেনা মানুষ বেরিয়ে পড়েই। লোকাল ট্রেনে তো চেনা মানুষেরই ভিড়। যে ট্রেনে প্রতি দিন যাতায়াত করি, সে ট্রেনের প্রায় সবাইকেই চেনা মনে হয়। আমি ভেবেছিলুম, মনোরঞ্জন এই রকমের কোন চেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করছে।

কিন্তু এইবারে তার হাসি দেখে সন্দেহ হল। এই হাসিতে যেন খানিকটা কৌতুকের আভাস আছে।

দূর থেকে মনোরঞ্জন বলল: আমার জায়গাটুকু যেন বেদখল না হয়।

আমার হাতের বইখানা তার আসনে রেখে বললুম: হবে না।

গাড়ির গতি মন্থর হচ্ছিল। এইবারে বর্ধমানে এসে দাঁড়াবে। এখানে-সেখানে অনেকেই দাঁড়িয়েছে। অনেকেই গাড়ি থেকে নামবে। কেউ খাবার কিনতে, কেউ জল নিতে, কেউ বা একটু খোলা হাওয়ার লোভে। সঙ্গে যাদের খাবার আছে, তারা এইখানেই খাবে। কেউ কাপড়ের পুঁটলি খুলছে, কেউ টিফিন

কেরিয়ার। এক-এক জনের সঙ্গে এক-এক রকমের জলের বোতল। সঙ্গের জলটুকু শেষ করে নতুন জল ভরে নিতে হবে। গাড়ি থামবাব আগেই ভিতবটা বেশ তৎপর হয়ে উঠল।

বর্ধমান স্টেশনটি জংসন হয়েও ঠিক জংসন নয়। এখান থেকে কোন নতুন লাইন নেই। কলকাতা থেকে যে দু জোড়া লাইন বেরিয়েছে তার এক জোড়া ব্যাণ্ডেল হয়ে আসে, আর এক জোড়া সরাসবি আসে ডানকুনির উপর দিয়ে। এবা শক্তিগড়ে মিলিত হয়ে বর্ধমানে প্রবেশ কবে। তাবপবে একত্রে যায় খানা জংসন। সেখান থেকে একটা লাইন বোলপুব শান্তিনিকেতনের উপব দিয়ে সাহেবগঞ্জে যাবে। যাত্রীদেব কেউ গঙ্গা পার হয়ে মণিহাবি ঘাট থেকে যাবে কাটিহার। পূর্বে উত্তব বাঙলা ও আসাম, পশ্চিমে বিস্তৃত উত্তর বিহাব ও নেপাল।

কোন যাত্রী সাহেবগঞ্জে নামবে না, যাবে ভাগলপুব মুঙ্গের কিংবা জামালপুব। ভাগলপুবে যাবার জন্য বনাইদা অনেকবার বলেছেন, একবার যেতে হবে। এই ভাগলপুরেব সঙ্গে উপেনদার স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। বিভূতিভূষণ ও শরৎচন্দ্রেব কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

জামালপুরে ইঞ্জিনের কাবখানা। তার পাশ দিয়ে ট্রেন কিউলে যাবে। কিন্তু আমরা এই পথে যাব না। আমাদেব ট্রেন আসানসোল থেকে চিত্তবঞ্জনের উপর দিয়ে কিউল যাবে। বিহারের অনেকগুলি হাওয়া বদলেব জায়গা এই লাইনে—রূপনারায়ণপুব, মিহিজাম, জামতাড়া, শিমুলতলা, মধুপুর থেকে গিরিডি, আব জসিডি থেকে দেওঘর। দেওঘরেই বৈদ্যনাথধাম। একদা এই সব স্থান পূজার সময় জমজমাট হয়ে উঠত। বাঙলা দেশে তখন পূজার ছুটি ছিল। স্কুল কলেজ ছুটি, হাইকোর্ট ছুটি। মাস্টার প্রফেসার উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার সবাই বেরতেন হাওয়া বদলে। একাধিক স্বাস্থ্যকর স্থানে বড়লোকদের বাড়ি থাকত। দিনে দিনে এই

সমাজটা বদলে গেল। দেখতে দেখতে চোখের সামনেই এই পরিবর্তন হল। মানুষের আজ ছুটি বলে কিছু নেই, সময় নেই দু'দণ্ড আরাম করবার। পয়সার জন্য সারাক্ষণ মানুষ ছুটোছুটি করছে। অনেকে বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন, অনেকে ক্রেতার অভাবে তা পারেন নি। এক সময় যে বাড়িগুলো ফুলে ফলে ছবির মতো দেখাত, এখন তা পোড়ো বাড়ির মতো পড়ে আছে।

এবারে আমরা অন্ধকারের ভিতর এই সব স্টেশন পার হয়ে যাব। দেখা কিছুই যাবে না। এই সব স্টেশনের খানিকটা পরিচয় পেয়েছিলুম কিছু দিন আগে। সেবারে তুফান এক্সপ্রেসে এলাহাবাদে যাচ্ছিলুম। দিল্লী থেকে মামা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

দিল্লীর কথায় একসঙ্গে অনেক কথা আমার মনে পড়েছিল। ভুলে গিয়েছিলুম ট্রেনের কথা। কখন এসে বর্ধমানে দাঁড়িয়েছিলুম আর কখন আবার ট্রেন চলতে শুরু করেছিল, কিছুই খেয়াল করি নি। মনোরঞ্জন ফিরে এসে আমাকে জাগিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল ঃ সত্যিই সুখী লোক।

আমি সহজ ভাবে প্রশ্ন করলুম ঃ কেন বলতো?

মনোরঞ্জন বলল ঃ একেবারে যে বৈরাগীর মতো নির্লিপ্ত দেখছি। ক্ষুধাতৃষ্ণাও কি বিসর্জন দিয়েছ?

এই অন্যমনস্কতার জন্য আমার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি বললুম ঃ সেই একোদর পৃথকগ্রীবর গল্প মনে নেই! এক উদর, কিন্তু গ্রীবা পৃথক! প্রত্যেকের মুখ আলাদা হলেও পেটের দাবী সবার সমান।

তার মানে?

বললুম ঃ তোমার ব্যবস্থা দেখবার অপেক্ষাতেই ছিলুম।

মনোরঞ্জন হেসে বলল ঃ তবে এই নাও। তোমার খাতিরে আমারও কপালে কিছু জুটল।

কলাব পাতায় মোড়া লুচি তবকাবি মনোবঞ্জন আমাব দিকে বাডিযে দিল।

বললুম ঃ তোমাব হেঁযালি আমি বুঝলুম না।

ধমক দিযে মনোবঞ্জন বলল ঃ আগে ধব।

অগত্যা আমাকে হাত বাডিযে সেই লুচি তবকাবি নিতে হল। তাবপবে আবাব জিজ্ঞাসা কবলুম ঃ কে দিল এই সব ?

মনোবঞ্জনেব মুখে এবাবে কৌতুকেব হাসি দেখা গেল। বলল ঃ তোমাব জন্যেই জুটল। তোমাবই বন্ধু তাবা।

আমাব বন্ধু !

পাডাব বন্ধু নয, পথেব বন্ধু।

বলে মনোবঞ্জনও আমাব পাশে বসে পডল। তাবপব এক টুকবো লুচি মুখে ফেলে বলল ঃ আবও কিছু বাব কবা যাক্, কী বল ?

আমি বললুম ঃ আমাব আব দবকাব নেই।

বাস্।

রাতে কম খেলে শবীব সুস্থ থাকবে।

কিন্তু পেটে ক্ষিধে থাকলেও যে ঘুম আসবে না।

আব বেশি খেলেও অসুখেব ভয বাডবে।

আমাব কথায বিবক্ত হযে মনোবঞ্জন বলল ঃ তবে আব কী, বাতে উপবাস কবাই শুরু কবি।

এ কথাব আমি কোন উত্তব দিলুম না।

লুচি তবকাবি শেষ কবে মনোবঞ্জন নিজেব ঝোলাব ভিতব হাত ঢোকাল। একটা পুঁটলি বাব কবে বলল ঃ এখুনি হাত ধুযো না যেন।

জলেব বোতলেব দিকে হাত বাডিয়ে আমি বললুম ঃ আমাকে মাপ কব।

সে কি হে ! তোমাব নিজেব বউদি তোমাবই জন্যে সাবা দিন পরিশ্রম কবে এই পুঁটলি বাঁধলেন—

বলে মনোরঞ্জন তার পুঁটলি খুলল। কৌটোর ভিতর থেকে খাবার বেরল লুচি ও মাংসের কাবাব। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: নাও নাও, বায়নাক্কা বাড়িয়ো না।

আমি একখানি কাবাব তুলে নিয়েছিলুম। মনোরঞ্জন বলল: শুধু কাবাব কেন, লুচিও নাও। খাবার জন্যেই তো জীবন।

বুদ্ধিমানেরা বলেন যে জীবনের জন্যে খাবার। বিনা খাদ্যে যদি জীবন ধারণ সম্ভব হত, তাহলে পৃথিবী সুখের হত, সংসারে চুরি ডাকাতি রাহাজানি আর থাকত না।

খেতে খেতেই মনোরঞ্জন বলল: পেটের দাবি মিটে গেলে আরও কঠিন সমস্যা দেখা দিত।

কী রকম?

ইংরেজীতে বলে, কর্মহীন মাথা হল শয়তানের কারখানা। কাজ করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে মানুষ সারা দিন অকাজ করবে।

বললুম: ভগবানের বিধান জান তো? সারা জীবনে কে কত খাবে, নবজাতকের কপালে ভগবান তা লিখে দেন। যে বুদ্ধিমান লোক রয়ে সয়ে খায়, সে বাঁচে দীর্ঘ দিন। আর হাভাতের মতো যে গোগ্রাসে নিজের অংশ খেয়ে ফেলে—

সে বুঝি করোনারি থ্রম্বসিসে মরে?

নয় অ্যাক্সিডেন্টে।

মনোরঞ্জন প্রাণ ভরে হাসল, বলল: বেশ বলেছ। বাকি খাবারটা আমরা তাহলে কালকের জন্যে তুলে রাখি।

বাসী খাবে!

লুচি তো বাসী হলেই উপাদেয় হয়।

কিন্তু—

কিন্তু কী!

কার কাছ থেকে খাবার নিয়ে এলে তা এখনও বল নি।

পরম কৌতুকে উদ্ভাসিত হল মনোরঞ্জনের দৃষ্টি। বলল:

তোমারই বন্ধুর কাছ থেকে আনলুম। বলেছি তো, পাড়ার বন্ধু নয়, তারা তোমার পথের বন্ধু!

পথের বন্ধু!

কেন, আশ্চর্য হচ্ছ! আমি তোমার বন্ধুদের চিনে থাকলে কি সেটা দোষের হল!

দোষের কথা বলছি না, বলছি কৌতূহলের কথা।

তবে শুয়ে শুয়ে সারা রাত্রি ভাব, সকালে পরিচয় করে দেব। ভাল কথা, তাঁরা একা নন, বাপ মায়ের সঙ্গে তাঁদের মেয়েও আছে।

আমি চমকে উঠলুম। মনোরঞ্জন কি স্বাতির কথা বলছে! মামা-মামীর সঙ্গে আবার বেড়াতে বেরিয়েছে! কিন্তু কলকাতায় তাঁরা কবে এলেন! আর এলেনই যদি তো আমাকে একটা সংবাদ দিলেন না! হাওড়া স্টেশনেই বা লুকিয়ে রইলেন কেন!

সহাস্যে মনোরঞ্জন বলল: তুমি চিন্তাশীল মানুষ, তোমাকে চিন্তার খোরাক দিলুম। গুড নাইট।

বলে মনোরঞ্জন শয়নের আয়োজন করল। আর আমি বসে রইলুম জানালার ধারে। দুরন্ত অতীত আবার আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

অজন্তার সেই নদীর ধারে বসে আমার মনে হয়েছিল যে জীবনের প্রথম নাটক আমার শেষ হয়ে গেল। নায়কের ভূমিকায় আর আমাকে অভিনয় করতে হবে না। অজন্তার অপরূপ গুহাগুলি দেখবার পর স্বাতির সঙ্গে পাশাপাশি পা ফেলে আমি নদীর ধারে নেমে এসেছিলুম। বালির উপর, উপলের উপর। খুঁজে খুঁজে স্বাতি একটা বড় পাথর বার করল, একটুখানি ছায়াও। নিজে বসে আমাকে তার পাশে ডাকল। সঙ্কীর্ণ স্থান। তবু নিমন্ত্রণ অন্তরঙ্গ। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে নিজের হাতটাই দিল বাড়িয়ে। আর দ্বিধা চলে না, আমি এসে ঘেঁষে বসলুম।

দুএকটা মানুষকে দেখা যাচ্ছিল কাছে ও দূরে। কে লক্ষ্য করছে

আর কে করছে না, আমরা তা দেখলুম না। পৃথিবীতে আমাদেরও একটা অধিকাব আছে। সে অধিকার থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত করব!

আজ আমাদেব সামনে সমুদ্র নেই, ঢেউ নেই, নেই তার গম্ভীব গর্জন। উদাব আকাশ থেকে চতুর্দশীব চাঁদ জ্যোৎস্নাব মদ ঢেলে দিচ্ছে না। তবু আমাব মন হয়েছে থমথমে, যেন নেশা ধরেছে। ইচ্ছে হয়েছে বলি. 'আমাব শূন্যতা তুমি পূর্ণ করে দিযেছ আপনি।'

কিন্তু এই আমিটা কে? গবীব বাঙলাব একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছেলে বইতো নয়! আমার সমাজ কী, আমার পরিচয় কী, কিসেব আমাব মর্যাদা! কত দেশ তো ঘুরে ঘুরে দেখলুম, কত কীর্তি, কত নবনারী। এসব আমাব দেশের ভেবে বুক হয় তো ভরে উঠেছে, কিন্তু আমাকে নিয়ে বুক ভরেছে কার! আমাব মূল্য যে মাপা হয় চাঁদির টাকায়, চাঁদের জোৎস্নায় নয়! এত সহজে আমাব নেশা হলে চলবে কেন!

নিজেকে আমি সামলে নিয়েছিলুম।

৫

শুতে গিয়েও মনোরঞ্জন শুল না। ফিরে এসে আমার পাশে বসল। আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

মনোরঞ্জন বললো ঃ অমন করে তাকাচ্ছ কেন?

তোমাব কাণ্ড দেখে।

তোমারই কাণ্ড দেখে আমি ফিরে এলুম।

মানে?

আমরা কি স্বপ্ন দেখতে বেরিয়েছি?

স্বপ্ন কে দেখছে?

সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস ক'রো না। স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন করবে নারী, বুদ্ধিমান পুরুষ অতীতকে পিছনে ফেলে সমুখে অগ্রসর হবে।

আমি হাসলুম।

মনোরঞ্জন বলল ঃ হাসলে যে!

নোট বুকে টুকে রাখবার মতো কথা বলেছ।

মনোরঞ্জন একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করে প্রসঙ্গ পালটাল ঃ তোমার সঙ্গে একখানা ভারতের মানচিত্র ছিল না?

এখুনি দরকার?

হ্যাঁ।

আমি হাত বাড়িয়ে আমার ঝোলাটা সংগ্রহ করে মানচিত্রটি বার করলুম। মনোরঞ্জন নিজের কোলের উপর সেটি মেলে ধরল।

বললুম ঃ এত রাতে এ আবার কী শখ?

গম্ভীর ভাবে মনোরঞ্জন বলল ঃ ভুলে যেও না যে আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি।

ট্রেনের কামরায় বসে তা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

কী সম্ভব আর কী সম্ভব নয়, সে কথা তুমি আমাকে বোঝাতে এস না।

বেশ।

বলে আমি নীরব হলুম।

মনোরঞ্জন বলল: বিহারের উপর দিয়ে অনেকগুলি রেল লাইন গেছে দেখছি।

তার কোলের উপর মানচিত্রটি দেখতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল না। বললুম: হ্যাঁ।

সব চেয়ে দক্ষিণে দেখছি হাওড়া থেকে একটা লাইন নাগপুরের দিকে গেছে। এটা কী স্টেশন? খড়্গপুর, তারপর টাটানগর, এইটেই বোধহয় জামসেদপুর। বিলাসপুর থেকে লাইন দক্ষিণে নেমেছে রায়পুরে। উত্তরে এলাহাবাদ জব্বলপুর লাইনে কাট্‌নি থেকে একটা লাইন দেখছি বিলাসপুরে এসেছে, আবার রায়পুর থেকে দক্ষিণে ভিজিয়ানাগ্রামে এসে মিলেছে।

বললুম: ওয়ালটেয়ারের কাছে ভিজিয়ানাগ্রাম। মাদ্রাজ যাবার পথে দেখেছি।

মনোরঞ্জন বলল: আমরা এই লাইনে গয়া গিয়েছিলুম। হাওড়া থেকে আসানসোল ধানবাদ পরেশনাথ হাজারিবাগ হয়ে গয়া। সাসারামের ওপর দিয়ে মোগলসরাই পৌঁছেছে।

একটু থেমে বলল: রাঁচি যাবার পথ দেখছি দুটো। টাটানগর থেকে মুরি রাঁচি, আবার গোমো থেকেও মুরি রাঁচি।

বললুম: আমরা মোটরে এই অঞ্চল ঘুরেছি।

মোটরে!

হ্যাঁ।

সে গল্প তো আমাকে বল নি!

বলব। আগে তোমার বক্তব্য শেষ কর।

মনোরঞ্জন বলল : দেখ তো আমরা এই পথে এবারে যাচ্ছি কিনা! বর্ধমান থেকে আসানসোল হয়ে পাটনার দিকে! তারপর মোগলসরাই। পাটনা থেকে গয়া লাইন আছে, কিউল থেকেও গয়া যাওয়া যায়।

বললুম : হঠাৎ রেল লাইন নিয়ে কেন ব্যস্ত হয়ে পড়লে?

সে কথা তুমি বুঝবে না।

কেন?

শাস্ত্রবাক্য বুঝি মনে নেই! যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর।

তাহলে তোমার মানচিত্র গোটাও, আমার প্রয়োজন নেই।

গোটাতেই হবে দেখছি। গঙ্গার উত্তরে ছোট লাইনের হিসেব করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কাটিহার থেকে উত্তর বাঙলার দিকে লাইন গেছে, উত্তর বিহারের দিকেও। নেপালের সীমান্ত পর্যন্ত দেখছি রেল লাইন পৌঁছেছে। তাও এক জায়গায় নয়, এক দুই তিন—

মনে মনে গণনা সম্পূর্ণ করে বলল : বারো জায়গায়। কাঠমণ্ডু যায় বোধহয় রক্সৌল থেকে।

আমি কোন উত্তর দিলুম না। মনোরঞ্জন নিজেই আবার বলল : কয়েকটি নদী বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। উত্তর থেকে কোশি গণ্ডক ও ঘর্ঘরা এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। দক্ষিণ থেকে এসেছে শোন। কোশি বাঙলা থেকে বেশি দূর নয়, গণ্ডক ঘর্ঘরা ও শোন পাটনার পূবে ও পশ্চিমে।

মানচিত্রখানা আমি মনোরঞ্জনের কোলের উপর থেকে টেনে নিলুম। ভাঁজ করে তুলে ফেললুম ঝোলার ভিতর।

মনোরঞ্জন বলল : কেন, ভাল লাগল না বুঝি?

যদি নতুন কথা কিছু থাকে তো তাই বল।

গয়ার বৃত্তান্ত শুনবে?

না।

অরুচি কিসের ?

যাত্রীরা সবাই চোখ বুঁজেছেন, আমাদেরও চুপ করা উচিত।

বেশ।

বলে মনোরঞ্জন এবারে সত্যিই শুয়ে পড়ল।

মেল ট্রেনে চড়ে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। লোকাল ট্রেনের মতো এ গাড়িব যাত্রীরা ওঠানামাব জন্যে সারাক্ষণ কসরৎ করে না। সবাইকে বড় অলস মনে হয়। পিছনে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টাতেই সবাই ব্যস্ত। যার ঘুম আসে না, সেও এখানে চোখ বুজে চুপ করে থাকে। যাব সঙ্গে সঙ্গী নেই, সে কারও পরিচিত নয়। পাশেব যাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হতেও সে উৎসুক নয়। লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের কাছে এই রকম অবস্থান বড় বিচিত্র মনে হয়।

সেবারে যখন কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে চেপে বরাকরে গিয়েছিলুম, তখন ঠিক এ অভিজ্ঞতা হয় নি। কামরার ভিতর একটা ব্যস্ততা ছিল, বর্ধমানে ও দুর্গাপুরে অনেক লোক ওঠানামা করেছে। আসানসোলেও অনেকে নেমেছে। তারপর ববাকর। অনিমেষ আমাকে বরাকরে নামতে বলেছিল।

অনিমেষ আমার স্কুলের বন্ধু। কলেজে সায়েন্স পড়ে ইঞ্জি-নিয়ারিং কলেজে ঢুকেছিল। পাশ করে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে চাকরি পেয়েছিল। এখন অন্যত্র যাবে বলছে। মাস কয়েক আগে তার সঙ্গে আমার কলকাতায় দেখা। চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে চারি দিকে তাকাচ্ছিল। ট্যাক্সি নেই, বউ নিয়ে ট্রামে ওঠার কথাও ভাবতে পারছে না। ময়দানে খেলা দেখে আমি অলস ভাবে ফিরছিলুম। ভিড়টা এড়াবার জন্যে সকলের সঙ্গে সমানে ছুটি নি। অনিমেষ আমায় চিনে ফেলল।

পরিচয় করিয়ে দিল তার বউএর সঙ্গে। তার পরে বলল তার বিপদের কথা। সামান্য একটু সরকারি কাজ নিয়ে কলকাতায় এসেছিল, ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। কোন রকমে পাঞ্জাব মেল ধরতে পারলেও আসানসোল থেকে ট্যাক্সি নিয়ে মাইথনে পৌঁছতে পারবে।

আমি তাকে ট্যাক্সি ধরে দিয়েছিলুম। কিন্তু আমাকে সে ছেড়ে দেয় নি। ট্যাক্সিতে সে নিজের কথা বলেছিল। তার পরে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে আমি তার কাছে যাব।

সামনেই তো দু দিন ছুটি, তাতেই আসবি বল্।

চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয়, কথা দিতে হবে।

হেসে বললুম: আচ্ছা।

অনিমেষ ঠিক আগের মতোই আছে, বলল: আমার গা ছুঁয়ে বল্।

এবারে আমি তার বউএর দিকে তাকালুম। সেও বলল: সত্যিই আসুন না।

অনিমেষ বলল: শুধু মাইথন নয়, ঐ অঞ্চলটা তোকে দেখিয়ে দেব। তুই মুগ্ধ হয়ে যাবি।

সে তার একটা হাত আমার কোলের উপরে রেখেছিল। বললুম: আসব।

মাইথনে পৌঁছে সে আমাকে চিঠি দিয়েছিল। আমি উত্তর দিয়েছিলুম। তারপরে কথা রাখতে গিয়েছিলুম তার কাছে।

আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল। অনিমেষ তার স্ত্রীকে নিয়ে বরাকর স্টেশনে এসেছিল আমাকে অভ্যর্থনা করতে। সঙ্গে তার সরকারি গাড়ি ছিল। গাড়িতে বসে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল: তোর জন্যে এমন প্রোগ্রাম করেছি যে তোকে খুশী হতেই হবে। এ অঞ্চলটার কোন কিছু বাদ যাবে না।

তার উৎসাহ আমার ভাল লাগল, বললুমঃ সত্যি নাকি!

অনিমেষ তার বউএর দিকে তাকিয়ে বললঃ তুমিই বলতো, কেমন ব্যবস্থা করেছি।

অমন ছুটোছুটি কি ওঁর ভাল লাগবে!

আলবৎ লাগবে। কি রে, কলকাতায় থেকে কি তুই কুনো হয়ে গিয়েছিস নাকি?

হেসে বললুমঃ কত দূর যেতে হবে শুনি।

আমরা একটা ছোট স্টেশন ওয়াগনে বসে ছিলুম। সরকারি ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। বাজারের ভিতর দিয়ে গাড়িটা একটা সিমেন্টের পুলের উপর উঠল। তাই দেখে অনিমেষ বললঃ বাঙলার সীমানা এইখানে শেষ হয়ে গেল। এটা বরাকর নদীর পুল। এপারে বাঙলা, ওপারে বিহার। খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতে পাঞ্চেতের পথ, আমরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে ডান হাতে মোড় নেব।

একটু দম নিয়েই বললঃ তোর কপালটা খুব ভাল।

কেন?

এখন শুক্লপক্ষ। আজ রাত্তেই তোকে মাইথনটা দেখিয়ে দিতে পারব।

বাধা দিয়ে তার স্ত্রী বললঃ এ তোমার জুলুম। সারা দিন অফিস করেছেন, তারপরে ট্রেন ধরে এত দূর এসেছেন। একটু বিশ্রাম করতেও দেবে না!

বিশ্রাম আর কতক্ষণ করবে! চা খেয়েই তো ডিনারে বসব না! চাঁদের আলোয় একটু ঘুরে এলে ক্ষিধেও জমবে, মনও প্রফুল্ল হবে। তাই না!

বলে আমার দিকে তাকাল।

হেসে বললুমঃ খাঁটি কথা।

অনিমেষ খুশী হয়ে তার স্ত্রীকে বলল: দেখলে তো, আমার বন্ধুকে আমি কী বকম চিনি!

এই মন্তব্য শুনে মনে মনে আমি হাসলুম। স্কুলে আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। কলেজে দেখা হত ক্বচিৎ কদাচিৎ। আমি কলাব ছাত্র, আব সে বিজ্ঞানের। দু বছব পবে একেবাবেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তাব পব দেখা হল এই সে দিন। অনিমেষ কিন্তু আগেব মতোই আছে— সরল অন্তবঙ্গ ও বন্ধু-বৎসল। এখনও তাব অনুবোধে আবেগ আছে। সেই জন্যই তাব নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কবতে পাবি নি।

এতক্ষণ আমবা বেল লাইনেব দক্ষিণ দিযে যাচ্ছিলুম। এবাবে তাব নিচে দিয়ে উত্তবে এলুম। অনিমেষ বলল: এই জায়গাটার নাম কুমাবডুবি। সাধাবণ লোকে এই স্টেশনে নামে। যে গাড়িতে এলি সে গাড়িও এখানে দাঁড়ায়।

তবে তো এইখানেই নামতে পাবতুম।

অসুবিধা হত। ভাল প্ল্যাটফর্ম নেই, অন্ধকাবে এই মিটমিটে স্টেশনে নামলেই তোব মন খাবাপ হয়ে যেত।

ডি.ভি সি-ব সরু পথ ধবে গাড়ি আমাদেব খুব ছুটেছে। অনিমেষও অনর্গল কথা বলছে: কাল ভোব বেলাতেই আমবা বেবিয়ে পড়ব, বুঝলি। তোব জন্যে আমি অনেক জায়গাব কাজ সংগ্রহ কবেছি।

অনিমেষেব স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা কবলুম: আপনিও সঙ্গে থাকবেন তো?

উত্তর অনিমেষ দিল, বলল: আলবৎ থাকবে। এই রকম সঙ্গী না থাকলে কি ভ্রমণ জমে!

বলে সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল। তাব স্ত্রী লজ্জা পেয়েছিল। তাই দেখে আমি বললুম: কিছুই জমে না। জীবন তো নয়ই, গল্প উপন্যাসও না। কিন্তু সাবধান, ভ্রমণকাহিনী লিখতে হলে মেয়েদের কথা সন্তর্পণে বাদ দিতে হবে।

কেন ?

পত্র পত্রিকায় আজকাল বইএর সমালোচনা যাঁরা করেন, তাঁদের এই মত। মেয়ে যাত্রীর কথা লিখে ভ্রমণকাহিনীর মান নাকি একেবারে নেমে গেছে।

সঙ্গে মেয়ে থাকলেও তা লেখা যাবে না ?

তাহলে উপন্যাস লেখ, ভ্রমণকাহিনী কেন! ভ্রমণের মতো পবিত্র কাজ কী সঙ্গে মেয়ে নিয়ে হয়! একটু অন্তরালে যদি একটা মিষ্টিকথা বলে ফেলে!

অনিমেষ আমার মুখের দিকে তাকিয়েই হেসে ফেলল, বলল : এ বুঝি সমালোচকদের কথা!

শাস্ত্রবাক্য আমরা আজকাল মানি না বলেই এই বিপত্তি। পথি নারী বিবর্জিতা। পুরাকালের মানুষ এ কথা মানত বলেই জলধর দাদা তাঁর ভ্রমণকাহিনীর শুচিতা রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, অনিমেষের স্ত্রী মিষ্টি করে হাসছে। অনিমেষ হেসে বলল : তাহলে দেখছি শীলাকে বাড়িতে রেখে যেতে হবে।

রক্ষা কর, নিজেদেরকে অমন শাস্তি দিও না।

মাইথনের আলোকিত লোকালয়ে তখন প্রবেশ করেছি। একই ধরণের সারি সারি বাড়ি। সামনে একটু খানি করে ফুলের বাগান। দু একবার দক্ষিণে বামে ফিরে অনিমেষের বাড়িতে আমরা পৌঁছে গেলুম।

গাড়ি থেকে নেমে অনিমেষ ড্রাইভারকে বলল : আমরা আবার বেরব।

৬

অনিমেষের ছোট সংসারটি সুন্দর সাজানো। মেঝের কার্পেটে জানালার পর্দায় আর ঘরের আসবাবে একটা সুরুচিব পবিচয়। আমি তাকিয়ে দেখলুম, এই পরিবেশে ওদের দুজনকে বেশ মানিয়েছে।

পাশের খাবার ঘরে আমরা চা খেলুম। শুধু চা নয়, নানা রকমেব খাগু ছিল। পবিচ্ছন্ন পোষাকে তার বেয়ারা সব এগিয়ে দিচ্ছিল। চা শেষ হতেই অনিমেষ তার সিগারেটের কেস এগিয়ে দিল।

বললুম ঃ খাই নে।

সে কি !

বলে অনিমেষ নিজে একটা সিগারেট ধরাল। তাবপব বেববার জন্য উঠে দাঁড়াল।

শীলা আমাকে বলল ঃ আপনার নিশ্চয়ই এখন বিশ্রাম কবতে ইচ্ছা করছে।

অনিমেষ অসহিষ্ণু ভাবে বলল ঃ ওকে কি আমি পাহাড় ভাঙতে নিয়ে যাচ্ছি !

সহাস্যে শীলা বলল ঃ উপায় থাকলে তাও করতে।

আমাব দিকে ফিরে বলল ঃ কাল পরশু আপনাকে ঘোবাবার যে ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আর আমাদের মুখ দেখতে চাইবেন না।

সত্যি নাকি !

বলছি আপনাকে।

আমিই বলছি।

বলে অনিমেষ বলল ঃ কাল ভোর ছটায় যাত্রা। তোপচাঁচি পবেশনাথ হয়ে বোকাবো কোনার, বাগোদারেব ডাক বাংলোয় লাঞ্চ, সেখান থেকে তিলাইয়া কোনার হয়ে হাজাবিবাগে রাত্রিবাস। সকালে বাঁচি, সন্ধ্যায় মাইথন।

আমি আশ্চর্য হযে তাব কথা শুনছিলুম। সে থামতেই শীলা বলল ঃ গাড়ি যদি ভেঙে না পড়ে তো কোমব আপনাব ভাঙবেই। বেববাব আগেই সব দিক ভেবে বেববেন।

আমাব এ আয়োজন মন্দ লাগল না। কষ্ট যতই হোক, এ একটা নূতন অভিজ্ঞতা হবে। সেই আনন্দেব চেয়ে কোন কষ্টই বেশি মনে হবে না। বললুম ঃ পা একবাব ভেঙেছিল, কিন্তু কোমব ভাঙে নি। কোমব ভাঙলে বোধহয় আবও বেশি বিশ্রাম পাওয়া যাবে।

সাবাশ!

বলে অনিমেষ আমাব হাত ধবে টানল। শীলাও বেবিযে এল আমাদেব পিছনে।

বাত তখনও বেশি হয নি। বোধহয় আটটা সবে বেজেছে। কিন্তু অন্য দিনেব মতো অন্ধকাব ঘনায নি। আকাশেব চাঁদ অবাবিত হাতে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমবা মোটবে চেপে অনেকটা নির্জন পথ পেবিয়ে মাইথনেব বাঁধেব উপবে এসে পৌঁছলুম। তাব পব গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে অগ্রসব হলুম খানিকটা।

অনিমেষ কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে শীলা বলল ঃ দোহাই তোমাব, ছুচোখ ভবে আমাদেব দেখতে দাও। তোমাব কিলোওয়াট আব কিউবিক ফিটেব গল্প পবে শুনিও।

ঠিক এই মুহূর্তে আমাব স্বাতিব কথা মনে হয়েছিল। সেও আমাকে অনেক ভাবে অনেক জায়গায় এই কথা জানিয়েছে। ছু চোখ ভরে দেখার যে আনন্দ, সে আনন্দ নেই তথ্যের পাহাড়

বয়ে। তত্ত্ব যেমন শিল্পকে সমৃদ্ধ করে না, তেমনি তথ্য মধুরতর করে না ভ্রমণের আনন্দ। রাজস্থান ভ্রমণে বেরবার আগে স্বাতি তাই লিখতে পেরেছিল ঃ এবারে তুমি সঙ্গে থাকবে না বলে আরও ভাল লাগছে। চোখ জুড়িয়ে আব প্রাণ ভরে দেখতে পাব, ইতিহাস আর তত্ত্বের চাপে খাবি খেতে হবে না।

আমি নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছিলুম। নিজের জন্য যত, তার চেয়ে বেশি স্বাতির জন্যই। এ যুগের জনতার এই মত আমি জানি, দুঃখেব সঙ্গে তাকে স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু কোন কারণে ভেবেছিলুম যে স্বাতি এই জনতার একজন নয়, সে তার ঊর্ধ্বে। তার এই কথা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হলে মর্মান্তিক আঘাত পাব। মিথ্যা মনে করেও আমি দুঃখ পেয়েছিলুম। স্বাতি কেন জনতার কথা বলবে!

অনিমেষ অভিমান করে শীলার উত্তর দিল ঃ আমি কিছুই বলব না, যা বলবার তুমি বল।

না না, তুমিই বল।

আমি নিজেই অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম। পশ্চিম দিক থেকে বরাকর নদী বয়ে আসছিল। এই পাহাড়ের মতো উঁচু বাঁধ দিয়ে নদীকে আটকে দেওয়া হয়েছে। ক্রমে ক্রমে নদীর জল জমে বিরাট এক জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বাঁধের নিচে আছে সারি সারি লোহার দরজা। সেগুলি বন্ধ। দু একটি খোলা দরজা দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে জল আসছে জলপ্রপাতের মতো। নদীর শীর্ণ খাত দিয়ে সেই জল বয়ে যাচ্ছে।

বাঙলার ভয়ঙ্কর নদী দামোদর। মাঝে মাঝেই দুরন্ত বন্যায় বিধ্বস্ত করে দিয়ে যায় সোনার দেশ। অতীতে মানুষ অসহায় ভাবে এই অত্যাচার সহ্য করেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। আজকের মানুষ অত অসহায় নয়। নদীকে তারা বাঁধতে শিখেছে। দামোদরকেও বেঁধেছে।

এক জায়গায় নয়, নানা জায়গায়। এক দিক থেকে কোনার আর এক দিক থেকে বরাকর এসে দামোদরে মিশেছে। কোনারকে বেঁধেছে কোনার ড্যাম করে, বরাকরকে বেঁধেছে তিলাইয়া ও এই মাইথনে। আরও নিচে পাঞ্চেৎ ড্যাম ও দুর্গাপুর ব্যারেজ। এ সমস্ত ব্যবস্থাই দামোদরকে শাসনের জন্যে। কিন্তু এই পরিকল্পনা থেকে আরও উপকার পাওয়া যাচ্ছে। সমস্ত বিহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ বেড়েছে। জলবিদ্যুতের কারখানা হয়েছে অনেকগুলি, বোকারোতে থার্মাল স্টেশনও হয়েছে। চাষের জন্য খাল কাটা হয়েছে শত শত মাইল। আর শোনা যাচ্ছে যে দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত জলপথ চালু করা হবে। কয়লা যাবে, ইস্পাত যাবে, আরও অনেক মাল চলাচল করবে। ১৯৪৮ সালে এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে, বেশির ভাগই শেষ হয়ে গেছে। বাকিটুকু কবে শেষ হবে জানা যাচ্ছে না। নানা কলঙ্কের কথাও কাগজে দেখা যাচ্ছে।

অনিমেষ আমাকে আস্তে আস্তে বলল: খুব ভাল লাগছে তোর, তাই না?

আমি বুঝতে পারলুম যে এরা আমাকে লক্ষ্য করছিল এবং আমার চোখে কোন তন্ময় ভাব দেখেছে। আমি তো সৌন্দর্যের কথা ভাবছিলুম না, যা ভাবছিলুম তা বলা উচিত নয়। বললুম: এ দেশেও এ সব হল!

অনিমেষ বলল: নিন্দুকে তবু দুর্নাম করে। বলে, ডি. ভি. সি.র টাকা সবাই লুটেপুটে খেল।

আমি বললুম না যে খবরের কাগজে আমরা অনেক কিছু পড়েছি। সে সমস্ত কথা সত্য হলে লজ্জার শেষ নেই। মনোরঞ্জন বলে, এ আমাদের দেশের চরিত্র। স্বার্থপরতাকে আমরা জীবনের ধর্ম বলে গ্রহণ করেছি এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন অসৎ কর্মকে আমরা গর্হিত বলে মনে করি না। যাদের অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে, তারাই প্রশ্রয় দিচ্ছে দুর্নীতির। কাঁচা পয়সা দিয়ে মানুষের ধর্মকে

কিনে জীবনকে উলঙ্গ করে দিচ্ছে। সেই বন্য বীভৎস চেহারা দেখে আজকাল আর কেউ শিহরে উঠছে না। দেশের সরকার মজা দেখছে, যক্ষ যে তাকেও কিনেছে। বললুম : গৌরী সেনের টাকা যে খেতে জানে না, সেই বোকা।

অনিমেষ উচ্চ স্বরে হেসে উঠল, বলল : ঠিক বলেছিস। আমাদের এক বন্ধুও ঠিক এই কথাই বলছিল। সরকারের টাকা সরকারই নাকি চুরি করছে।

তার কথার ধরণে শীলাও হাসল।

পায়ের নিচে জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। এধার থেকে জলাশয়ের জল লোহার দরজার ভিতর দিয়ে ওধারে গিয়ে পড়ছে। বাঁধের উপর প্রশস্ত রাজপথ, বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সামনের পাহাড় অন্ধকারে মিলিয়ে যায় নি, জ্যোৎস্নায় মায়াময় হয়ে আছে। বললুম : সমালোচনা আজ থাক।

শীলা বলল : আজ অন্য কথা বল।

অনিমেষ বলল : একটা গান গাও।

আমি তৎপর ভাবে বললুম : অনেক দিন গান শুনি নি।

শীলা বলল : এই কি গানের সময় ?

এর চেয়ে ভাল সময় আমি ভাবতে পারি নে।

অনিমেষ বলে উঠল :

এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল
সে মরণ স্বরগ সমান।

আমি বললুম : বালাই ষাট, মরবি কোন দুঃখে !

শীলা হেসে বলল : গাও না সুর করে।

অনিমেষ হেসে বলল :

যার কর্ম তারে সাজে।
অন্য লোকে লাঠি বাজে।

ভয় নেই, লাঠি নিয়ে এখানে কেউ তেড়ে আসবে না।

উজ্জ্বল আলো ফেলে একটা গাড়ি এই দিকে এগিয়ে আসছিল। আমাদের কাছে দাঁড়াল না, পাশ দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল। রাস্তার ধারে আমরা সরে দাঁড়িয়েছিলুম।

অনিমেষ বলল ঃ চিত্তরঞ্জনে যাবার এইটে নতুন পথ।

পুরনো পথ কোন্‌টা?

সীতারামপুর থেকে একটা অপ্রশস্ত রাস্তা রূপনারায়ণপুর হয়ে চিত্তরঞ্জন যায়। এখনও ঐ পথে আসানসোল থেকে বাস চলাচল করে।

শীলা বলল ঃ কল্যাণেশ্বরীর কথা বললে না?

কিছুই তো এখনও বলি নি।

আমি বললুম ঃ সংক্ষেপে বল। তারপরে গান শুনব।

শীলা বলল ঃ গানের কথা আপনি এখনও ভোলেন নি?

ভুলতে পারি না তো, গান শুনতে যে ভালবাসি।

অনিমেষকে তাড়া দিলুম ঃ কল্যাণেশ্বরীর কথা তুমি তাড়াতাড়ি শেষ কর।

অনিমেষ বলল ঃ মোটরে কয়েক মিনিটের পথ। রাত না হলে দেখিয়ে আনতুম। দেবীর মাহাত্ম্য যত তার চেয়ে পরিবেশের আকর্ষণ বেশি। আসানসোল থেকে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির পর্যন্ত বাস আসে। বরাকরের বাজারের ভিতর দিয়েই একটা পথ আছে, তাতে নদীর পুল পেরতে হয় না। বরাকরের উপর আমরা যে পুল পেরিয়ে এলুম, তা মেরামতের দরকার হলে কল্যাণেশ্বরীর সামনে দিয়ে এই পথে নদী পেরতে হয়।

ছোট একটি ঝরণার পাশে অনেক দিনের পুরনো মন্দির। দেবতার টানে যাত্রী আসে তিথি পার্বণে, অন্য সময় শৌখিন মানুষ পিকনিক করতে আসে। জলের ধারে বড় বড় পাথরের উপর বসে গল্প করে, গান গায়। গাছের ছায়ায় উত্তাপ নেই, শিরশিরে বাতাসে দেহমন শীতল হয়। ভাল লাগে।

কল্যাণেশ্বরীর নাম আমি আগে শুনেছি। দেবীর মাহাত্ম্যের

কথাও শুনেছি কারও কাছে। তাঁরই নামে এ জায়গার নাম হয়েছে মায়ের স্থান, বা মাইথন।

অনিমেষ বলল: সময় থাকলে তোকে পাওয়ার স্টেশনটা দেখিয়ে আনতুম।

বললুম: কলকারখানার আমি কিছু বুঝব না।

এখানে মাটির নিচে কারখানা। পাহাড়ের নিচে। উপরে কিছুই নেই।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলুম। অনিমেষ বলল: দেখতে পাচ্ছিস কিছু?

না।

তবে ঠিকই দেখেছিস। একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়।

শীলা বলল: আর এগিয়ে কাজ নেই, রাত অনেক হয়েছে। কাল আবার ভোর বেলাতেই বেরতে হবে।

আমরা আর এগোলুম না।

ফেরার পথে আমি বললুম: এইবারে আপনার গান শুনব।

এখনও ভোলেন নি?

না।

অনিমেষ বলল: তোমার সেই গানটা গাও।

শীলা গুনগুন করে শুরু করল:

চন্দন ভেল বিষম শর রে
ভূষণ ভেল ভারি।
স্বপনহু নহি হরি হরি আয়ল রে
গোকুল গিরিধারী॥
এক শরী ঠাড়ি কদম তর রে
পথ হেরথি মুরারি।
হরি বিনু হৃদয় দগধ ভেল রে
ঝামর ভেল সারী॥

যাহ যাহ তোঁহে উধব হে
তোঁহে মধুপুর যাহে।
চন্দ্রবদনী নহি জাউতি রে
বধ লাগত কাহে।
ভনই বিদ্যাপতি তন্নু মন রে
শুনু গুণবতি নারি।
আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝট ঝারী॥

গাড়ির কাছে এসে শীলা থামল। মনে হল, কোন স্বপ্নলোক থেকে আমরা এই মাটির পৃথিবীতে ফিরে এলুম। এমন সুন্দর পরিবেশে এমন মধুর গান বোধ হয় আগে কখনও শুনি নি। এমন দরদ দিয়ে বোধ হয় সকলে গায়ও না। অনিমেষের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তার দৃষ্টিতে শুধু তৃপ্তি নয়, খানিকটা গর্বও উঁকি দিচ্ছে। আমি সংক্ষেপে বললুম ঃ চমৎকার।

৭

ভোর ছটায় আমরা যাত্রা করতে পারলুম না। খানসামার দেরি হয় নি। সে সাত সকালে ছোটা হাজরি লাগিয়েছিল। দেরি হল অনিমেষের জন্যেই। তৈরি হতে তারই সবচেয়ে বেশি সময় লাগল।

বাহিরের রাস্তায় ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাদের জন্যেই অপেক্ষা। যাত্রা করতে আমাদের প্রায় সাতটা হয়ে গেল।

ডি. ভি. সি-র কলোনি থেকে বেরিয়ে আমরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এলুম। তারপর পশ্চিমের পথ। মসৃণ প্রশস্ত পথ। ধানবাদ জেলার মাঝখান দিয়ে আমরা ছুটে যাচ্ছিলুম।

শীলার গানের কথা আমার মনে পড়ল। আমাদের অনুরোধে যে গানখানি সে গেয়েছিল, সেটা বাংলা গান নয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর গান। উচ্চারণ শুনে শুদ্ধ মৈথিলী বলে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গান শোনার পরে তার ভাষা নিয়ে আমি কোন আলোচনা করতে চাই নি। তাতে হয়তো রসভঙ্গ হত। এইবারে অনেক সময় একত্র থাকতে হবে জেনে আমি সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলুম : কাল আপনি যে সুন্দর গানটি শোনালেন, তা কি মৈথিলী গান ?

শীলা সহাস্যে সমর্থন করল।

কিন্তু অনিমেষ বলল : তুই কি এতক্ষণে এই কথা বুঝলি ?

আমি একটু দেরিতেই বুঝি, তাও শেষ পর্যন্ত সব কথা বুঝি না।

সব কথা না বুঝলেও সন্দেহটা ঠিকই হয়েছে।

আমি শীলার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে বেশ লজ্জা পাচ্ছে।

অনিমেষ বলল : নিতান্ত মাতৃভাষা বলেই বাংলা বলেন, তা না হলে মৈথিলী ভাষাতেই কথাবার্তা হত।

আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। তাই দেখে অনিমেষ বলল : আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জন্ম এঁর বঙ্গে নয়, দ্বারবঙ্গে। বাড়িতে বাংলা বলেছেন, আর পড়েছেন রাষ্ট্রভাষা। বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের বই পড়েছেন রাষ্ট্রভাষায়।

সত্যি নাকি!

লজ্জায় শীলাব মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কোন উত্তব দিল না।

বললুম : তাতে লজ্জার কী আছে! আমি এমন বাঙালী দেখেছি যিনি মাতৃভাষা জানেন না বলতে গর্ববোধ কবেন।

এবারে অনিমেষ আশ্চর্য হল। বলল : এ কথা বিশ্বাস করতে হবে!

বললুম : আমাদেব অফিসেই এক বাঙালী সাহেব আমাদের কর্তা হয়ে এসেছিলেন। বাংলায় তাঁর কথার উত্তর দেওয়াতে তিনি ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। ভেবেছিলুম, শুনতে পান নি। তাই দ্বিতীয়বার বলতে তিনি ইংবেজিতে বললেন, এক্সকিউজ মি, ও ভাষা আমি জানি নে। এ কথা বিশ্বাস করতে আমার নিজেরই অনেক সময় লেগেছিল।

উল্লাসে অনিমেষ হেসে উঠল। শীলা বলল : ভারি মজার তো!

অফিসে টিটকিরি দেবার মতো বাবুও তো অভাব নেই। তা শুনতে পেয়ে তিনি বলেছিলেন যে নিতান্ত শৈশবেই বিলেতে গিয়েছিলেন লেখা পড়া শিখতে। তাই বাঙলা শেখার আর সময় পান নি। বিলেত থেকে মেমও নাকি এনেছেন।

অমিমেষ বলল : আমাদের ঠাকুর্দার আমলে নাকি দেশে এই রকম অবস্থা এসেছিল।

বললুম : না, এই অবস্থা ছিল তাবও অনেক আগে। ঠাকুর্দাদের সময় থেকে মনোভাবের পরিবর্তন হতে শুরু হয়েছে।

অনিমেষ বলল : আমি শুনেছি যে, যিনি যত সাহেবিআনা

শিখে আসতেন, তাঁর তত কদর হত দেশে। দেশের আচার প্রথা ভাষা ও ধর্ম ভুলতে পারলে ইংরেজ সরকার রাজসম্মান দিতেন।

আমার এক বন্ধু বলে, আজও এই মনোভাবের খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। দেশে হিন্দী চালু কবাব ব্যাপারটাই দেখ। সমস্ত দেশের উপর জোর করেই এ ভাষা চাপানো হচ্ছে। সাধারণ স্কুল কলেজে অফিসে আদালতে অসুবিধাব অন্ত নেই। কিন্তু দেশেব নেতা যাঁরা, ধনী ও প্রভাবশালী সম্প্রদায়, তাঁদেব ছেলে মেয়েরা আগেব মতো ইংবেজি স্কুলেই যাচ্ছে। হিন্দী বাঙলার বদলে মাতৃভাষা হচ্ছে ইংরেজি। হিন্দীর দুর্বলতা তাঁবা জানেন। দেশেব আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম চললেও বিদেশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা সম্ভবপর হবে না। কাজেই একটা খাস গোষ্ঠী রক্ষা করা হচ্ছে আম জনতা থেকে স্বতন্ত্র করে।

শীলা আমাকে প্রশ্ন করল : আম জনতা মানে?

মোগল বাদশাহদের দেওয়ানি আম ও দেওয়ানি খাস বুঝি দেখেন নি?

দেখেছি তো।

আম মানে সাধারণ, আর খাস তার উল্টো মানে। ইংরেজ আমলে ইংরেজীনবিশরা কাজ গুছিয়েছেন, এবারে—

অনিমেশ বলল : হিন্দীনবিশরা গোছাবেন।

আমি বললুম : না। গোছাবেন, খাসনবিশেরা।

অনিমেষ হেসে উঠল।

শীলা বলল : কিন্তু এ সব ভেবে আমরা কেন অস্থির হচ্ছি!

অনিমেষ বলল : সত্যিই তো তার বদলে বিদ্যাপতির কথা আমরা আলোচনা করি।

আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। বললুম : সেই ভাল।

অনিমেষ বলল : শীলা বলে যে, বিদ্যাপতি নাকি মৈথিলী কবি। তবে তিনি বাঙলায় কেন কবিতা লিখলেন?

শীলা বলল : দেখুন তো, কী বিপদ! বিদ্যাপতির ভাষা কি বাঙলা! কিছুতেই আমি বোঝাতে পারি নে।

বাঙলা নয় তো কী? 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' কে লিখেছেন? রবীন্দ্রনাথ নয়? রবীন্দ্রনাথ কি মৈথিলী ভাষায় লিখেছেন?

দেখুন, কথা শুনুন।

বলে শীলা অসহায় ভাবে আমার দিকে তাকাল। আমার হাসি পেল তাদের বিবাদ দেখে।

অনিমেষ বলল : তুই হাসছিস তো! হাসবারই কথা। রবীন্দ্রনাথ মৈথিলী ভাষায় কবিতা লিখতেন শুনলে কার না হাসি পায়!

শীলা বলল : আপনি যে ওর কথা শুনে হাসছেন তা আমি বুঝতেই পারছি। দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলুন না!

এর মধ্যে আমার কথা বলা কি ভাল হবে!

অনিমেষ বলল : কেন ভাল হবে না? একজন যা-তা ভুল বলে যাবে, আর তুই চুপ করে শুনে যাবি?

শীলা বলল : আপনি না বোঝালে আপনার বন্ধু কিছুতেই বুঝবে না।

শীলার দিকে তাকিয়ে বললুম : একটা শর্তে আমি রাজী হতে পারি।

বলুন কী শর্ত।

মৈথিলী সাহিত্য সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে হবে।

আমি তো বেশি কিছু জানি না।

যা জানেন তাই বলবেন।

বলব। এবারে আপনি ওকে বোঝান।

অনিমেষ বলল : তুই কি শীলার পক্ষ নিচ্ছিস নাকি?

কারও পক্ষ কেন নেব! যা সত্য তাই বলব।

বেশ।

বলে দুজনেই নড়ে চড়ে বসল।

এই বিবাদ মেটাতে হলে ব্রজ বুলি সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

অনিমেষ বলে উঠল : ব্রজ বুলি তো ব্রজের ভাষা, মানে মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষা।

তার নাম ব্রজ ভাষা, ব্রজ বুলি নয়। ব্রজ বুলি মৈথিলী ভাষারই একটা বিকৃত রূপ। বিদ্যাপতির কাল পঞ্চদশ শতাব্দী, ইংলণ্ডে তখনও শেক্সপীয়রের জন্ম হয় নি। খুব আশ্চর্যের কথা যে বাঙলা দেশে তখন সংস্কৃত শিক্ষার কোন কেন্দ্র ছিল না বলে বাঙালীরা সংস্কৃত শিখতে মিথিলায় যেত। বোধহয় মনে আছে যে চৈতন্য-দেব নবদ্বীপে যে বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে-ছিলেন তিনি মিথিলায় গিয়েছিলেন সংস্কৃত শিখতে। দেখতে দেখতে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন এবং শাস্ত্র বিচারে নিজের গুরুকেও পরাজিত করেছিলেন। এই ধৃষ্টতার জন্য মিথিলার পণ্ডিতরা বাসুদেবের সমস্ত পুঁথি পত্র কেড়ে নিয়ে মিথিলা থেকে তাঁকে বার করে দেন এবং বাঙালী ছাত্র নেওয়া বন্ধ করে দেন।

অনিমেষ প্রশ্ন করল : এ কি সত্য ঘটনা ?

এর উত্তর কে দিতে পারে! প্রাচীন গ্রন্থে এই রকমের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকে। আমরা তা সত্য বলেই মেনে নিই। না মানলে পৃথিবী থেকে অতীত লোপ পাবে, আর ভবিষ্যৎও কোন দিন গড়ে উঠবে না, বর্তমানের বাস্তবের মধ্যে জীবন হবে বিড়ম্বিত। বললুম : দুজন ঐতিহাসিকের কথা জানি—গ্রিয়ার্সন সাহেব ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। অনেক গবেষণার পর তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে বিদ্যাপতি ঠাকুর বাঙালী নন, তিনি মিথিলার অধিবাসী ছিলেন।

অনিমেষ চীৎকার করে উঠল : মিথ্যে কথা। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আমাদের বাঙলার কবি, বৈষ্ণব কবি।

সাধারণ বাঙালী তাই বিশ্বাস করে, ভাবে যে সমস্ত বৈষ্ণব

পদাবলীই বাঙলার সম্পদ। এর ভিতর বাঙালীর গৌরবের বিষয় খানিকটা আছে বৈকি, কিন্তু তার আগে বিদ্যাপতির বাঙালী হবার গল্প বলি। পদাবলী কর্তাদের মধ্যে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও গোবিন্দদাস ঝা এই দুজন ছিলেন মিথিলার মানুষ। মৈথিলী ভাষায় তাঁরা যে পদাবলী রচনা করেছিলেন, লোকেব মুখে মুখে তা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাঙালী ছেলেরা সংস্কৃত পড়তে গিয়ে এই সব গান শিখত, আর নিজের দেশে ফিরে মনের আনন্দে গাইত। অল্প দিনেই এঁদের গান বাঙলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল, শুধু জনপ্রিয় নয়, বাঙলার কবিরাও এই ভাষায় গান বাঁধতে লাগলেন। বাঙালী ছেলেরা সব সময় শুদ্ধ মৈথিলী আনতে পারে নি, বাঙলায় এসে তা আরও বিকৃত হয়ে গেল। এমন কি অনেক শব্দেব কোন অর্থই হত না। লোকে মনগড়া মানে করত।

শীলার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে ভারি খুশী হয়েছে। আমিও উৎসাহ পেয়ে বললুম : এই ভাষারই নাম আমবা ব্রজ বুলি রেখেছি। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ এই ভাষায় কেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী লিখলেন তারও একটি ছোট কাহিনী আছে।

শীলা বলল : বলুন না সেই গল্প।

জীবনস্মৃতিতে ববীন্দ্রনাথ নিজেই সে গল্প লিখেছেন। শৈশবে সরল বাঙলা ভাষায় যে সব কবিতা লিখতেন, তা খুব উচ্চাঙ্গের কবিতা বলে কেউ স্বীকার করতেন না। তিনি ভাবলেন যে তাঁর বয়স কম বলেই বোধ হয় সবাই তাঁর কবিতাও কাঁচা ভাবছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি ব্রজ বুলিতে কয়েকটি কবিতা লিখলেন এবং একদিন প্রচার করলেন যে তিনি একটি পুরনো পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছেন। সেটি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। কবিতাগুলি তিনি খাতা থেকে পড়ে শোনাতে লাগলেন এবং সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। পরে তিনি প্রকাশ করলেন যে ভানুসিংহ তিনি নিজেই।

অনিমেষ প্রবল ভাবে হেসে উঠল। বলল ঃ এই রকমই হয়। আমার এক বন্ধু ছদ্মনামে কবিতা লেখে। বলে যে বাপের দেওয়া নামটা এত খারাপ যে সে নামে লিখলে লোকে নাক সেঁটকাবে।

শীলা বলল ঃ আজ একটা নতুন কথা শিখলাম।

কী?

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমার মনেও একটা খটকা ছিল। ভাবতাম, বিদ্যাপতি যদি মিথিলাবাসী হন তো চণ্ডীদাস কেন বাঙালী হলেন! তাঁদেব লেখা তো একই ধরনের।

উত্তরে আমি বললুম ঃ এবারে আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখুন।

শীলা শিহরে উঠল ঃ সর্বনাশ।

কেন?

আমি আপনাকে কি বলব! আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন।

এটি দুর্বলতার কথা, ইংরেজিতে বলে ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্‌। জীবনযাত্রায় সুখী হতে হলে কোন কম্‌প্লেক্স্‌ থাকা উচিত নয়।

অনিমেষ বলল ঃ কম্‌প্লেক্স্‌ একটা থাকবেই। যার ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্‌ নেই, তার আছে সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্‌। পথে যদি একটা লোক নমস্কার করে, তাহলে কেউ ভাবব, আমাকে তো সকলে নমস্কার করবেই। আবার কেউ ভাবব, আমাকে কেন নমস্কার করল!

বললুম ঃ যে মানুষ সুস্থ, সে কী ভাববে জান?

কী?

সে ভাববে, একটা ভদ্রতা করল, উত্তর দিয়ে যাই। কিংবা সে কিছুই ভাববে না।

তারপরেই শীলাকে বললুম ঃ আর দেরি নয়, শুরু করুন।

শীলা অনিমেষের দিকে তাকাল খানিক ক্ষণ, তার পর ইতস্তত করল আরও কিছুক্ষণ। শেষে জবাব দিল : দ্বারভাঙ্গার স্কুলে হিন্দীর সঙ্গে মৈথিলীও পড়ানো হয়, তাইতেই এক আধটু শিখেছি। এই ভাষা শুনেছি বরাবর অনাদৃত ছিল। মিথিলার লোক এ ভাষায় শুধু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাই বলত, সাহিত্য রচনা করত না। পণ্ডিতেরা শুধু সংস্কৃতেব চর্চা করতেন। বিদ্যাপতি ঠাকুরের মতো পণ্ডিত লোক অবসর সময়ে যে সমস্ত পদাবলী গান রচনা করেছেন, তাইতেই মৈথিলী সাহিত্যের আরম্ভ। দ্বারভাঙ্গার মহারাজারা এই ভাষার উন্নতির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, এবং এই শতাব্দীর শুরু থেকেই সাহিত্যে নাকি নতুন একটা প্রেরণা এসেছে।

একটু ভেবে বলল : আমি খুব বেশি নাম জানি না। তবে চন্দা ঝা জীবন ঝা পরমেশ্বর ঝা ও মুরলীধর ঝার নাম বেশ সুপরিচিত। চন্দা ঝার মিথিলী ভাষা রামায়ণ পড়েছি। খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা এই বামায়ণটি ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই খুব প্রিয়। চন্দা ঝা গান গাইতেন। তাঁর লেখা ভক্তিমূলক গানের খুব আদর আছে। মহেশবাণী তাঁর গানের সংকলন। চন্দ্র পদ্যাবলীর কিছু কবিতাও আমরা পড়েছি।

তাবপর ?

বিব্রত ভাবে শীলা বলল : আমার ভারি মুস্কিল হচ্ছে।

কেন ?

সকলের সব বই তো আমি পড়ি নি, নামও জানি নে অনেকের।

অনিমেষ বলে উঠল : আরে যা জান, তাই বল। তুমি তো এখানে পরীক্ষা দিতে বস নি।

বললুম : খুবই ঠিক কথা। আমরা কিছুই জানি নে, খানিকটা তো জানা হবে।

শীলা বলল : এই দেখুন না, জীবন ঝাদের নাম করলাম, তাঁদের একটা বইএর নামও মনে করতে পারছি না।

বেশ তো, যা মনে পড়ছে তাই বলুন।

শীলা বলল ঃ একখানা মহাকাব্যের নাম মনে আসছে—মুন্সী রঘুনন্দন দাসের লেখা সুভদ্রা হরণ। এঁর আর একখানা খণ্ডকাব্য আছে, তার নাম বীর বালক। তাতে তিনি অভিমন্যুর বীরত্বের কথা লিখেছেন। লালদাস নামে আর একজন কবি অনেক পৌরাণিক কাহিনী লিখেছেন। শুনেছি যে পল্লীগ্রামেই তাঁর জনপ্রিয়তা বেশি।

ভুবনেশ্বর সিংহ একটু নতুন ধরণে লিখেছেন—নতুন ভাব নিয়ে নতুন ভঙ্গিতে। অনেকেই ইশানাথ ঝাকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলেন। একাবলী পরিণয় নামে একটি বিরাট মহাকাব্য লিখেছেন। কবিতা নতুন আঙ্গিকে লেখেন। নাটকও লেখেন। তবে সীতারাম ঝা এখনও বড় কিছু লেখেন নি। তাঁর সমস্ত কবিতাই ছোট ছোট। সরল ভাষা ও সুন্দর ভাবের জন্যে তিনি জনপ্রিয়।

শীলা ভাবছিল।

অনিমেষ বলল ঃ থামলে কেন?

আর কিছু মনে আসছে না।

পেলে তো এখনও পড়তে ছাড় না!

নতুন কবিদের কে ভাল লেখে আর কে লেখে না, তার হদিস পাই নে।

শুধু কবিদের কথাই কেন ভাবছ! তোমাদের গল্প উপন্যাস নেই?

আছে। কিন্তু অধ্যাপক হরিমোহন ঝার আগের লেখা কিছু মনে পড়ছে না।

বোধ হয় কিছু নেই বলেই মনে পড়ছে না।

আমি বললুম ঃ প্রথম যুগে তো শুনেছি শুধু বাঙলা থেকে অনুবাদ হত। বঙ্কিম শরৎচন্দ্র রমেশচন্দ্রের লেখা।

মৌলিক লেখাও ছিল। মনে পড়েছে। কাঞ্চীনাথ ঝার চন্দ্রগ্রহণ

একখানি সামাজিক উপন্যাস। গঙ্গানন্দ সিংহের আগিলাহি একখানি ভাল উপন্যাস।

আগিলাহি মানে?

চঞ্চল মেয়ে। নবরাত্র একখানি ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস। কাব লেখা তা ঠিক মনে নেই, বোধ হয় কালীচরণ ঝাব। আর একখানি উপন্যাস হল মাধবী-মাধব। বাঙলা উপন্যাসের মতো কাহিনী, বিয়েব আগে নায়ক নায়িকাব—

শীলা থামতেই অনিমেষ বলল: বুঝেছি। তোমাদের দেশে বুঝি বিয়ের আগে প্রেম হয় না?

শীলা লজ্জা পেল, কিন্তু উত্তবও দিল: একটা অসম্ভব ঘটনা। সমাজেব কড়াকড়ি এখনও এতটুকু শিথিল হয় নি।

আমি বললুম: এবারে হরিমোহন ঝাব কথা বলুন।

হবিমোহন ঝাব দুখানা বই আমি পড়েছি। বেশ মজার বই। কন্যাদানে তিনি মেয়েদের ইংরেজি শেখার প্রয়োজনের কথা লিখেছেন, আর দ্বিরাগমনে লিখেছেন বিকৃত শিক্ষার পবিণামের কথা। যোগানন্দ ঝা তাঁব ভলমানুষ উপন্যাসে বড়লোকদের আক্রমণ কবেছেন, আব গরিব ব্রাহ্মণদের কথা লিখেছেন শারদানন্দ ঝা তাঁব জয়বার উপন্যাসে। এবারে দ্বাবভাঙ্গায় গিয়ে আরও কয়েকখানি উপন্যাস পড়েছি—রহস্য পারো কুমার, কিন্তু লেখকদের নাম আমার মনে নেই।

ছোটগল্পও পড়েছি অনেক। মিথিলাব বর্তমান সমাজেব নানা সমস্যা নিয়ে লেখা আধুনিক ধরণের গল্প। সব চেয়ে ভাল লেগেছে হরিমোহন ঝার প্রণম্য দেবতা বইটি। হাসি আর ব্যঙ্গ দিয়ে তিনি সমাজের কুসংস্কারের কথা বলেছেন।

শীলাকে থামতে দেখে আমি বললুম: নাটক?

নাটক আমি পড়ি না, শুনেছি ভাল নাটক নাকি আজও লেখা হয় নি। সেকালের কবিরা কয়েকখানা নাটক লিখেছিলেন—

জীবন ঝা মুন্সী রঘুনন্দন দাস আর ইশানাথ ঝা—সেগুলি এখনও চলছে। ভানুনাথ ঝার প্রভাবতী হরণ নাকি প্রথম মৈথিলী নাটক, তবে সংস্কৃত মেলানো মৈথিলী।

আমাদের গাড়ি তখন একটি লোকালয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। অনেক ঘরবাড়ি দোকানপাট। অনিমেষ এই জায়গাটার কী নাম বলেছিল, তা মনে নেই। কিন্তু এইখান থেকে যে ধানবাদের পথ বাঁ হাতে বেঁকে গেছে, সেই রকম মনে পড়ছে। অনিমেষ ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়েছিল সোজা তোপচাঁচি যাবার জন্যে।

আমাদের আলোচনার বিষয় আমি ভুলে যাই নি। বললুম: আর একটু জানতে পারলেই আমাব কৌতূহল মিটবে।

শীলা ভয়ে ভয়ে বলল: আরও?

বললুম: শুধু গদ্য বা প্রবন্ধ সাহিত্যের কথা।

প্রবন্ধ আমার ভাল লাগে না।

তবু।

শীলা ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল: ধর্ম দর্শন সাহিত্য ও নানা শাস্ত্র বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আজকাল পণ্ডিতরা লিখছেন। মিথিলায় সংস্কৃত পণ্ডিতের অভাব নেই। তাঁরা যে সব বই লিখছেন, তা আমার নাগালের বাইরে।

অনিমেষ হেসে উঠল। বলল: নাও, একটা লজেন্স নাও, গলা নিশ্চয়ই শুকিয়ে উঠেছে।

বলে পকেট থেকে এক মুঠো লজেন্স বার করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল।

৮

মিথিলা নাম আবার নূতন করে এ দেশে প্রচলিত হচ্ছে। এ নাম এই দেশের মতো প্রাচীন, এ দেশের ইতিহাসের মতো। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু ছিলেন ভারতের তথা পৃথিবীর প্রথম রাজা। তাঁর এক শত পুত্রের মধ্যে যে তিনজন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাদের একজনের নাম নিমি। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে রাজা নিমি অপুত্রক ছিলেন। মুনিরা তাঁর মৃত্যুর পরে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হবে মনে করে তাঁর দেহ অরণিতে মন্থন করেন। এই মন্থন থেকে যে কুমারের জন্ম, তাঁর নাম জনক। জনকের পিতা বিদেহ, এবং মন্থনের জন্য নিমির নাম হল মিথি। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কাহিনী আছে।

ভবিষ্যপুরাণে আছে যে নিমির পুত্র মিথি তীরহুতের এক দেশে নিজের নামে মিথিলাপুর নগর নির্মাণ করেন। নগর নির্মাণে সক্ষম বলে তাঁরই নাম জনক।

বাল্মীকি রামায়ণে সমস্ত সরল করে নেওয়া হয়েছে। নিমির পুত্র মিথি, জনক মিথির পুত্র। আর জনক নাম কোন একজন রাজার নয়। মিথিলাপতিরা প্রত্যেকেই জনক নামে পরিচিত। রামায়ণে আমরা যে জনক রাজার উল্লেখ পাই, তিনি হ্রস্বরোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজর্ষি সারধ্বজ। ইনিই যজ্ঞভূমিতে সীতাকে লাভ করেন। তাঁর নিজের কন্যার নাম ঊর্মিলা। সাঙ্কাশ্য নগরের রাজা কুশধ্বজ তাঁর ভ্রাতা। কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির বিবাহ হয় ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে।

ভবিষ্যপুরাণে যে তীরহুত নাম পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে মিথিলা এই নামেও পরিচিত ছিল। অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তীরভুক্তি নাম পাওয়া যায়। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে আছে যে বিদেহ বা

তীরভুক্তি দেশ গণ্ডকী নদীর তীর থেকে চম্পারণ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে মিথিলার সীমা ও আয়তন নির্ণীত হয়েছে। কৌশিকী থেকে গণ্ডকী পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে চব্বিশ যোজন, এবং দক্ষিণে গঙ্গা থেকে উত্তরে হৈমবত বন বা হিমালয় পর্যন্ত ষোল যোজন বিস্তৃত। উত্তরে হিমালয় ও বাকি তিন সীমায় নদী প্রবাহিত বলে রাজ্যের তীরভুক্তি নাম সার্থক হয়েছে।

রামায়ণের বর্ণনা থেকে মোটামুটি ভাবে মিথিলার দিক নির্ণয় করা যায়। রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বামিত্র সরযূর দক্ষিণ তীরে এসেছিলেন অযোধ্যায় অর্ধযোজন দূরে। গঙ্গা-সরযূর সঙ্গম দর্শন করে নৌকা যোগে দক্ষিণে যাত্রা করেন। কিছু দূরে যে অরণ্য দেখা গেল, বিশ্বামিত্র বললেন যে পূর্বে সেখানে মলদ ও করূষ নামে দুই জনপদ ছিল। তাড়কা ও তার পুত্র মারীচের অত্যাচারে তা ধ্বংস হয়েছে। রাম লক্ষ্মণ অর্ধযোজন দূরে গিয়ে তাড়কা বধ করে মহাত্মা বামনের সিদ্ধাশ্রমে উপনীত হন। সেখান থেকে তাঁরা মগধ রাজ্যের অন্তর্গত শোন নদীর তীরে আসেন। প্রভাতে যাত্রা করে দুপুরে পৌঁছান গঙ্গার দক্ষিণ তীরে। নৌকায় নদী পার হয়ে বিশালাপুরী। প্রভাতে তাঁরা গৌতমের আশ্রমে পৌঁছান। মিথিলায় এই আশ্রম। গৌতম ছিলেন মিথিলার রাজা জনকের পুরোহিত। অহল্যা উদ্ধারের পর তাঁরা উত্তর-পূর্বে অগ্রসর হয়ে জনকের সভায় উপস্থিত হলেন।

মহাভারতেও এই মিথিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণ্ডবরা মিথিলায় এসে বিদেহরাজকে পরাজিত করেন।

বিশালা বা বৈশালীর উল্লেখ পাওয়া যায় হিউএন চাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। তিনি লিখেছেন যে গঙ্গার উত্তর প্রদেশের নাম ছিল বৃজি। তার তিন খণ্ড বৈশালী তীরভুক্তি ও মিথারি নামে পরিচিত ছিল।

এই সব উল্লেখ থেকেই প্রাচীন মিথিলার বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

জমিদারী দেন। রঘুনন্দন সত্যই পণ্ডিত ছিলেন, নির্লোভ জ্ঞানী মানুষ। জমিদারী তিনি তাঁর গুরু মহেশ ঠাকুরকে অর্পণ করে দিগ্বিজয়ে বাহির হলেন। মহেশ ঠাকুর মধ্যভারতের ব্রাহ্মণ। এ দান গ্রহণে তাঁর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শিষ্যের অনুরোধে তা গ্রহণ করেন। পরে আবার তিনি তা ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। মহেশ ঠাকুরের যখন মৃত্যু হল, দেশে তখন রঘুনন্দন পণ্ডিতও নেই, দিগ্বিজয় শেষ করে তিনি আর দেশে ফেরেন নি। এই অবস্থায় মহেশ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গোপাল ঠাকুর দিল্লী গিয়ে নিজেদের নামে সম্পত্তির বন্দোবস্ত করে নেন। দ্বারভাঙ্গার বর্তমান মহারাজারা এই বংশেরই মানুষ। এরাই মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন।

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। অনিমেষ বলে উঠল : অমন গম্ভীর হয়ে কী ভাবছিস ?

সত্যি কথা আমি বললুম না, সে কথা স্বীকার করতে লজ্জা হল। সকালের রোদ এখন মধুর, বাতাস স্নিগ্ধ। অনিমেষ ও শীলার মতো সঙ্গী পাশে থাকতে আমি ইতিহাসের কথা ভাবছি, এ কথা জানলে এরা হাসবে। স্বাতি আমাকে চিনেছিল, চিনেছিলেন মামাও। তিনি বলতেন, একটু জোরে জোরে ভাব, আমরাও শুনি। আর স্বাতি বলত, রক্ষে কর, দু চোখ ভরে এখন দেখতে দাও।

আমি হয়তো আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তুম। কিন্তু অনিমেষ তা হতে দিল না, বলল : কিরে কথা কইছিস না যে ?

বললুম : কী জিজ্ঞেস করব, তাই ভাবছি।

হা হা করে অনিমেষ হেসে উঠল, বলল : সত্যি তো, এ একটা মস্ত ভাবনার কথা।

শীলা হাসল না, বলল : তুমি হাসছ, কিন্তু এ একটা ভাবনারই কথা।

কেন ?

সারাক্ষণ কি মানুষ কথা বলতে পারে, না সারাক্ষণ কথা শুনতেই চায় ! কিছুক্ষণ তো তার চুপ করেও থাকতে ইচ্ছে করে !

সবাই কি তোমার মতো ?

তোমার মতোও সবাই নয়।

বলে শীলা হাসল।

আমি দেখলুম যে অনিমেষকে কথা বলতে দিলেই বিবাদ বাধবে। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলুম : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

অনিমেষ অন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই শীলা জবাব দিল : তোপচাঁচি।

নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথাও কিছু পড়ি নি।

উত্তর এবারে অনিমেষ দিল, বলল : গয়া কাশীর মতো কোন পবিত্র তীর্থ হলে বইএ পড়তিস। চমৎকার পিকনিকের জায়গা, সিনেমার ছবিতে হয় তো দেখেছিস।

আমি বললুম না যে সিনেমার অভিজ্ঞতা আমার অকিঞ্চিৎকর। তার আগেই অনিমেষ বলল : কী ছবিটা যেন ?

কোন্‌টা ?

যাতে তোপচাঁচির লেকটা দেখিয়েছে ! নায়ক-নায়িকা নৌকোয় চেপে—

সেই ডাক্তারদের কাণ্ড তো ! ছবির নামটা ভুলে গেছি।

ভাবতে ভাবতেই অনিমেষ বলল : তোমার এমন ভুলো মন !

তুমিও তো মনে করতে পারছ না !

আমি বললুম : বুঝতে পেরেছি।

কী বল্‌তো !

গম্ভীর ভাবে বললুম : সে ছবির একটা নাম আছে।

খুব বুঝেছিস।

বলে অনিমেষ হেসে উঠল।

পথের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছিলুম যে আমরা এখন তোপ-চাঁচির কাছাকাছি এসে গেছি। পথ আর আগের মতো সমতল আর মসৃণ নয়। পাহাড়কে পাশে ফেলেও যাচ্ছি না। মনে হচ্ছে যে পাহাড়ের মাঝখানে গিয়ে ঢুকছি।

মোটর এসে এক জায়গায় দাঁড়াল। আর অনিমেষ বলল: এইখানে নামতে হবে।

দরজা খুলে নামতে নামতে বললুম: হাঁটতেও হবে নাকি!

অন্য ধার থেকে শীলাও নেমে পড়েছিল। বলল: হাঁটতে আমারও ভাল লাগে না।

অনিমেষ বলল: এই তো সামনেই লেক। একে আবার হাঁটা বলে নাকি!

সত্যিই ভাই, খানিকটা এগোতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। পাহাড়ে ঘেরা বিরাট জলাশয়। একটুখানি বাগানের ভিতর দিয়ে আমরা জলাশয়ের ধারে এসে পৌঁছলুম। স্বচ্ছ নীল জল স্থির নিস্তব্ধ। জন কয়েক লোক ঘাটে ধারে বসেছে। জলের কাছেই মাছ লাফাচ্ছে। একখানা নৌকো বাঁধা আছে পারে।

শীলা বলল: আজ পিকনিক করতে কেউ আসে নি।

অনিমেষ বলল: সময় হয় নি। একটু বেলা হলে ঠিক এসে জুটবে।

কয়েকটা খালি কৌটো এধারে ওধারে ছিটনো আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে লোকে এই জায়গাটাকে চড়ুইভাতির উপযুক্ত মনে করে। এক সঙ্গে পাহাড় আর জলের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। উত্তর ভারতে আছে নৈনিতাল ভীমতাল সাততাল, কাশ্মীরে ডাল নাগিন নাসিম লেক, আবু পাহাড়ে নকি লেক, আজমীরে পুষ্কর, ও দক্ষিণ ভারতে উটি ও কোডাইকানাল। ভারতের আর কত জায়গায় এমন সরোবর আছে, আমরা তার খবর জানি নে। তোপচাঁচির কথাই আমি জানতুম না।

দূরের একটা পাহাড় দেখিয়ে অনিমেষ বলল : ঐটে পরেশনাথ পাহাড়।

উপরে উঠবে ভাবছ না কি?

সর্বনাশ! তাহলে আজ এইখানেই রাত্তি কাটাতে হবে।

তোপচাঁচির সুন্দর পরিবেশে আমরা বেশি সময় কাটাতে পারলুম না। অনিমেষ বলল : থামলে আমাদের চলবে না।

ফিরে এসে আমরা আবার গাড়িতে বসলুম।

পরেশনাথের পথে অনিমেষ বলল : এই অঞ্চলের পথ ঘাট বড় ইণ্টারেস্টিং। এক্স্‌প্লোর করে আনন্দ আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম : কী রকম ?

অনিমেষ বলল : সঙ্গে একখানা ম্যাপ থাকলে দেখিয়ে দিতে পারতুম।

শীলা বলল : মুখেই বল না।

অনিমেষ বলল : যে পথ ধরে আমরা এসেছি সেটি হল ভারতের প্রধান রাজপথ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এই পথ থেকে অনেক বড় বড় রাস্তা বেরিয়েছে। বরাকর থেকে একটা বড় রাস্তা আদ্রা হয়ে পুরুলিয়া এসেছে। টাটানগর পর্যন্ত যাওয়া যায়, কিন্তু বরাভূমের পর পথ তত ভাল নয় বলে শুনেছি। সুবর্ণরেখার উপরে পুল হয়েছে কিনা জানা নেই। মোটর বাস আজকাল ধানবাদ থেকে রাঁচি যাতায়াত করছে। এই পথ মুরি হয়ে পুরুলিয়ার দিকে যায়। কিন্তু পুরুলিয়া পৌঁছবার আগেই উত্তরে মোড় নিয়ে ধানবাদে আসে। পরেশনাথ থেকে গিরিডি মাত্র সাতাশ মাইল, আমরা এইখান থেকেই দক্ষিণে বার্মোর দিকে নামব। জি.টি. রোডের উপর বাগোদার একটা বড় জায়গা। হাজারিবাগ রোড স্টেশন থেকে যাঁরা হাজারিবাগ শহরে যাবেন, তাঁদের এই বাগোদারের উপর দিয়ে যেতেই হবে। পাটনা থেকে সোজা রাস্তায় গয়া আসা যায় না, রাজগীর নালন্দা নওয়াদা হয়ে আসতে হয়। গয়া থেকে জি. টি. রোডে আসবার সোজা পথ দুটো আছে, আর একটা পথ নওয়াদা থেকে কোডারমা হয়ে জি. টি. রোডে আসে। পাটনা থেকে যাঁরা রাঁচি আসবেন, তাঁরা আসবেন রাজগীর নালন্দা নওয়াদা কোডারমার

পথে হাজারিবাগ হয়ে। আমরা পরেশনাথ থেকে দক্ষিণের পথ ধরব। বার্মো বোকারো কোনার হয়ে যাব বাগোদার, সেখান থেকে জি. টি. রোড ধরে তিলাইয়া, ফিরব হাজারিবাগে।

শীলা বলল : পারবে তো এক দিনে ?

কেন পারব না !

আমি প্রশ্ন করলুম : কত মাইল পথ ?

তা দুশো মাইল হবে বৈকি।

হিসেব করে বললুম : পাঁচ-ছ ঘণ্টা সময় লাগবে।

শীলা বলল : দেখতেও কিছু সময় লাগবে। তার ওপর তোমার সরকারি কাজ।

অনিমেষ বলল : বারো ঘণ্টা লাগলেও ক্ষতি নেই। ডিনারের আগেই হাজারিবাগ পৌছব।

মনে আসছিল, ম্যান প্রপোজেস অ্যাণ্ড গড ডিসপোজেস। কিন্তু মুখে বললুম : সময় মতো পৌছলে ডিনারটা ভাল জমবে।

ঠিক বলেছিস।

শীলা হাসছিল। বলল : এখুনি ক্ষিদে পেয়েছে বলে যেন মনে হচ্ছে।

অনিমেষ বলল : ক্ষুধা স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

পরেশনাথে আমরা নামলুম না। নামবার উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই। রাস্তার ধার থেকে এই পাহাড় উঠেছে চার হাজার চার শো একাশি ফুট। এত উঁচু পাহাড় এ অঞ্চলে নেই। হাজারিবাগ ও রাঁচি—দুটি শহরই মালভূমির উপর। হাজারিবাগ দু হাজার ফুট উঁচু, রাঁচি তার চেয়ে দুশো ফুট বেশি। এই দুটি শহরে যাবার জন্য পায়ে হাঁটতে হয় না। অথচ পরেশনাথে উঠতে হলে হাঁটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অবশ্য পরেশনাথ তীর্থ না হয়ে শহর হলে পথঘাট সুগম হত।

অনিমেষ বলল : পরেশনাথ পাহাড়ে কখনও উঠিস নি ?

বললুম ঃ না।

ভালই করেছিস।

কেন ?

ধর্মের টান প্রবল না হলে ও পাহাড়ে ওঠা যায় না। দেখতে পাচ্ছিস না, এই পাহাড় ভাঙা কি সহজ কাজ! মন্দির একেবারে চূড়োর উপর।

পথ থেকে সাদা মন্দির দেখতে পেয়েছিলুম। বললুম ঃ দেখেছি।

শীলা বলল ঃ এসো না, একবার উঠে দেখি।

তা দেখবে বৈকি। মাঝ রাস্তা থেকে কাঁধে করে আমাকে তুলতে হবে।

তার আগে তুমি নিজেই বসে পড়বে।

অনিমেষ বলল ঃ তাহলে বলে দেব ?

তাচ্ছিল্য ভরে শীলা বলল ঃ কী বলবে ?

তাড়াতাড়ি আমি বললুম ঃ যাক, আর বলে কাজ নেই। তার চেয়ে পাহাড়ে ওঠার কী ব্যবস্থা আছে তাই বল!

অনিমেষ শীলার প্রতি একটা কটাক্ষ করে বলল ঃ সাধারণ যাত্রীর শুনেছি কষ্টের শেষ নেই।

কেন

পাহাড়ে ওঠার ছুটো পথ আছে। একটা দক্ষিণ থেকে আর একটা পাহাড়ের উত্তর থেকে। কেউ নিমিয়া ঘাট স্টেশনে নেমে একটা পথ ধরে, আবার কেউ ধরে মধুবনের পথ। পরেশনাথ স্টেশন থেকে মধুবন চোদ্দ মাইল পথ, আর গিরিডি থেকে বাসের পথে কুড়ি মাইল। অনেকে গয়া থেকেও আসে ইস্‌রি হয়ে। লোকে বলে, নিমিয়া ঘাটের পথটাই ভাল, মধুবনের পথ চড়াই বলে বেশি কষ্টসাধ্য। যাত্রীরা তাই নিমিয়া ঘাটের পথে পাহাড়ে উঠে মধুবনের পথেই নেমে আসে। তাতে বেশি হাঁটতে হলেও কষ্ট কম হয়। যাত্রা করতে হয় শেষ রাতে। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কোন

রকমে ওঠা যায়, রোদ প্রখর হলে প্রাণটা বেরতে শুধু বাকি থাকে।

সাড়ে চার হাজার ফুট পাহাড় ভাঙা যে সহজসাধ্য নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তবু জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কত মাইল পথ?

তা এক যোজনের বেশি হবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম ঃ সত্যি নাকি!

অনিমেষ বলল ঃ ওঠা নামায় ছ মাইল করে বারো মাইল, আর পাহাড়ের উপরেও মাইল ছয়েক ঘুরলে সব মন্দিরগুলো দেখা যায়।

মন্দির কি একটা নয়?

পাগল হয়েছিস! জৈন মন্দির কখনও এক জায়গায় একটা হয়!

তা হয় না। জুনাগড় ও পলিতানা শুনেছি মন্দিরের শহর।

এখানেও মন্দির আছে গোটা পঁচিশেক। প্রত্যেক তীর্থঙ্করের বোধ হয় এক একটি করে মন্দির। মূল মন্দির পরেশনাথের।

শীলা বলল ঃ পাহাড়ের নিচে পৌঁছতেও নাকি মাইল ছয়েক হাঁটতে হয়। স্টেশন থেকেও ছ মাইল, বাসের রাস্তা থেকেও ছ মাইল।

খাওয়া দাওয়া ও থাকবার ব্যবস্থা?

ধর্মশালা আছে। পরেশনাথের দিকে দিগম্বর ধর্মশালা। খাদ্য হল ছাতু ও মুড়ি। মধুবনে ব্যবস্থা জমজমাট। তের পন্থী বিশ পন্থী শ্বেতাম্বর মন্দির, খেতে পাবে পুরি আর লাড্ডু।

অনিমেষের কথার ধরণে শীলা হাসছিল। বললুম ঃ উপাদেয় খাদ্য।

অনিমেষ বলল ঃ পাহাড়ের মাথায় ডাক বাংলো আছে, কিন্তু জল আর খাবার নেই। নামতে না পারলে হাওয়া খেয়ে রাত্রিবাস কর।

মনে হচ্ছে, এই তীর্থে জৈনদের নজর পড়ে নি। ওদের টাকার

তো অভাব নেই, শুধু অভিলাষ হলেই এই সব তীর্থের পথ সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে পারে।

অনিমেষ বলল : ওদের সম্প্রদায়ের ব্যাপারটা ঠিক জানি নে। তা না হলে জৈনদের ভিড় এখানে কম হয় না। তিথি পার্বণে উৎসবও নাকি হয়।

বললুম : মন্দিরের সৌন্দর্যের কথা কিছু বল।

অনিমেষ বলল : তাহলে শোনা কথা বলতে হবে।

তাই শুনি।

তাও আবার দু রকম কথা শুনেছি।

দু রকমই শুনব।

গিবিডিব এক বাঙালী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে মন্দিবেব ভিতর শ্বেত পাথরের বেদীর উপর দুটি পায়ের ছাপ। পার্শ্বনাথের পদচিহ্ন। আর কিছু নেই। আর একজন অন্য কথা বলেছিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহটি নিতান্ত সাধারণ। নীলাভ মর্মরের মেঝে, আর একটি বেদীর উপরে পাঁচটি তীর্থঙ্করের সুন্দব মূর্তি। কালো পাথরের তৈরী মাঝের মূর্তিটি পার্শ্বনাথের, পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। তিন-চার ফুট উঁচু এই মূর্তিটি নাকি অপূর্ব লাবণ্যময়।

শীলা বলে উঠল : এ যে একেবারে ভিন্ন কথা।

আমি বললুম : ভিন্ন হলেও সত্যি।

শীলা ও অনিমেষ সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি তাই দেখে হেসে বললুম : আমি শুনেছি যে পরেশনাথ পাহাড়ের সব মন্দিরেই তীর্থঙ্করদের পদচিহ্ন। শুধু জনমন্দিরে আছে কয়েকটি মূর্তি।

তাই হবে।

আমি বললুম : তারপর বল।

অনিমেষ একটু ভেবে বলল : শুনেছি যে মন্দিরে ওঠবার রাস্তা নাকি বেশি দিন আগে তৈরী হয় নি। ১৮৭৪ সালের আগে

এই পাহাড়ে উঠবার কোন রাস্তা ছিল না। সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেউ এখানে আসতেন না।

তাহলে কোন মন্দিরও নিশ্চয়ই ছিল না। মন্দির তৈরী করতে হলে একটা পায়ে চলা রাস্তা অন্তত থাকা দরকার।

অনিমেষ বলল: আমি এ সব প্রশ্ন তাঁকে করি নি। তিনি বলেছিলেন যে ডাক বাংলো থেকে আরও আধ মাইল উঠলে মন্দির, এবং এই শেষ পথটুকু বড় সংকীর্ণ ও বন্ধুর। খুব সাবধানে পথ চলতে হয়, গড়িয়ে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিচের সমতল ভূমির বন জঙ্গল শস্যক্ষেত্র বলে মনে হবে। বলেছিলেন, মন্দিরে কোন পুরোহিত নেই, পাণ্ডাও নেই। প্রবেশের পথে একটা ঘণ্টা ঝুলছে, আর বিন্দু বিন্দু জলে ঘরটা ভরে আছে। তাঁর সঙ্গে যে গুজরাটী যাত্রীরা ছিলেন, তাঁরা নাকি আতপ চাল আর পয়সা দিয়ে পুজো করলেন। ফুলে কীট থাকে বলে পুজোয় ফুল তাঁরা ব্যবহার করেন না।

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম: এ কি সত্যি কথা! আমি আগে কখনও এমন কথা শুনিনি।

অনিমেষ বলল: সত্যি-মিথ্যা আমি কী করে জানব! যা বলেছেন, তাই বলছি।

আমি এক সমালোচকের লেখায় পড়েছিলুম যে পরেশনাথের মন্দিরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় রীতির শিল্পকলা বিদ্যমান। দুটো স্তম্ভের মাঝখানে শুধু খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ নয়, পাঁচটি গম্বুজও আছে। কারুকার্য করা গম্বুজের উপর মিনার।

পরেশনাথ পাহাড়ের প্রাচীন নাম সম্মেত শিখর। এই স্থান কেন পবিত্র হল, তার কারণ আমরা জানি। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এখানে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। কথাটা ঐতিহাসিক কিনা জানা নেই। কিন্তু পার্শ্বনাথ যে ঐতিহাসিক চরিত্র সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। বর্ধমান মহাবীর সংসার ত্যাগ করে কঠোর তপস্যায় জিন বা

বিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁরই নামে জৈন ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম তিনি নিজে প্রবর্তন করেন নি, প্রচলিত এক ধর্মমতকে বিস্তৃততর করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে মহাবীর তাঁদের চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর ও তাঁর আগে আরও তেইশজন তীর্থঙ্কর জন্মেছিলেন। দুঃখের বিষয় যে প্রথম বাইশজনকে ঐতিহাসিক গবেষণায় খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম যাঁকে পাই, তিনি ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। মহাবীরের আড়াই শো বৎসর পূর্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁর জন্ম হয় খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের প্রারম্ভে। কল্পসূত্র মতে তিনি ৭৭৭ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে শতবর্ষ বয়সে নির্বাণ লাভ করেন। কাশীর ক্ষত্রিয় রাজবংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মহারাজ অশ্বসেন ও মাতার নাম বামা। সকলকীর্তির মতে তাঁর মায়ের নাম ব্রহ্মী। অযোধ্যার রাজকন্যা প্রভাবতীকে পার্শ্ব বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু বেশি দিন সংসার করেন নি। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁর কেবলজ্ঞান অর্থাৎ সিদ্ধি লাভ হয়। এর পর সত্তর বৎসর তিনি নানা স্থানে ধর্ম প্রচার করে বেড়ান। ভাবদেব সূরি যে পার্শ্বনাথ চরিত্র লিখেছেন, তাতে অনেক অলৌকিক কথা আছে। সকলকীর্তিও একখানি পার্শ্বনাথ চরিত্র লিখেছেন। এই সব সংস্কৃত রচনা থেকে ঐতিহাসিক সত্য সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা জানি না।

তীর্থ মানে ঘাট। সংসার দুঃখ পার হবার ঘাট যিনি নির্মাণ করেছেন, তিনিই তীর্থঙ্কর। দিগম্বর মতে নারী কখনও মোক্ষ লাভের অধিকারী নয়, তাই চব্বিশজন তীর্থঙ্করই পুরুষ। কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় এ কথা মানেন না। তাঁদের মতে ঊনবিংশতিতম তীর্থঙ্কর মল্লি একজন নারী। সে যাই হোক, সকল জৈনের বিশ্বাস যে শুধু পার্শ্বনাথ নন, ঋষভ বাসুপূজ্য নেমি ও মহাবীর ছাড়া আর সমস্ত তীর্থঙ্করই পরেশনাথ পাহাড়ে নির্বাণ লাভ করেছেন।

পার্শ্ব ও মহাবীরই শুধু মানুষ ছিলেন, আর সকলের বর্ণনা অতি-

মানবের। তাঁরা শত সহস্র হাত লম্বা বিরাট পুরুষ, নিযুত কোটি বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করে তাঁরা অযুত লক্ষ বৎসর জীবনধারণ করেছিলেন। তাঁদের বংশ পরিচয় ও জীবন বৃত্তান্তের দীর্ঘ আলোচনা জৈনশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

পার্শ্বনাথের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া গেলেও তাঁর ধর্মমতের মূল কথা আমরা জানি। তিনি চারটি ব্রত প্রবর্তন করেছিলেন। প্রথম তিনটি সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ নেই, আছে শেষেরটি সম্বন্ধে। তিনি অহিংসাকে বলেছিলেন পরমো ধর্মঃ, জীব-হত্যা বলেছিলেন পাপ। তিনি সত্যকে ব্রত বলেছিলেন, নিন্দা করেছিলেন মিথ্যাভাষণের। তিনি বলেছিলেন চুরি ক'রো না, ক'রো না অদত্ত গ্রহণ। কেউ বলেন, পার্শ্বের চতুর্থ ব্রত ছিল ব্রহ্মচর্য। কেউ-বা বলেন, মহাবীর এটি পঞ্চম ব্রত বলে যোগ করেন। পরবর্তী কালে নিজের সম্প্রদায়ে শৈথিল্য দেখেই এটি যোগ করার প্রয়োজন বোধ করেন। অন্য মতে অপরিগ্রহ বা পার্থিব সম্পদে অনাসক্তি ছিল পার্শ্বের চতুর্থ ব্রত। ব্রহ্মচর্য যাঁরা পার্শ্বের ব্রত বলেন, তাঁরা মনে করেন যে অপরিগ্রহ ছিল মহাবীরের পঞ্চম ব্রত। যথার্থ ভাবে এই ব্রত পালনের জন্যই মহাবীর বস্ত্রত্যাগ করে দিগম্বর হয়েছিলেন।

আমার একটি জৈন দিগম্বর মূর্তির কথা মনে পড়ল। সেটি দেখেছি মহিশুর রাজ্যে, শ্রবণবেলগোলার পাহাড়ে। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সব চেয়ে বিরাট মূর্তি হল সেটি। শুধু বিরাট নয়, আশ্চর্য প্রাণবন্ত সুন্দর মূর্তি। ভারতের শিল্পীকে আমি প্রণাম করি।

নিচে থেকে পরেশনাথ পাহাড়কে একটা প্রণাম করে আমরা এগিয়ে গেলুম। কিন্তু পার্শ্বনাথকে পিছনে ফেলে যেতে পারলুম না। অনেকদিন আগের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ল।

দলে দলে লোক চলেছে বারাণসীর বহিরুদ্যানের দিকে। তাই দেখে কুমার পার্শ্ব প্রশ্ন করলেন, এরা সব কোথায় চলেছে?

এরা চলেছে কমঠ নামে এক সন্ন্যাসীকে দেখতে। তিনি পঞ্চাগ্নি তপ করছেন।

কুমারের মনেও কৌতূহল জাগল। তিনিও গেলেন সন্ন্যাসীর কাছে। দেখলেন, আগুনে কাঠ পুড়ছে, আর তারই সঙ্গে একজোড়া সাপও পুড়ছে। পার্শ্ব বললেন, হিংসায় কি ধর্ম হয়! ধর্মের মূলে যে দয়া!

সন্ন্যাসী বললেন, পঞ্চাগ্নি তপে হিংসা কোথায়!

অগ্নিকুণ্ড থেকে পার্শ্ব এক খণ্ড কাঠ টেনে বার করলেন। তা দু'খণ্ড করতেই আধপোড়া সাপ বেরল একজোড়া।

পার্শ্ব গৃহত্যাগ করলেন। অহিংসার বাণী তাঁকে প্রচার করতে হবে। অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং বৈরত্যাগঃ। যোগদর্শনের এই সূত্র সম্মেত শিখরে আজও সত্য হয়ে আছে। অরণ্যময় এই পর্বতের পশুও হিংসা ভুলে গেছে। যাত্রীরা তাই অরণ্যকে ভয় পায় না। রাত্রির শেষ প্রহরে যাত্রা করে তারা সায়াহ্নের অন্ধকারে আসে ফিরে।

১০

অনিমেষ আমাকে প্রশ্ন করল ঃ কাকে প্রণাম করলি ?

বললুম ঃ পরেশনাথকে।

তুই কি সাঁওতাল নাকি যে পাহাড়টাকে প্রণাম করলি ?

সাঁওতালরা বুঝি পাহাড়কে প্রণাম করে ?

এই অঞ্চলের সাঁওতালরা করে। বলে, এই পাহাড়টাই তাদের মরাং বুরু। নিয়ম মতো পূজো করে পাহাড়ের।

আশ্চর্য তো !

আশ্চর্য কিসের ! এ দেশের সাধারণ লোক গাছ পাথরের পূজো করে, আর মূর্তি পূজো করে শিক্ষিত মানুষে। এই অশিক্ষিত আদিবাসীরা পাহাড়ের পূজো করবে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে !

এবারে আমরা বার্মোর দিকে ছুটেছি। বার্মোর কাছে বোকারো ও কার্গালি। কয়লার রাজ্য। রাণীগঞ্জ ঝরিয়ার মতো এই অঞ্চলও কয়লায় সমৃদ্ধ। ভাল কয়লা পাওয়া যায়। একটা রেল লাইন গোমো স্টেশন থেকে বেরিয়ে বারকাকানা বারওয়াড়ি হয়ে ডেহরি-অন-সোন স্টেশনে এসে মিলেছে। এই লাইনের উপরেই বার্মো ও বোকারো স্টেশন। বোকারো বোধহয় একটা নদীর নাম, কোনার নাম আর একটা নদীর। এই সব নদীর জল গিয়ে দামোদরে পড়ে। তাদের বাঁধতে হয়েছে। বরাকরকে বাঁধা হয়েছে দু জায়গায়—তিলাইয়া ও মাইথনে। পাঞ্চেতে বোধহয় দামোদরকেই বাঁধা হয়েছে। দুর্গাপুরের ব্যারেজ দামোদরের উপরে। এইখান থেকে চাষের জন্য খাল কাটা হয়েছে। একটা খাল গঙ্গায় নিয়ে মেলানো হয়েছে। তাতে নাকি নৌকো চলবে। রাণীগঞ্জ

অঞ্চলের কয়লা নৌকোয় করে ডকে যাবে, জাহাজে উঠবে রপ্তানীর জন্যে। কোথায় কত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, আর কত একর জমিতে সোনার ফসল ফলবে, তার নির্ভুল হিসেব আমাকে অনিমেষ দিয়েছিল। এ সব আমার কৌতূহলের বিষয় নয় বলে বেমালুম ভুলে গেছি।

অনিমেষ বলল ঃ চন্দ্রপুরা থেকে একটা নতুন লাইন বসেছে।

বুঝতে পারলুম যে চন্দ্রপুরা এই অঞ্চলের একটি স্টেশনের নাম। অনিমেষ আমার অজ্ঞতা সন্দেহ করে বলল ঃ এদিক থেকে রাঁচি যেতে হলে আগে গোমো থেকে বারকাকানা যেতে হত, সেখান থেকে মুরি হয়ে রাঁচি। এখন গোমো থেকেই চন্দ্রপুরা হয়ে সরাসরি মুরি যাচ্ছে। চন্দ্রপুরা পুরনো স্টেশন, গোমো থেকে কয়েক মাইল দূরে।

অনিমেষ আমাকে বোঝাল যে এই লাইনে এখন নতুন কারখানা হচ্ছে। কয়লার একটা ওয়াশারি হয়েছে। আর ডি. ভি. সি.র থার্মাল প্লান্ট। বার্মোতে আমরা কিছু দেখব না, শুধু তার উপর দিয়ে বোকারোয় যাব।

অনিমেষ বলল ঃ বোকারোর রেস্ট হাউসটিও দেখবার মতো। পণ্ডিত নেহেরু এসে রাত্রিবাস করেছিলেন।

শীলা বলল ঃ আমারও খুব ভাল লাগে। এমন সুরুচির রেস্ট হাউস আমি আর কোথাও দেখি নি।

অনিমেষ আমাকে রেস্ট হাউসের জন্মকথা শোনাল। শান্তি-নিকেতনের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে এটি তৈরি হয়েছিল। শুধু বাড়ির নক্সা নয়, সাজানোর ভারও তাঁরা নিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনের জিনিস দিয়ে আগাগোড়া সাজানো হয়েছে। বাড়ির বাগানটিও সুন্দর।

শীলা বলল ঃ আমরা একটি রাত কাটিয়েছিলাম। পণ্ডিতজী যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরটিতেই। আমার মনে হয়েছিল যে নিজেরা যদি কোন দিন বাড়ি করি তো ঐ রকম করেই সাজাব।

আমার মনে হল যে তাদের মাইথনের বাড়িটিও বড় সুন্দর সাজানো। এর জন্য তারা অনেক যত্ন ও অনেক পরিশ্রম ব্যয় করে। নিজের বাড়ি হলে আরও অর্থ ব্যয় করত। ঠিক এই সময়ে আমার উত্তরপাড়ার ঘরের কথা মনে পড়ল। একটি ঘরে আমার গোটা সংসার। অপরিচ্ছন্ন অনাদৃত, এরা আমার ঘরে এসে এক মুহূর্তও কাটাতে পারবে না। অথচ এ কথা আমার এত দিন মনে হয় নি। গৃহ সম্বন্ধে আমি কি কখনও সচেতন ছিলুম না!

বোধহয় না। তরুণ দম্পতির সংসার আমি আগে দেখি নি। কলকাতায় মামার ড্রয়িং রুম আমি দেখেছি, দেখেছি তাঁর দিল্লীর অস্থায়ী সংসার। মিস্টার ব্যানার্জির ড্রয়িং রুম ও ডাইনিং রুম দেখে চলে এসেছি। জীবনে এঁরা প্রতিষ্ঠিত মানুষ। এঁদের জীবনে সংগ্রামের কোন ইতিহাস আছে কিনা আমার জানা নেই। যারা আমার সঙ্গে কাজ করে, আর যারা আমার বয়সী, তাদের আমি অফিসে দেখি। অনিমেষকে যেমন তার সংসারের ভিতর দেখলুম, তেমন করে আর কাউকে দেখবার সুযোগ পাই নি। আমার মনে হল, জীবনকে এরা সত্যিই উপভোগ করছে। বাঁচতে হলে এই রকম করেই বাঁচা উচিত।

এক সময় আমরা বার্মো পেরিয়ে গেলুম। রাণীগঞ্জ ঝরিয়ার মতো এ অঞ্চলটাও কয়লার রাজ্য। মাটির নিচে কয়লা, উপরেও কয়লা। পাতালের কয়লা মানুষ টেনে টেনে উপরে তুলছে। উপরের মাটিও অনেক সময় কয়লা মনে হবে। অনিমেষ বলল: কোডার্মায় আবার মাটিকে মাইকা মনে হবে।

কেন?

মাইকাকে বাঙলায় কী বলে?

অভ্র।

ঠিক বলেছিস। মাটি মনে হবে অভ্রের মতো চিক চিক করছে অভ্রের ধুলো।

শীলা বলল: ভারি সুন্দর। এখানে যেমন তাকালেই মন খারাপ হয়, ওখানে তা হয় না।

এখানে কেন মন খারাপ হবে!

এত কালি ও কয়লাতেও আপনার মন খারাপ হচ্ছে না! বড় নোংরা যে!

কয়লার কালি যে ধুলে ওঠে। যে কালি কিছুতেই ওঠে না, তাকেই আমার ভয়।

অনিমেষ বলল: এ যে আধ্যাত্মিক কথা হল।

এ যুগে চিন্তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে সাধারণ সত্যকেই আধ্যাত্মিক কথা বলে মনে হয়।

শীলা আমাদের পুরনো প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনল, বলল: কোডার্মায় কোন মাইন দেখাবে না? অভ্রের খনি?

অনিমেষ বলল: তিলাইয়া ছাড়িয়ে তাহলে মাইল আষ্টেক এগোতে হবে, খনি দেখতে সময়ও লাগবে অনেক। অনুমতি নিয়ে নিচে নামতে হবে তো!

আমি বললুম: এ যাত্রায় তাহলে থাক।

আমাদের গাড়ি এসে একটা কারখানার সামনে দাঁড়াল। অনিমেষ বলল: এইটিই বোকারোর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন।

আমরা নেমে পড়লুম।

অনিমেষ শীলাকে বলল: একটু ব'সো, আমি দেখবার ব্যবস্থা করে আসছি।

বলে এগিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরেই একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হাসতে হাসতে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। পরিচয় হল, নমস্কার বিনিময় হল। মিস্টার বোস অনিমেষের মতোই তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। অনেক উৎসাহ। বললেন: চলুন, আপনাকে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিই।

বললুম : ভাল করে বোঝালেও কিছু বুঝব না। কল কারখানার ব্যাপারে আমি একেবারেই আনাড়ি।

অনিমেষ বলল : চেহারা দেখে বুঝছ না! রাজনৈতিক খবর থাকলে বলতে পার।

আমার খদ্দরের জামা কাপড় দেখে যে এ কথা বলছে, তা বুঝতে পারি। কোন প্রতিবাদ করলুম না।

মিস্টার বোস বললেন : তাও জানা আছে। ১৯৫৩ সালে আমাদের প্রিয় প্রধান মন্ত্রী এই থার্মাল স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন। তখন তিন জোড়া টারবাইনের এক জোড়ার কাজ চালু করা হয়েছিল, বাকি দু জোড়া পরে চালু হয়েছে। আরও এক জোড়া বসাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

জায়গাটা আমাদের দেখালেন। বললেন : এক একটা ইউনিট থেকে পঞ্চাশ হাজার কিলোওয়াট এনার্জি বিতরণ হতে পারে।

শীলা আমার মুখের দিকে তাকাল। বুঝতে পারলুম যে এই হিসাব শুনে আমার মতো তারও কোন ধারণা হয় নি। পাঁচ লাখ পেনিসিলিন শুনলে যেমন কিছু বুঝি না, এও কতকটা তেমনি। তবে অনিমেষের কথায় খানিকটা পরিষ্কার হল। সে বলল : এশিয়ায় এত বড় থার্মাল প্লাণ্ট আর নেই, পৃথিবীতেও কম আছে।

বললুম : মাইথনে দেখলুম, জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। এই ব্যবস্থা আরও অনেক জায়গায়। তাতেও কি প্রয়োজন মিটল না যে কয়লাও কাজে লাগাতে হচ্ছে?

মিস্টার বোস বললেন : সবাই এই প্রশ্ন করেন এবং প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। আমাদের দেশে হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। এই সমস্ত নদীতে জলের প্রবাহ সারা বছর এক রকম থাকে না। কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। কাজেই এই রকমের একটি থার্মাল স্টেশন থাকলে জলবিদ্যুৎ সরবরাহ সমান রাখা যায়।

কারখানার কাজ কর্ম বোঝবার আগ্রহ আমাদের ছিল না। ভিতরের চেয়ে বাহিরের ব্যবস্থাই ভাল লাগল। মিস্টার বোস আমাদের খেয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন, অনিমেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। অনেক দূরে যেতে হবে, খাবার জন্য সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়।

কোনার ড্যাম এখান থেকে বেশি দূর নয়। মাত্র চোদ্দ মাইল উত্তরে। কোনার নামে একটা নদী এই এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দামোদরে মিলেছে তেইশ মাইল দূরে। মাইথনে বরাকর নদীর মতো কোনার নদীকে এখানে বাঁধা হয়েছে। দেখতে একই রকম, শুধু অঙ্কের তফাৎ। এই জায়গা দেখাবার সময় অনিমেষ বলল ঃ এই ড্যাম একশো ষাট ফুট উঁচু, আর লম্বায় বারো হাজার ফুটের বেশি। ওধারে জল জমেছে দু লক্ষ ষাট হাজার একার-ফিট। এক লক্ষ চার হাজার একার জমিতে চাষের জল দিতে পারে। বোকারোর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের জল এইখান থেকেই যাচ্ছে।

শীলা বলল ঃ সব বুঝে ফেলেছি।

আমিও হেসে বললুম ঃ বুঝেছি।

অনিমেষ বোধহয় লজ্জা পেয়েছিল, বলল ঃ বুঝিয়ে বলছি।

শীলা বলল ঃ রক্ষে কর। আর বোঝাবার দরকার নেই।

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। বললুম ঃ তার চেয়ে অন্য কথা বল।

অনিমেষ বলল ঃ এই ড্যাম তৈরি করতে পাঁচ বছর সময় লেগেছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫। তিলাইয়া এর দু বছর আগে তৈরী হয়েছে।

সেও হয়তো বছর পাঁচেক সময় লেগেছিল।

কিছু কম। ডি. ভি. সি-র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৮এ। তিলাইয়ার কাজ শুরু হয় ১৯৫০এর জানুয়ারিতে। ১৯৫৩র ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রধান মন্ত্রী এর কাজ চালু করেন।

আকাশের দিকে চেয়ে শীলা বলল : বেলা মন্দ হয় নি। এখানেই খেয়ে নিলে হত।

অনিমেষ তাকাল হাতের ঘড়ির দিকে। বলল : এখান থেকে তো সোজা তিলাইয়া যাব, খেয়ে নিলে মন্দ হত না।

সঙ্গে খাবার আছে, জলও আছে। অনিমেষের খানসামা বেতের ঝুড়িতে সব সাজিয়ে দিয়েছে। প্লেট ছুরি কাঁটা চামচে ও ন্যাপকিন। বললুম : কোথায় একটা খাবার জায়গা বলেছিলে?

বাগোদার।

শীলা বলল : বড় এঁদো ঘর। তার চেয়ে আমরা এইখানেই খেয়ে নিই।

ডিমের স্যাণ্ডুইচ আর কাটলেট, ফ্লাস্কে কফি। কলাও ছিল। খাওয়া শেষ করে অনিমেষ বলল : ক্ষিধে বাড়াবার জন্যে এই খাওয়া।

মানে?

মানে পিত্তি পড়ল না, পেটও ভরল না।

শীলা বলল : আপনারও তাই?

হেসে বললুম : আমি পেট ভরাবার জন্যে খাই নে।

মানে?

যতটুকু না খেলে প্রাণটা যাবে, ততটুকুই আমার প্রয়োজন। আজ তার বেশি হয়েছে।

অনিমেষ বলল : নেতার মতো কথা। সবাই এ রকম খেলে দেশে কোন দিন খাদ্যাভাব হবে না।

বার্মো থেকেই আমরা অপ্রশস্ত রাস্তায় চলছিলুম। বার্মো থেকে বোকারো, বোকারো থেকে কোনার, কোনার থেকে বাগোদারের দিকে। অনেকক্ষণ চলবার পর আমরা ভাল রাস্তা পেলুম। আমাদের সরু পথ চওড়া রাস্তায় এসে পড়েছে। অনিমেষ বলল : পশ্চিমে এই রাস্তা হাজারিবাগ গেছে। আমরা

ডান হাতে ফিরে বাগোদার যাচ্ছি। সেখান থেকে পথ হবে রাজপথ—জি. টি. রোড।

বাগোদার পৌঁছতে আমাদের সময় বেশি লাগল না। তারপরেই গাড়ি ছুটল হাওয়ার বেগে। এমন সুন্দর রাজপথ দেশে কম আছে।

বত্রিশ মাইল চলবার পর বার্হি নামে একটা জায়গা আছে। অনিমেষ বলল: এখান থেকে হাজারিবাগ মাত্র তেইশ মাইল। সোজা দক্ষিণে নামতে হয়।

আমরা সামনে এগিয়ে ডান হাতে কোডার্মার পথ ধরলুম। কোডার্মা নাকি এখান থেকে মাইল কুড়ি পথ। তিলাইয়া পথে পড়বে।

দেখতে দেখতেই আমরা তিলাইয়া পৌঁছে গেলুম। পথ যে সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই, সুন্দর পরিবেশ। বাঁধের এক দিকে জলাশয়, আর অন্য দিকে সেই জলাশয়ের জল ঝর্ণার মতো ঝরে পড়ছে। সারি সারি লোহার গেটের ভিতর একটি দুটি খোলা। তাই দিয়ে জল পড়ছে, বয়ে যাচ্ছে শীর্ণ ধারায়। সর্বত্র একই রকম। মাইথনে কোনারে আর তিলাইয়ায় বড় রকমের পার্থক্য কিছু নেই।

অনিমেষ বলল: তিলাইয়া ভারতবর্ষের প্রথম কনক্রিটের ড্যাম, কিন্তু কোনারের মতো বড় নয়। উঁচু নিরানব্বুই ফুট, আর লম্বায় বারো শো ফুট। নিরানব্বুই হাজার একার জমিতে চাষের জল দেওয়া যেতে পারে। আর দুটো ইউনিটে দু হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

শীলা আমাকে বলল: দেখেছেন তো, এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই ওর কী মনে হয়!

স্বাভাবিক।

অনিমেষ বলল: ঠিক বলেছিস। আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আর এ সব কথা মনে পড়ত না।

কবিতা আর কিলোওয়াট ছাড়া আর কোন কথা বুঝি নেই!

থাকবে না কেন! যদি কিছু জানবার থাকে, জিজ্ঞেস কর।

এই নদীর নাম বল।

বরাকর।

যে বরাকর আমাদের মাইথনের পাশ দিয়ে বইছে?

সেই বরাকর।

দামোদরের সঙ্গে তার সঙ্গমস্থল একশো তিরিশ মাইল।

গাড়ি থেকে আমরা নেমে দাঁড়িয়েছিলুম। অনিমেষ বলল: তোমরা একটুখানি অপেক্ষা কর, আমি সরকারি কাজটুকু সেরে আসি।

বলে গাড়ি নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

কোনারেও সে এমনি করে সরকারি কাজ করেছিল। একটা অফিসে যেতে আসতে যা সময় লেগেছে, ঠিক ততটুকু। যার সঙ্গে দেখা করেছে, সে এসে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এতে কী মূল্যবান কাজ হয়েছে জানি নে।

শীলার সঙ্গে এবারে আমি কী কথা কইব, তাই ভাবছিলুম।

শীলা বলল: জায়গাটা কেমন লাগছে?

বললুম: মন্দ নয়।

অনেকে বলেন, অপূর্ব জায়গা।

কিন্তু মাইথনের মতো নয়।

শীলা হাসল, বলল: সে ভাল লেগেছে অন্য কারণে। আকাশে চাঁদ ছিল, আর—

কথাটা শীলা সম্পূর্ণ করল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। এখানে চাঁদ নয়, সূর্য এখানে খর রৌদ্র বর্ষণ করছেন। বললুম: আর আপনি একটা গান গেয়েছিলেন।

গান!

খিলখিল করে শীলা হেসে উঠল। মনে হল, পাহাড়ের উপর থেকে একটা ছোট ঝর্ণা গড়িয়ে নামল।

ঠিক এই মুহূর্তেই অনিমেষ এল ফিরে।

১১

তিলাইয়া থেকে হাজারিবাগ সোজা রাস্তায় সাঁইত্রিশ মাইল পথ। পথশ্রমে শ্রান্ত দেহে যখন আমরা হাজারিবাগে পেঁাছলুম, তখন অন্ধকারে দিগন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। ডি. ভি. সি.র বাংলোয় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম। রেলের লোক যেমন বিদেশে গিয়ে হোটেল ধর্মশালার পরিবর্তে ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নেয় নিশ্চিন্ত মনে, এও তেমনি। অনিমেষকে দেখে মনে হল যে সে নিতান্তই নিজের ব্যবস্থা ভেবে আরাম পাচ্ছে।

স্নান সেরে আমরা যখন বাহিরে এসে বসলুম, অনিমেষ বলল: হাজারিবাগ শহরে দেখবার কিছু নেই।

দেখবার জিনিস আর কটা শহরে আছে!

শীলা বলল: কেন, সেই যে একটা পার্ক দেখেছিলাম!

ক্যানারি হিল পার্ক?

ঐ রকমেরই কী একটা নাম।

অনিমেষ বলল: ঐ লেক তিনটে ছাড়া আর কী আছে!

অমন সুন্দর ফুলের বাগান, ছোট ছোট তিনটে লেক, একটা লেকে আবার স্নানের ব্যবস্থা, মন্দ কি!

বেশ তো, কাল সকাল বেলায় দেখিয়ে দেব। সার্কিট হাউস থেকে মাইল খানেক দূর হবে।

ডিনারের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলুম। এই অবসরে অনিমেষ বলল: এর চেয়ে ন্যাশনাল পার্ক অনেক সুন্দর জায়গা। ছোটনাগপুরের বন্য পশুপাখি তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাদেরই রক্ষার ব্যবস্থা। এখান থেকে আঠারো মাইল দূরে একশো নব্বুই মাইল ব্যাপী এক অরণ্যের নাম দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল পার্ক। বনের

ভিতর সুন্দর বাঁধানো রাস্তা, আর জলের উপর গোটা দশেক ওয়াচ টাওয়ার। তার উপর থেকে বন্য জন্তুও দেখার ভারি সুবিধে।

শীলা বলল ঃ আমাকে তো আগে দেখাও নি।

কাজে এলে এ সব আর দেখা হয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ আর কী দেখবার আছে ?

বনের ভিতর ছোট ছোট নদী আছে গোটা কয়েক। সব চেয়ে সুন্দর জায়গা হল টাইগার ফলস্। আগে সারাক্ষণ সেখানে বন্য জন্তু আসত, এখন আর তেমন আসে না।

কেন ?

বড় রাস্তার খুব কাছে। সারাক্ষণ গাড়ি ঘোড়া চলে বলে জন্তুরা ভয় পায়। তার বদলে মানুষ পিকনিক করতে আসে। রাত কাটাবার জন্যে একটা রেস্ট হাউসও আছে।

বনে বাঘ সিংহ নেই ?

সিংহ নেই। গুজরাটের গির্ণার ছাড়া ভারতে আর কোথাও এখন সিংহ নেই। তবে বাঘ আছে, চিতাবাঘ আছে, ভালুক সম্বর চিতল আছে, আর আছে নানা জাতের হরিণ ও পাখি।

শীলার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ শুনে আশ্চর্য হবে, বনের ভিতরের ছোট ছোট নদীগুলিকেও বাঁধা হয়েছে, তাতে সারা বছরের জল সঞ্চয় হয়।

প্রভাতে আমরা ব্রেক ফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লুম। ক্যানারি হিল পার্ক দেখতে আমাদের সময় লাগল না। এবারে আমরা সোজা রাঁচি যাব। উনষাট মাইল পথ প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন। এই দুই শহরের মধ্যে অবিরত বাস চলাচল করছে। রাঁচি রোড রেল স্টেশন আর রামগড় টাউন হয়ে আমরা রাঁচি শহরে পৌঁছব।

অনিমেষ বলল ঃ আজকের সকালটি মন্দ নয়, কী বল ?

শীলা বলল ঃ কালকের সকালটিও ভাল লেগেছিল।

বললুম : পরে গরমে ও পথশ্রমে কষ্ট হচ্ছিল বলে আজকের সকালটি আরও ভাল লাগছে।

অনিমেষ বলল : একেবারে মনের কথা।

হাজারিবাগ শহর সম্বন্ধে আমার একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছে। পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ বেশ. ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাস্তাগুলি প্রশস্ত, বাড়ি ঘর ভাল। মনে হয়েছে, একটা পরিকল্পনা নিয়ে গড়া। আমার ধারণাটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৭০০ সালে সৈন্যদলের প্রয়োজনে শহরটির পত্তন না হলেও সংস্কার হয়েছে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অনিমেষ বলল : এই অঞ্চলটাকে ছোটনাগপুব বলে, ছোটনাগপুর ডিভিশন।

শীলা বলল : নাগপুর যখন একটা শহর, তখন ছোটনাগপুরও একটা শহরেব নাম হওয়া উচিত ছিল।

অনিমেষ বলল : বিপদের কথা।

বিপদ কেন?

ছোটনাগপুর নামে কোন শহবের নাম তো শুনি নি, এই উঁচু নিচু মালভূমির নামই ছোটনাগপুর বলে জানি।

বললুম : রাঁচির কাছে চুটিয়া নামে একখানি গ্রাম ছিল। নাগ-বংশী রাজারা সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সেই বংশের নামেই নাগপুর।

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে বলল : সত্যি নাকি!

বললুম : মিথ্যা হলেও ক্ষতি নেই।

তবে কি তুই তৈরী করে বললি?

হেসে বললুম : না। এ হল প্রবাদ, খাতির করে ইতিহাসও বলতে পার।

শীলা বলল : সমস্ত দেশেই বোধহয় এই রকম প্রবাদ আছে। আমরা যে প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি, তারই প্রমাণ প্রবাদ।

বর্তমান যুগ অতীতকে অস্বীকার করছে। এই মনোভাবের জয় হলে প্রবাদ আমরা ভুলে যাব।

অনিমেষ বলল ঃ গোলমেলে কথা।

তাহলে সরল কথা বল!

অনিমেষ বলল ঃ এই ছোটনাগপুরের মালভূমি পূর্ব থেকে পশ্চিমে উঁচু হয়ে উঠেছে। সিংভূম ও মানভূম জেলা সমুদ্রতল থেকে হাজার ফুট উঁচু, মাঝখানে হাজারিবাগ ও রাঁচি জেলা দু হাজার ফুট, তারপরে পশ্চিমের অংশ সাড়ে তিন হাজার ফুট।

দুধারের প্রান্তর আমরা দেখতে দেখতে চলেছি। ধান ছাড়া আর কোন শস্য নেই। বনে দেখেছি শাল গাছ, আর মাঝে মাঝে শিমুল, পলাশও দেখেছি স্থানে স্থানে। অনিমেষ আমাকে কাঁচনার গাছ চিনিয়ে দিল, বলল ঃ ফুল হয় তিন রঙের, সাদা গোলাপী ও মভ। হলদে ফুল হয় যে গাছে, তার নাম বোধহয় তমলতাস।

বলল ঃ এদিকে একটি সুন্দর লতা আছে, তার দিশী নাম জানি নে। ইংরেজীতে বলে ব্রাইডাল ক্রীপার। সাদা ফুলের থোকা সত্যিই সুন্দর।

রৌদ্র আজ প্রখর মনে হচ্ছে না। অনিমেষ বলল ঃ এপ্রিল ও মে মাসে এখানে সব চেয়ে বেশি গরম, সে দিনের বেলায়। রাত্রি সব মাসেই শীতল। শীতের সময় বরফ জমার মতো ঠাণ্ডাও পড়ে।

এক সময় আমরা একটা পুল পার হলুম। তার নিচে দিয়ে রেল লাইন গেছে। অনিমেষ বলল ঃ এইটেই রাঁচি রোড স্টেশন। ট্রেনে এলে এইখানে নামতে হয়।

স্টেশনে আমরা দাঁড়ালুম না। ডান হাতে বেঁকে এগিয়ে গেলুম।

কিছু দূর গিয়ে একটা শহরের মতো পাওয়া গেল। অনিমেষ বলল ঃ এই হল রামগড় টাউন। এই রাস্তা বারকাকানা জংসনে

গেছে। ঈস্টার্ন রেলের ট্রেন বারকাকানা হয়ে ডেহরি অন সোন যায়। সাউথ ঈস্টার্ন রেলের ট্রেন মুরি থেকে রামগড়ের উপর দিয়ে বারকাকানা আসে। তাইতেই জংসন।

রামগড় একটি পরিচ্ছন্ন শহর। দুধারে যে সব বাড়ি দেখা গেল তা মিলিটারি ছাউনি বলে মনে হল।

এতক্ষণ আমরা সমতলের উপর দিয়ে যাচ্ছিলুম। আরও খানিকটা এগিয়ে ঘাট শুরু হল। ঘাট মানে পাহাড়ের উপর চড়াই উৎরাই রাস্তা। ভূগোলে এই ঘাট শব্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল—পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তেই ঘাট শব্দের অবাধ ব্যবহার। ঘাট বিগিন্‌স্‌ ও ঘাট এণ্ড্‌স্‌। আমাদেরও পাহাড়ে চড়া শুরু হল। হাজারিবাগের দু হাজার ফুট থেকে কতখানি নেমে এসেছিলুম জানি নে, আবার আমাদের দু হাজার ফুট উপরে উঠতে হবে। পরেশনাথের সাড়ে চার হাজার ফুট পাহাড় সবাই পায়ে হেঁটে ওঠে, কিন্তু এখানে তার উপায় নেই। এ তো ঠিক পাহাড় নয়, এ মালভূমি। দূরত্ব এখানে প্রতিবন্ধক, উচ্চতা নয়। উপরে একবার উঠে পড়লে মনে হবে সমতলে আছি। হাজারিবাগেও তাই মনে হয়েছে।

অনিমেষ বলল : কী দেখছিস ?

বললুম : এই শাল গাছগুলো মনে হচ্ছে কেউ নতুন লাগিয়েছে।

কেন ?

এখনও এরা শিশু আছে।

অনিমেষ বলল : আমার কাছেও এ একটা বিস্ময়। কত বন কত অরণ্য এই দেশে। পঞ্চবটী বন খাণ্ডব বন দণ্ডকারণ্য নৈমিষারণ্য। এই সব অরণ্যের জন্ম হল কী করে, কে এত গাছ লাগাল।

এ সবই সৃষ্টিকর্তার খেয়াল।

এ ছাড়া আর কোন উত্তর নেই।

কখন 'ঘাট এণ্ড্‌স্‌' হয়েছিল, খেয়াল করি নি। সমতল ভূমির উপর দিয়ে আমরা ছুটে যাচ্ছিলুম।

একদা এই অঞ্চল বাঙলা দেশের অন্তর্গত ছিল। সমগ্র বিহার ছিল বাঙলার সঙ্গে যুক্ত। বিহার ও উড়িষ্যা। ১৭৬৫ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই অঞ্চলের অধিকার লাভ করে। ইংরেজ তখন রাজা ছিল না, ছিল দেওয়ান। তার আট বৎসর আগে পলাশীর যুদ্ধ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে সে দিন যে রক্তপাত হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সেই রক্তে সমগ্র দেশটা লাল হয়ে গেল।

দেশের রাজা হয়ে ইংরেজ বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যাকে এক সঙ্গে শাসন করেছে। বাঙলাকে বিভক্ত করবার কথা উঠল এই শতাব্দীরই গোড়ার দিকে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এখনও অনেকের প্রাণে সজীব আছে। সে কি উদ্দাম প্রেরণা! লর্ড কার্জন বলেছিলেন, 'শাসনের সুবিধার জন্য বৃহৎ বাঙলাকে দুভাগ করতে হবে। দেশের লোক বলল, না, তা কিছুতেই হবে না। কার্জন বললেন, আলবৎ হবে। দেশের লোক বলল, দেহে প্রাণ থাকতে নয়। কার্জন গায়ের জোরে বঙ্গ বিভাগ করলেন, দেশের জনগণ আন্দোলনে মেতে উঠল। কার্জন বললেন, দমন কর। দেশের লোক বলল, ঠিক হ্যায়। গুপ্ত সমিতিতে দেশ ভরে গেল। সারা ভারতে উঠল রাজকর্মচারী হত্যার ধূম। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি কী বিদ্বেষ, কী ঘৃণা! বর্জন কর বিদেশী পণ্য, এই গরিব দেশের মাটিকেই আমরা সোনা ভাবব।

আন্দোলন ব্যর্থ হল না। বাঙলা থেকে বিহার ও উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হল বটে, কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা জেগে রইল মর্মান্তিক রূপে। বড়লাটকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল প্রকাশ্য রাজপথে। ভারতবর্ষে রাজা রাণী এসে দিল্লীতে দরবার করলেন। বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রহিত হল, আসাম বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যা হল স্বতন্ত্র প্রদেশ। সে

১৯১১ সালের কথা। ১৯৩৬ সালে উড়িষ্যাও স্বতন্ত্র প্রদেশ হল। কয়েক বছর আগে পুরুলিয়া আবার ফিরে এল বাঙলা দেশে।

সে দিন আমরা যুক্ত থাকবার জন্য আন্দোলন করেছি, এখন আমাদের বিভক্ত হবার জন্য আন্দোলন। গত কয়েক বছরে নতুন কয়েকটা রাজ্য গড়ে উঠল। তার জন্যে দুঃখ নেই কারও।

১২

অনিমেষ বলল : রাঁচিতে যত দেখবার জায়গা, তার চেয়ে বেশি জায়গা রাঁচির আশে পাশে।

শীলা বলল : তুমি কি হুন্‌ড্রু ফল্‌সের কথা বলছ ?

বইএ অন্য নাম দেখি। হুন্‌ড্রু ঘঘ !

শীলা হেসে উঠল, বলল : এ নাম আমি কোথাও শুনিনি।

আমি বললুম : জলপ্রপাতকেই বোধহয় এ দেশে ঘঘ বলে।

অনিমেষ অপ্রতিভ ভাবে বলল : নদী সেই সুবর্ণরেখা। তিনশো কুড়ি ফুট উপর থেকে হঠাৎ গড়িয়ে পড়েছে। বুঝতেই পারছিস, বর্ষায় তার কী উত্তাল রূপ !

বলে আমার দিকে তাকাল।

বললুম : রাঁচি ফেরত অনেকের মুখে শুনেছি।

তাই বলে রাঁচির কাছে মোটেই নয়। সাতাশ মাইল দূরে।

শীলা বলল : আজ আমরা যাব নাকি ?

মুস্কিল আছে। যে পর্যন্ত মোটর যায়, সেখান থেকে মাইল দেড়েক হাঁটতে হবে। মাথায় উঠলে সুবর্ণরেখা নদীটি দেখা যাবে, গাছের ফাঁক দিয়ে সরু নদীটি এঁকে বেঁকে হাজারিবাগের সমতলে গিয়ে পৌঁছেছে। আর জলপ্রপাতের রূপ দেখতে হলে নিচে নামতে হবে। সেখানে স্নান কর, পিকনিক কর। একটি গোটা দিন হাতে নিয়ে যাও।

তারপর ?

অনিমেষ বলল : পুরুলিয়া রোডের উপর অনেকগুলি ফল্‌স আছে। হুন্‌ড্রু ঘঘ দশম ঘঘ গৌতম ধারা। ঠিক রাস্তার উপর নয়, অনেকটা পথ ভিতরে ঢুকতে হয়। দশম ঘঘ কাঞ্চি নদীর ফল্‌স, একশো চোদ্দ ফুট নেমেছে।

শীলা বলল : এগুলোও মুখস্থ করেছ নাকি?

তোমাদের জন্যে অনেক কিছু মনে রাখতে হয়।

বললুম : এবারে গৌতম ধারার কথা বল।

অনিমেষ বলল : এ সব বলবার জিনিস নয়, দেখবার জিনিস। সৌন্দর্য কোন দিন বর্ণনা করে বোঝানো যায় না, বরং কিছু না বলে বেশি বোঝানো যায়।

শীলা বলল : ভূমিকাটি ভাল হল।

অনিমেষ বলল : হুনড্রুর সঙ্গে গৌতম ধারার একটা তফাৎ লক্ষ্য করেছি। হুনড্রুর অপ্রশস্ত ধারা একেবারে লাফিয়ে নেমেছে, গৌতম ধারার প্রশস্ত ধারা ধাপে ধাপে নিচে নেমেছে। আর নিকটে একটি মন্দির আছে, তার ভিতর বুদ্ধের মূর্তি। এ ছাড়া আরও জলপ্রপাত আছে—হির্নি আর রাজরুপ্পা। হির্নি সম্বন্ধে কিছুই জানি না, রাজরুপ্পা সম্বন্ধেও।

যা জান তাই বল।

বেরা নামে একটা নদী এসে দামোদরে পড়েছে, সেইটেই জলপ্রপাত। এই সঙ্গমের কাছে একটি কালী মন্দির আছে। রাঁচি থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে। সেখানেও লোকে দামোদরের শোভা দেখতে যায়, ঝর্ণায় স্নান করে, আর চড়ুই ভাতি করে।

পথের ধারে দু একটা বাড়ি দেখে মনে হল, রাঁচি পৌঁছতে আর দেরি নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের টি. বি. স্যানাটোরিয়াম আমরা পার হয়ে এসেছি। বোধহয় একটা বড় স্কুলও। অনিমেষ তখনও গল্প বলছিল : নেতার হাট নামে একটা জায়গা নাকি সব চেয়ে সুন্দর। আমি সেখানে যাই নি, যাবার ইচ্ছাও নেই।

কেন?

শুধু যে পঁচানব্বুই মাইল দূর তা নয়, উঁচুতেও সাড়ে তিন হাজার ফুট। ছোটনাগপুরের এই অঞ্চলের নাম পাট, সাধারণ

ভাবে মালভূমিকেই বোধ হয় পাট বলে। অরণ্যময় স্থান। শাল ইউক্যালিপ্টাস ও ঝাউএর জঙ্গল। কিছু চাষেরও জমি আছে।

এই দেখতে এত পরিশ্রম!

তাইতেই তো যাব না বলছিলুম।

তবে সুন্দর কেন বলেছে?

বোধহয় শিকারীদের স্বর্গ। দুটো পর্বতশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে পথ। গভীর বন আর অনেক ঝর্ণা পার হয়ে নেতার হাট। বনে বন্য জন্তুর অভাব নেই। মানুষখেকো বাঘ থেকে বিচিত্র হরিণ, কিছুরই অভাব নেই সেখানে।

এবারে আমরা শহরের ভিতর ঢুকে পড়েছি। ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে অনিমেষের দিকে তাকাল। অনিমেষ বলল: প্রথমে অফিসের দিকেই চল।

তারপর আমাদের বলল: এখানে কোন হোটেলে উঠবার দরকার নেই। দশ মিনিটেই কাজ সেরে নেব।

সত্যিই অনিমেষ দশ মিনিটে কাজ সারল। আমরা রাস্তায় গাড়ির ভিতরেই বসে ছিলুম। ফিরে এসে বলল: খুব দেরি হয়েছে কি?

বললুম: মোটেই না।

কিন্তু আমার মনে হল যে অনেক দেরি হলেই আমি বেশি খুশী হতুম। অনিমেষ বেড়াতে আসে নি, এসেছে সরকারি কাজ করতে। কোনারে ও তিলাইয়ায় যে কাজ করেছে, তাকে কাজ বলে না। এখানে ডি. ভি. সি.র কোন অফিস আছে বলে আমার জানা নেই। কী কাজ নিয়ে এসেছে, তা জিজ্ঞাসা করি নি। জিজ্ঞাসা করা শোভন হত না। তবে বুঝতে পারছি যে কাজটা নিতান্তই উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হল আমাদের নিয়ে বেড়ানো। হয়তো আমার জন্যই সে এই ব্যবস্থা করেছে। শুধু পরিশ্রম নয়, অর্থ ব্যয়ও করছে। একজন শৈশবের বন্ধুর জন্য তার এই অন্তরঙ্গ

ব্যবহার প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু আমার মনে খানিকটা ক্ষোভ জমল। একজন ইঞ্জিনিয়ার তুটো দিন নষ্ট করল, আব একজন ড্রাইভার। সরকারি তেল কত পুড়ল তার হিসাব কেউ রাখে না। এ তো শুধু একজন অনিমেষ আমার জন্য করছে না, এমন অনিমেষ আরও অনেক আছে, তারা আমার মতো অনেকের জন্য এই কাজ করছে। এতে হয়তো ব্যক্তিগত লাভ হচ্ছে কিছু কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে দেশের ও দশের। এও যে এক রকমের তুর্নীতি তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

পুলকিত ভাবে অনিমেষ বলল ড্রাইভারকে ঃ রাঁচি লেকে চল বাজারের মধ্যে দিয়ে।

রাঁচির বাজার বড় জমজমাট দেখলুম। বড় শহবের মতো ব্যস্ত বাজার। অনিমেষ আমাকে বুঝিয়ে বলল যে হাজাবিবাগের মতো এখানে মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের বাস নয়, এখানে স্থায়ী বাস সোয়া লক্ষ লোকের। তার উপর স্বাস্থ্যান্বেষী মানুষের ভিড় আছে! কলকাতার লোকের কাছে রাঁচি একটি প্রিয় জায়গা। অনেক বাঙালী এখানে বসবাস করেন।

আমরা একটি সরু রাস্তা ধরে রাঁচি লেকের ধারে এসে পেঁছলুম। একটি পাহাড়ের কোলে গাছে ঘেরা বড় সরোবর। পূর্ব আর পশ্চিম তু দিকে তুটি মন্দির দেখতে পেলুম, আর উত্তরে স্নানের ঘাট। পাহাড় তার পিছনে। এই পাহাড়ের দেহে অরণ্য নেই, ধূসর মেঘ আটকে নেই কোনখানে, শিখরে নেই শুভ্র তুষার। দেখলুম একটা কালো ন্যাড়া পাহাড় সোজা উঠেছে, তার মাথায় মনে হল একটা ছোট মন্দির।

গাড়ি থেকে আমরা নেমে দাঁড়িয়েছিলুম। অনিমেষ বলল ঃ কেমন দেখছিস?

বললুম ঃ চমৎকার।

পাহাড়ের মাথায় উঠবি নাকি?

শীলা আর্তনাদ করে উঠল : মরে যাব।

তার ভয় দেখে আমি হাসলুম।

অনিমেষ বলল : ওপরে মন্দির আছে—মহাদেব আস্থান। আর সেখান থেকে নিচের দৃশ্য দেখতে অদ্ভুত সুন্দর।

আমি বললুম : নিচে থেকেই সে দৃশ্য কল্পনা করতে পারছি।

সাহস পেয়ে শীলা বলল : ঠিক বলেছেন।

অনিমেষের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে বেশ কৌতুক বোধ করেছে। শীলা বলে উঠল : আপনি না থাকলে আজ আমাকে কী শাস্তি দিত আপনি জানেন না। একেবারে খামখেয়ালি মানুষ, হাত ধরে হিড় হিড় করে আমায় উপরে টেনে তুলত।

সে তো এখনও পারি।

শুনছেন কথা!

এই বিবাদে আমি যোগ দিলুম না, বললুম : এই লেকের নাম কী?

শীলা আমার মৎলব বুঝে তাড়াতাড়ি জবাব দিল : রাচি লেক।

অনিমেষ বলল : ও তো আধুনিক নাম। এর আসল নাম হল সাহেব বান্ধ্।

তাই নাকি!

সে পুরাকালের কথা। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল সাউথ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি, ক্যাপ্টেন উইলকিনসন ছিলেন প্রথম এজেন্ট। ১৮৩৪ সালে তিনি এই শহর অধিকার করবার পর থেকেই এর উন্নতি আরম্ভ হয়। সাহেব বাঁধ খনন করেন তাঁর পরের এজেন্ট।

গাড়িতে আবার উঠে পড়ে অনিমেষ ড্রাইভারকে বলল : এবারে কাঁকে চল।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলল ঃ পাহাড়ের ওপর ঐ যে মহাদেবের স্থান দেখছিস, ওটা আগে একটা সামার হাউস ছিল। এখন হিন্দুদের তীর্থ হয়েছে, আদিবাসীরাও ওখানে পূজো দেয়।

কাঁকে যাবার আগে অনিমেষ আমাদের আরও দু-একটি জায়গা দেখাল। একটি পাহাড়ের নাম মোরাবাদী হিল, তার মাথায় একটি ব্রহ্ম মন্দির। লোকে একে টেগোর টেম্পল বলে। রাঁচিতে এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোধহয় এই মন্দিরে যাতায়াত করেছেন, তাইতেই তাঁর নাম আজও জড়িয়ে আছে। পাহাড়ের নাম মোরাবাদী কেন হল, সে সম্বন্ধে বোধহয় কিছু শুনেছিলুম। এখন তা মনে পড়ছে না।

রাঁচি হিলের পশ্চিমে জগন্নাথের মন্দির দেখা যায়। একেবারে সমতলের উপর নয়, খানিকটা পাহাড়ের উপর। দূরত্ব হবে মাইল সাতেক। লোকে বলে যে এই মন্দির পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। যারা নিকটে গিয়ে দেখেছে, তারা বলে, এ কথা সত্য নয়। এই মন্দির নির্মাণের কৌশল অন্য রকম। তবু এই মন্দিরে রথযাত্রার উৎসব হয় মহা সমারোহে।

রাঁচির রাজভবন আমরা দেখলুম, সেন্ট পল্স্ গির্জা দেখলুম, আর দেখলুম রোমান ক্যাথলিক গির্জা।

কাঁকের পথ অতি পরিষ্কার ও প্রশস্ত। সেই পথের ধারে জলের বিরাট আধার দেখলুম, আর দেখলুম উড়ো জাহাজের আকৃতিতে তৈরি কোন ধনীর বাস ভবন।

কিন্তু কাঁকে পৌঁছে কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু কতগুলো বড় বড় বাড়ি দেখলুম। রাঁচির বিখ্যাত পাগলা গারদ এইখানে। আগে ভারতীয় ও ইংরেজ পাগলকে আলাদা রাখা হত, আলাদা বাড়িতে। এখন এই ব্যবধান না থাকলেও ব্যবস্থার তারতম্য আছে বলে মনে হল। স্ত্রীলোকের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা। শোনা গেল যে এক সাহেব ডাক্তারের নিজস্ব হাসপাতালও আছে।

সেখানেও অনেক পাগল থাকে। ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুমতির দরকার, শুনলুম যে তা পাওয়া যাবে না।

আরও একটু এগিয়ে আমরা কৃষি কলেজ প্রভৃতি দেখে ফিরে এলুম।

পথে শীলা বলল: পাগলা গারদ দেখার সাধ আমার অনেক দিনের।

বললুম: পাগলরাই বাদ সেধেছে।

কী রকম?

কর্তৃপক্ষের কাছে তারা নালিশ জানিয়েছিল, আমরা কি চিড়িয়াখানার জন্তু যে লোকে আমাদের দেখতে আসবে! কর্তৃপক্ষ তাদের দাবী মেনে নিয়েছেন।

শীলা বলল: তবে তারা কী রকম পাগল!

হেসে বললুম: গোটা পাগলা গারদ আপনাকে গাইডের মতো দেখিয়ে দেবে এমন পাগলও সেখানে আছে। আপনি হয়ত দুঃখ করে ফিরবেন যে পাগল বলে তাকে কেন ধরে রেখেছে।

১৩

দুপুরের আহারের জন্য আমরা একটা হোটেলে ঢুকেছিলুম। সেইখানেই আলাপ হয়েছিল জোসেফের সঙ্গে। কোন টেবিল খালি ছিল না। সব টেবিলেই দু একজন করে বসেছে। আমরা তিন জন যে টেবিলটা অধিকার করলুম, তাতেই বসে ছিল জোসেফ। আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনারা বাঙালী ?

বাঙলাতেই প্রশ্ন করেছিল। অনিমেষ উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ।

আমি বললাম ঃ আপনি ?

আমার মনে হয়েছিল যে, সে বাঙালী নয়। তাইতেই এই প্রশ্ন করলুম।

জোসেফ হেসে বলল ঃ আমি এই দেশের লোক।

অনিমেষ বোধ হয় এর সঙ্গে আলাপে আগ্রহী ছিল না। তা না হলে আরও কিছু জানতে চাইত। ছেলেটিকে বিহারী বলেও মনে হয় নি, বাঙালীও নয় বলছে। আমি খানিকটা কৌতূহল নিয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। ছেলেটি বলল ঃ আমার নাম জোসেফ , জাতে মুণ্ডা।

মুণ্ডা তো আদিবাসী বলেই জানি।

ঠিকই জানেন।

শীলা আমার দিকে তাকাল বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। বললুম ঃ সাঁওতাল কোল নাম শুনেছেন তো, মুণ্ডাও এমনি একটা জাত। এঁরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ফ্যামিলির। এই অঞ্চলের আর একটি প্রধান জাত হল ওরাঁও। তারা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর।

সাঁওতালের মতো জাত !

শীলা গভীর বিস্ময়ে তাকাল জোসেফের মুখের দিকে। ছেলেটি

কালো ও খর্ব, তার ওপর চওড়া নাক। এমন করে একজন মহিলাকে তাকাতে দেখে লজ্জা পেল।

এমনি সময় বেয়ারা তার খাবার এনে টেবিলের উপর রাখল। জোসেফ আর কথা কইল না। তার তৎপরতা দেখে মনে হল যে সে বেঁচে গেল।

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল তার সঙ্গে ভাব করার। মুণ্ডাদের অনেক কথা তার কাছে জানা যেত। বেয়ারা যখন আমাদের খাবার অর্ডার নিয়ে চলে গেল, আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এখান থেকে কোথায় যাবেন?

আমি?

জোসেফ মুখ তুলল।

বললুম: আপনি।

আমি পুরুলিয়ার দিকে একটা গ্রামে যাব। একটু পরেই আমার বাস ছাড়বে।

আমি অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করলুম: আমরাও তো ঐ দিকেই যাব?

অনিমেষ সংক্ষেপে বলল: হ্যাঁ।

শীলা বলল: তাহলে তো ইনিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন!

অনিমেষ এ কথার উত্তর দিল না।

বললুম: এঁদের আচার-আচরণ সমাজ-ব্যবস্থা জানবার বাসনা আমার আছে। আপনাদেরও ভাল লাগবে।

বলে শীলার দিকে তাকালুম।

শীলা বলল: বেশ তো, চলুন না আমাদের সঙ্গে।

বলে জোসেফের সম্মতির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

খাওয়া থামিয়ে জোসেফ তাকাল মুখ তুলে। আশ্চর্য হয়ে বলল: আপনারা আমাকে বলছেন!

আপনাকেই তো।

অনিমেষও আশ্চর্য হয়েছিল। কিন্তু কোন কথা কইল না।

জোসেফ বলল ঃ আপনাদের অসুবিধা হবে না ?

শীলা বলল ঃ একটুও না।

তাহলে—

খুব ভাল কথা।

বলে শীলা আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ এইবারে আমাকে আক্রমণ করতে হবে।

মুণ্ডা শব্দ গ্রাম্য বলে মনে হয় না। মুণ্ড মানে গ্রামের মণ্ডল, মুণ্ড থেকেই মুণ্ডা। এই শব্দ কোন গ্রন্থে পাই নি। এই অঞ্চলে আরও যে সব আদিবাসীর বাস, তাদের নামও প্রাচীন নয়। ওরাঁও, সাঁওতাল, হো। শুধু কোল শব্দের উল্লেখ পেয়েছি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে।

মালুং মল্লং মাতরঞ্চ ভণ্ডং কোলং কলন্দরম্।

এরা নাকি লেটস্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস। এই আদিবাসীরা এ কথা জানে না, এদের জন্মবৃত্তান্ত অন্য রকম। একবার শুনেছিলুম কারও কাছে, কিন্তু সে গল্প আজ মনে নেই। তাই বললুম ঃ অ্যাডাম ও ইভের মতো আপনাদেরও একটা সুন্দর গল্প আছে শুনেছি।

জোসেফ আর তাড়াতাড়ি খাচ্ছে না, বলল ঃ আছে।

তার পরে সেই গল্প শোনাল আমাদের।—

তাদের বিশ্বাস ওট বোরাম্ ও শিং বোঙ্গা ছিলেন স্বয়ম্ভু। তাঁরা নিজেরা জন্মগ্রহণ করে এই পৃথিবী গাছপালা ও পশুপক্ষী সৃষ্টি করলেন। তারপরে মানুষ জাতির সৃষ্টির জন্য এক বালক ও বালিকা সৃষ্টি করে তাদের এক গুহায় বাস করতে দিলেন। বড় হলেও তারা ভাই বোনের মতো পবিত্র জীবন যাপন করতে লাগল। শিং বোঙ্গা দেখলেন মহাবিপদ। সৃষ্টির কথা তাদের মনে আসছে না। তখন তিনি তাদের ধান থেকে মদ তৈরি

করা শেখালেন : সেই মদ খেয়ে তারা জীবনকে চিনল। ক্রমে ক্রমে তাদের বারটি পুত্র ও বারটি কন্যার জন্ম হল।

আমি লক্ষ্য করে দেখলুম যে জোসেফ অত্যন্ত সহজ ভাবে এই গল্প বলে যাচ্ছে। যে কথা বলতে আমরা ইতস্তত করতুম, অশ্লীল করে দেখতুম বক্তব্যকে, সেই কথা সে অনায়াসে বলে গেল শুধু আমাদের সামনে নয়, শীলার সামনেও। অথচ সবই যেন স্বাভাবিক মনে হল। জীবনকে তারাই চিনেছে, আমরা চিনেছি শুধু জীবনের মুখোসকে।

জোসেফ বলল : সৃষ্টিকর্তা শিং বোঙ্গা এইবারে দম্পতি তৈরি করলেন। বারটি পুত্র ও বারটি কন্যায় বার জোড়া হল। এই উৎসবের সময় নানা রকমের খাদ্য তিনি থরে থরে সাজিয়ে রেখেছিলেন। প্রত্যেক দম্পতিকে বললেন পছন্দ মতো খাদ্য নিতে। প্রথম দম্পতি গো ও মহিষের মাংস পছন্দ করে মুণ্ডা কোল প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি করল। সাহেবদেরও আদি পুরুষ এরা। শাক সব্জি পছন্দ করে দ্বিতীয় দম্পতি হল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জন্মদাতা। ছাগলের মাংস খেয়ে তৃতীয় দম্পতি শূদ্র সৃষ্টি করল। সাঁওতালেরা শূকর খেয়েছিল, আর ভুঁইয়ারা খেয়েছিল শামুক ও ঝিনুক। যারা কিছুই পায় নি, তারা প্রথম ও দ্বিতীয় দম্পতির কাছে কিছু অবশিষ্ট পেয়ে খাসিয়াদের আদি পুরুষ হল। খাসিয়ারা কোন কাজ করে না, শুধু শিকার করে জীবন ধারণ করে।

আমাদেরও তখন খাবার এসে পৌঁছেছে, আমরাও খাবারে মন দিল।

খেতে খেতেই শীলা বলল : এটা কি সত্যি গল্প ?

জোসেফ কিছু বলবার আগে আমি বললুম : ধর্মের ভিত্তি বিশ্বাসের উপর। অবিশ্বাসে আমরা শুধু যন্ত্রণা পাই।

জোসেফ বলল : ঠিক কথা। আপনাদের শুনেছি তেত্রিশ কোটি দেবতা, এই দেশে এত মানুষ হয়তো নেই।

শীলা জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনাদের দেবতা কত ?

জোসেফ হেসে বলল ঃ একজন। আমরা তো ক্রীশ্চান হয়েছি।

আমি বললুম ঃ যারা ক্রীশ্চান হয় নি, তাদের কথা বলুন।

তাদের অনেক দেবতা।

একটু থেমে বলল ঃ শিং বোঙ্গা বোধহয় সূর্য, তাঁর স্ত্রী চনলা। কেউ বলেন চন্দ ওমল চন্দর বা চন্দ্রা। স্ত্রীলোকেরা তাঁর পূজা করে, ছাগবলি দেয়। এঁদের সম্বন্ধে একটি গল্পও প্রচলিত আছে। অন্য পুরুষে আসক্ত হবার জন্য শিং বোঙ্গা তাঁর স্ত্রীকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ড করেন। সেইজন্যেই চনলার খণ্ডিত রূপ। শিং বোঙ্গা যে দিন তাঁর স্ত্রীর প্রতি সদয় হন, সে দিন আমরা তাঁকে ষোলকলায় পূর্ণ দেখি।

অনিমেষ বলল ঃ আমাদের শাস্ত্রেও বোধহয় অনুরূপ কাহিনী আছে।

আমাদের শাস্ত্রে চন্দ্র পুরুষ। দক্ষ প্রজাপতির সাতাশটি কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। রোহিণীর প্রতি বেশি আসক্তির জন্য দক্ষ শাপ দেন।

সাতাশটি স্ত্রী থাকবার পরেও—

না না, রোহিণী সাতাশ জনেরই একজন। বাকি ছাব্বিশ জন বাপের কাছে নালিশ করেছিল। চন্দ্রকে সাবধান করে দক্ষ প্রজাপতি যখন ফল পেলেন না, তখনই তিনি শাপ দিলেন, তার ক্ষয়রোগ হবে। প্রতি দিন ক্ষয় হবে চন্দ্র।

এক পক্ষ পরে যে আবার বাড়তে শুরু করেন!

সে সোমনাথের বর। দশ হাজার বছর প্রভাসে তপস্যা করে চন্দ্র এই বর পেয়েছিলেন যে দ্বিতীয় পক্ষে প্রতিদিন বেড়ে বেড়ে পূর্ণিমায় তিনি ষোল কলায় পূর্ণ হবেন।

জোসেফ বলল ঃ শিং বোঙ্গার পরেই বুরু বোঙ্গা ও মরং বুরু। এই দেবতারা পর্বতে বাস করেন। এঁদের তৃপ্তির জন্যে পশুবলি

দিতে হয়। অনাবৃষ্টির বৎসরে মরং বুরুর সামনে মহিষ বলি দিতে হয়। তিনি বরুণ, তিনি সন্তুষ্ট হলে দেশে বৃষ্টিপাত হয়।

শীলা প্রশ্ন করল: ইন্দ্র নেই?

না। স্বর্গের বদলে গ্রামের নানা দেবতা আছে। এক এক গ্রামের এক এক দেবতা। বাস্তু দেবতার নাম কারাসর্ণা, তাঁর স্ত্রী সরুলসর্ণা, চলতি কথায় জাহির বুড়ি। সর্ণা মানে কুঞ্জ বন। কুয়ো বা পুকুরের দেবতা ইকির বোঙ্গা, নদী বা ঝর্ণার দেবতা গর্হা এরা, অপদেবতাদের নাম নাগ এরা। এঁরা ক্রুদ্ধ হলে আধি ব্যাধি মড়ক হয়, এঁদের প্রীতির জন্য নানা রকমের বলির বিধান আছে। শাদা ছাগল কালো মুরগি শূয়োর, এমন কি ডিম পর্যন্ত।

জোসেফ বলল: হাপরোম আর একটি নাম। ইনি দেবতা নন। ইনি পিতৃপুরুষের প্রতিনিধি এবং সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আহারের সময় প্রতি দিন তাঁকে স্মরণ করে কিছু খাদ্য উৎসর্গ করা হয়। তাঁর পূজা হয় মোরগ বলি দিয়ে।

আমি লক্ষ্য করছিলুম যে জোসেফ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। আমরা আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ করে ফেলেছি, অথচ সে আমাদের আগে শুরু করে এখনও শেষ করতে পারে নি। তাকে খাবার সুযোগ দেবার জন্য আমি শীলাকে বললুম: এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে দেবতা এবং অপদেবতার ধারণা পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে সমান ভাবে বর্তমান। দেবতার সম্বন্ধে আদিবাসীরা এখনও যে ধারণা পোষণ করছে, আমরাও ঠিক তেমনি ভাবেই দেবতাকে সৃষ্টি করেছি। আকাশের সূর্য চন্দ্র আমাদের দেবতা, যে বরুণ জল দেন তিনিও দেবতা। যাদের দৃষ্টি কল্যাণময় নয়, তারা অপদেবতা। এদের সকলের প্রীতির জন্যেই এক ব্যবস্থা। পূজা দাও, পূজা মানেই বলি। তারপর যুগে যুগে এই ধারণার পরিবর্তন হতে লাগল। জন্ম হল বুদ্ধ মহাবীরের, যীশু মহম্মদের, চৈতন্য রামকৃষ্ণের। দেবতার ধারণায় আমাদের পরিবর্তন এল।

আদিবাসীরা অরণ্যচারী, মহাপুরুষদের বাণী তাদের কাছে পৌঁছায় নি বলেই আজও তাদের ধারণা বদলায় নি।

অনিমেষ বলল: বদলাতে শুরু করেছে। এঁকেই দেখ না, ইনি তো এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী বললেন।

বলে জোসেফকে দেখাল।

আমি জোসেফেব দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে বড় বড় গ্রাসে তার খাওয়া শেষ করে ফেলেছে। সে বুঝতে পেরেছিল যে আমবা তার জন্য অপেক্ষা করছি।

গাড়িতে উঠে আমি শীলাকে বললুম: আপনি বোধহয় মুণ্ডাদেব বিবাহ প্রথা জানেন না!

না।

আদিবাসীদেব বিবাহ প্রথায় অভিনবত্ব আছে। জানতে পারলে মন্দ লাগে না।

ঠিক বলেছেন।

জোসেফ আমার পাশে বসে ছিল, বলল: প্রথার পবিবর্তন হচ্ছে প্রতি দিন। তাব ওপর তের শ্রেণীর মুণ্ডা আছে। তাদেব ধরণ ধাবণে কিছু পার্থক্য থাকবেই। মোটামুটি ভাবে আমাদেব পিতৃকুলে বিয়ে হয় না, মাতৃকুলে বাধা নেই। যারা একটু উঁচু শ্রেণীর, তাদের বিয়ে পিতামাতাই ঠিক করে। পণ দিয়ে মেয়ে নিতে হয়। আপনাদের মতো যাগযজ্ঞ নেই, কনের কপালে সিঁদুব দেওয়াই প্রধান কাজ। কনে আবার বরের কপালে সিঁদুর দেয়। আগে নাকি বরকে আম গাছের সঙ্গে ও কনেকে মহুয়া গাছেব সঙ্গে বেঁধে রাখা হত। সে সব প্রথা উঠে গেছে। নিচু শ্রেণীর লোকদেব মধ্যে একটু বেশি বয়সে বিবাহ হচ্ছে। এমন কি বিয়ের আগেও স্বামী স্ত্রীর মতো থাকবার অনুমতি আছে! গন্ধর্ব বিবাহের নাম ধুকো এরা। সাগাই প্রথা হল বিধবা বিবাহ। বিধবার কপালে সিঁদুর দিতে হয় বাম হাতে।

জোসেফ একটু থেমে বলল : বিবাহ বিচ্ছেদ আপনাদের মতো কঠিন নয়। স্বামী স্ত্রী রাজী হলেই হল। তারপর তারা পুনরায় বিবাহ করতে পারে। ইচ্ছা করলে স্ত্রী উপপতিও গ্রহণ করতে পারে। তার শাস্তি আর কিছু নয়, স্বামীকে তার পণের টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হবে।

অনিমেষ হেসে বলল : ভারি চমৎকার ব্যবস্থা।

শীলার দৃষ্টিতে আমি কৌতুক দেখলুম।

জোসেফ বলল : এই সব ব্যবস্থা হয় তো অসভ্য মনে হতে পারে, কিন্তু আপনাদের সমাজে কি এ রকম ঘটনা ঘটছে না ?

উত্তর না পেয়ে জোসেফ বলল : নিন্দার ভয়ে আপনারা যা লুকিয়ে করেন, আমরা তা মেনে নিয়েছি। সমাজের আইন কানুনের চেয়ে কি জীবনের ধর্মটা বড় নয় !

অনিমেষ আর হাসল না। প্রতিবাদও করল না। উত্তর আমি দিলুম, বললুম : প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া জীবনের দাবী হতে পারে, কিন্তু মানুষের ধর্ম নয়। নীতিবোধ মানুষের প্রথম পাঠ।

আমি আশা করি নি যে জোসেফ এ কথার উত্তর দেবে। কিন্তু সে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলল : কোন্‌টা নীতি আর কোন্‌টা দুর্নীতি, তার সঠিক বিচার কি আজ হচ্ছে ?

হচ্ছে না।

জোসেফ হেসে বলল : তবে এ আলোচনা থাক।

বললুম : সেই ভাল। আপনি আপনাদের নাচ গান উৎসবের কথা কিছু বলুন।

জোসেফ বলল : আমাদের দেশে উৎসবের অভাব নেই। বর্ষায় বাতৌলি উৎসব, শরতে জোমননা, শীতে মাঘ পরব ও বসন্তে সর্জুম বাবা।

শীলা হেসে উঠল।

জোসেফ জিজ্ঞাসা করল : হাসলেন যে ?

উৎসবের নামগুলি বেশ।

নাম একটা নয়, একই উৎসবের একাধিক নাম আছে। বাতৌলিকে কেউ বলে কদলেতা, জোমননাকে ননাও বলে। মাঘ পরবকে কেউ বলে খরিয়া পূজা, কেউ বলে কলম সিংহ, হো জাতের লোকেরা বলে দেশওয়ালী বঙ্গা। সর্জম বাবার আর এক নাম সরহুল।

শীলার হাসি থামল না।

আমি বললুম ঃ এই সব উৎসবেব কথা সংক্ষেপে বলুন।

জোসেফ বলল ঃ আমাদের ধারণা যে বাতৌলি উৎসব না করলে ক্ষেতের ধান পাকে না। অথচ উৎসবটা এমন কিছুই না। চাষীরা সবাই একটা করে মোরগ বলি দেবে। আর সেই মোরগেব একটা পাখা এক খণ্ড বাঁশে গুঁজে গোবরের গাদায় পুঁতে রাখবে।

শীলা বলল ঃ ব্যস ?

চুপি চুপি করে না বলেই এর নাম উৎসব।

সত্যি কথা। এক সঙ্গে একই রকমের কাজ যদি অনেক লোকে করে, তাহলেই সেটা একটা পর্ব বা উৎসব বলে মনে হবে।

জোসেফ বলল ঃ আশ্বিন মাসে আমাদের নবান্ন। ধান পাকে। মাঠের প্রথম ধান শিং বোঙ্গাকে না উৎসর্গ করে কি নিজে খাওয়া যায়! একটি সাদা মোরগ বলি দিয়ে জোমননা উৎসব সম্পূর্ণ হয়। মাঘ পরবও শস্য সঞ্চয়ের উৎসব। ফল ফুল মোবগ বলি দিয়ে পূজো হবে গ্রামের দেবতার। সিংভূমের হো-রা শুনেছি মদ খেয়ে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে। কথাটা সত্য কি না জানি না।

ব্যভিচার তো সভ্য সমাজেরই বিশেষত্ব। সরল আদিবাসীরা এই আদিম প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা আমার হল না।

জোসেফ বলল: বৎসরের শেষ উৎসব সর্জুম বাবা। চৈত্র মাসে শালের বনে ফুল ফুটবে, এক রকমের গন্ধে চারি দিক আচ্ছন্ন হবে। গ্রামের লোকেরা শাল ফুলের মালা আর মোরগ বলি দিয়ে সর্জুম বাবার পূজা করবে।

আমাদের গাড়ি ছুটেছে পুরুলিয়ার পথে। আকাশের সূর্য আর মাথার উপরে নেই, কিন্তু রৌদ্রে পৃথিবী ঝলসাচ্ছে। বাতাসে উত্তাপ তত প্রখর নয় বলে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে আসছে। অনিমেষের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

১৪

অনিমেষ বলেছিল যে রাঁচি থেকে জামসেদপুব যাবার খুব অসুবিধে নেই। ভাল রাস্তা আছে। রাঁচি থেকে বড় রাস্তা গেছে চাইবাসা, সেখান থেকে জমসেদপুর, মুরি হয়েও যাওয়া যায়। মুরি থেকে বরভূম, বরভূম থেকে চাণ্ডিল হয়ে জামসেদপুর। জামসেদপুর হয়ে ফেরার ইচ্ছা ছিল। যে বন্ধুরা টাটার ইস্পাতের কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ঢুকেছে তারাই কারখানার ভিতরটা দেখিয়ে দিতে পারত।

কারখানা দেখার শখ আমার নেই, কিন্তু শহরটা দেখা যেত। কিছু দিন পূর্বেও ভারতে ইস্পাতের কারখানা বেশি ছিল না। একটা আসানসোলের নিকট বার্নপুর-কুল্টিতে, আর দ্বিতীয়টি এই টাটানগরে এই শতাব্দীরই গোড়ার দিকে স্থাপিত হয়েছে। জমসেদজী টাটার মূলধনে নির্মিত এই বিরাট কারখানা ভারতের গৌরবের বস্তু। দেশ স্বাধীন হবার পর আরও নানা স্থানে নূতন কারখানা নির্মিত হচ্ছে—দুর্গাপুর, রাউরকেলা, ভিলাইএ। শোনা যাচ্ছে, এতেও দেশে ইস্পাতের প্রয়োজন পুরোপুরি মিটবে না।

তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ভারতের এই অঞ্চলেই সমস্ত কারখানাগুলি নির্মিত হচ্ছে। তার কারণ আছে। ইস্পাত তৈরির জন্য যে মালমসলা দরকার, তার সবই পাওয়া যায় এই অঞ্চলে। কারখানা অন্যখানে হলে মালমশলা চালান করাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে পরিবহণের যে ব্যবস্থা আছে, তা উপযুক্ত নয়। এই সব কারখানাগুলি তাই বিদ্যুৎচালিত রেলপথে সংযুক্ত করা হচ্ছে।

আমার এক বন্ধু জামসেদপুর দেখে এসেছে। জামসেদপুর শহরের নাম, আর স্টেশনের নাম টাটানগর। সে বলেছিল যে শহরটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। সন্ধ্যা বেলায় আকাশের একটা দিক লাল হয়ে থাকে, আগুন লাগার মতো লাল। ওইটি কারখানার দৃশ্য। একটা নিচু পাহাড়ের মাথায় একটি মনোরম বেড়াবার জায়গার বর্ণনা করেছিল। কোন্‌টা ডিমনা লেক আর জুবিলি পার্ক কোন্‌টা, তা ভুলে গেছি। ছবি দেখিয়েছিল কারখানার ভিতরের, ইস্পাত তৈরির ছবি। নানারকম মালমশলা মিলিয়ে প্রথমে লোহা তৈরি হয়। লোহা থেকে পিগ্‌ আয়রন, তারপরে ইস্পাত।

রাঁচি থেকে মুরি বিয়াল্লিশ মাইল পথ, পুরুলিয়া আরও উনত্রিশ মাইল। আমরা পুরুলিয়া পর্যন্ত যাব না। এগার মাইল বাকি থাকতেই ধানবাদের পথ ধরব। এ কথা জোসেফের কাছে শুনেছি। সে এই মোড়ে নামবে। কতটা পথ হাঁটতে হবে তা বলে নি। পাছে আমরা বলি যে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি, সেই ভয়েই বলে নি। বলেছে, হাঁটবার দরকার থাকলেই বা হাঁটব কেন! পুরুলিয়ার বাস তো ছাড়িয়ে যাব, সেই বাসেই ওঠা যাবে। আপনারা কেন দেরি করবেন!

এ সব হল ভদ্রতার কথা। কিছু দিন আগেও এই ভদ্রতার আদর ছিল। আজ আর নেই। এই রকম ভদ্রতা করলে এখন লোকে বোকা ভাবে। কে কার কাছে কতখানি আদায় করতে পারল, তাই দিয়েই হয় এ যুগের বুদ্ধির বিচার। এই আদায়ের কৌশল ভিক্ষার পাত্র থেকে রাহাজানি খুন পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। সরকারী দপ্তরে এর অন্য নাম। সেলামি। নিন্দুকে বলে দুর্নীতি। টাকা নেওয়াকেই নাকি ঘুষ বলে, উপহার ডালি এ সব ঘুষের পর্যায়ে পড়ে না। অধস্তন কর্মচারীর পরিশ্রম নাকি যত্র তত্র নেওয়া চলে। সাধারণ নির্বাচনের সময় মন্ত্রীরা যখন ভোটের জন্য ছুটোছুটি করেন, সরকারী কর্মচারীরা তখন সমস্ত কাজ ফেলে তাঁদের সাহায্য করতে

পারেন। কর্তারা যখন সভা সমিতি করতে বার হন, কিংবা কিছু উদ্বোধন বা ভিত্তি স্থাপনের জন্য, তখন তাঁরা জমজমাট উৎসবের মণ্ডপ চান। বান্দাবা দিনের পব দিন গায়ে গতরে খেটে জিনিসপত্র ও অর্থের শ্রাদ্ধ করে কর্তাদের মন পাবার চেষ্টা কবেন। যুগের রেওয়াজে এ সব কাজ দুর্নীতি বলে গণ্য হয় না। মনোবঞ্জন বলে, এ আমাদের কর্তা ভজাব দেশ। এই কাজেই আমাদেব গৌরব।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। খেয়াল হল শীলার প্রশ্ন শুনে। বলল: আপনাবা সবাই বড় চুপ চাপ চলেছেন।

বললুম: দুপুরেব হাওয়ায় একটু আলস্য আছে।

শীলা অনিমেষের দিকে তাকিয়ে হাসল।

জোসেফ বলল: আপনিই কিছু বলুন না।

আমি! ওমা, আমি আবাব কী বলব!

কেন, নিজের দেশের কথাই কিছু বলুন।

ভয়ে ভয়ে শীলা বলল: তাব চেয়ে এ দেশের নাচের কথা কিছু শুনি। সাঁওতালবা নাকি খুব ভাল নাচে।

জোসেফ বলল: আপনি নিজে নিশ্চয়ই নাচতে জানেন!

কেন?

তা না হলে নাচেব কথা কেন আপনাব মনে হল?

এমনি।

আমি বললুম: স্বীকাব করুন না চুপি চুপি।

উত্তরে শীলা শুধু হাসল।

বললুম: বাড়ি গিয়ে দেখতে পাব তো?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে শীলা জোসেফকে তাড়া দিল, বলল: শুরু করুন শিগগিব।

বললুম: আমাব প্রার্থনা তাহলে মঞ্জুর হল?

উত্তর না দিয়ে শীলা এবারেও হাসল।

জোসেফ বলল: আমাদের পর্ব মানেই নাচ, না নাচলে কোন

উৎসব হয় না। একটু আগে আপনাদের যে সব উৎসবের কথা বললাম, তার সঙ্গে নাচ আর গান থাকবেই। নাচের সঙ্গে বাজনাও থাকবে। শুধু ওরাওঁদের সরহুল নাচে কোন বাজনা নেই।

নাচের সঙ্গে বাজনা নেই?

না। পুরুষ ও মেয়েরা দাঁড়াবে দু তিন সারিতে। গান শুরু করবার আগে বলবে হো হো হো। প্রথমে আস্তে, তারপরে জোরে, আরও জোরে। চারি দিক থেকে যখন প্রতিধ্বনি আসবে হো হো হো, তখন শুরু হবে গান। গানের সঙ্গে নাচ। শেষ হবার সময়েও একটা অদ্ভুত চীৎকার করবে, তার পর লাফিয়ে মাটিতে পদাঘাত করবে তিনবার। মানে, নাচ শেষ হল। অনেকে মনে করে, এটা লড়াইএর নাচ। আরম্ভ ও শেষ করার ভঙ্গির জন্যেই এই রকম মনে হয়।

জোসেফ হঠাৎ প্রশ্ন করলঃ সাঁওতালদের নাচ নিশ্চয়ই দেখেছেন?

শীলা বললঃ না।

দেখেন নি! সাঁওতালরা শুধু এখানে নয়, বাঙলা ও উড়িষ্যাব সীমানাতেও ছড়িয়ে আছে।

তা আছে, কিন্তু শহুরে লোকের সামনে তারা নাচে না।

জোসেফ বললঃ সাঁওতালদের নানা রকমের নাচ আছে--ধান কাটা, নীল তোলা, শিকারের আয়োজন। তাদের মধ্যে হাসির নাচও আছে,—সতীনের ঝগড়া তারা নেচে নেচে দেখায়। ভারি প্রাণবন্ত তারা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, একজন তরুণ মাদল নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রবল উদ্যমে বাজাতে লাগল। এই মাদলের বাজনা শুনে গাঁয়ের মেয়েরা সব ছুটে বেরিয়ে আসবে। বসন্তে তারা ফুল গুঁজবে খোঁপায়, আর শীতে পালক। মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়াবে একটা সারিতে, পুরুষরা দাঁড়াবে মাদল

নিয়ে। তারপর বাজনার তালে তালে এগোবে আর পেছবে। তাদের দেহ দুলবে মনোহর ভঙ্গিতে। নাচ শেষ হলে তাদের গল্প গুজব, ছেলেমেয়েতে প্রভেদ নেই কোন।

আমি বললুম : আমি একখানা যাত্বর নাচের ছবি দেখেছিলুম।

জোসেফ বলল : ওরাওঁদের ভাষায় যাত্বর মানে বসন্ত, এটা ওদেরই নাচ, আর সব চেয়ে পুরনো নাচ। সমুদ্রের গর্জনের মতো মাদল বাজবে, আর নাচের ভঙ্গিতে থাকবে জলের তরঙ্গভঙ্গ। হাত ধরা ধরি করে মেয়েরা দাঁড়াবে এক সারিতে, আর এক সারিতে দাঁড়াবে মাদল নিয়ে পুরুষরা। বাজনার তালে তালে পা ফেলে মেয়েরা যখন দু পা এগোবে, পুরুষরা পিছিয়ে যাবে। আবার মেয়েরা যখন সামনের দিকে ঝুঁকে পিছিয়ে এসে বামে হেলবে, পুরুষরা তখন এগিয়ে আসবে বীরবিক্রমে।

শীলা বলল : সাঁওতালদের নাচও তো কতকটা এই রকম।

কতকটা। অন্য রকম হল করমা নাচ। বর্ষার মেঘে আকাশ যখন ছেয়ে যায়, সেই সময়ে ছেলেমেয়েরা করমা নাচে। এই নাচে একটা বেদনার সুর আছে। ছেলেরা মেয়েদের ঘিরে দাঁড়ায়, আর একদল দাঁড়ায় বাজনা নিয়ে। দেড় পা এগিয়ে মেয়েরা পাখির মতো লাফায়, তার পর এক পা তুলে নিচু হয়ে লাফিয়ে ফেরে তার পুরনো জায়গায়। ছেলেরা গান গায়, হাতে তালি দেয়, আর লাফিয়ে এগোয় মেয়েদের দিকে। যারা বাজায়, তাদের বাজনায় থাকে মেয়েদের এক পায়ে লাফাবার নির্দেশ। তারাও মেয়েদের দিকে এগিয়ে যায়।

জোসেফ বলল : বলতে ভুলে গেছি, নাচের সময় ছেলে ও মেয়ে দু দলের কাঁধেই থাকে একটা করে লাঠি।

আমি বললুম : আমি এক ছৌ নাচের কথা পড়েছিলুম খবরের কাগজে। ছৌ নাচের একটা দল নিয়ে সেরাইকেল্লার রাজা নাকি ইয়োরোপে গিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে।

খুশী হয়ে জোসেফ বলল : আপনার ঠিক মনে আছে। সিংভূম জেলার সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ানের লোকেদের এটা বিশিষ্ট নাচ। নীলগিরি ময়ুরভঞ্জ ও সেরাইকেল্লার রাজারাই এই নাচের এমন উন্নতি সাধন করেছেন।

একটু থেমে জোসেফ বলল : ছৌ নাচের কতগুলি বিশেষত্ব আছে। তার মধ্যে প্রধান হল, এ নাচ মেয়েরা নাচে না, শুধু পুরুষেরাই নাচে। আর সেরাইকেল্লার লোকেরা মুখোস ছাড়া নাচে না। বিষয়-বস্তু সাধারণত পুরাণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন দুর্গা নাচ। এই নাচে এমন একটা গাম্ভীর্য আছে যে একে লোকনৃত্য না বলে ধ্রুপদী নৃত্য বললেই ভাল হয়।

বললুম : তারপর ?

জোসেফ বলল : তারপর আপনাদের নাচের কথা বলুন।

আমি শীলাকে বললুম : আপনাদের মিথিলায় কোন নাচ নেই ?

অনিমেষ কখন জেগেছিল জানতে পারি নি। আমার প্রশ্নের উত্তর এবারে সেই দিল, বলল : ভাল করে চেপে ধর্।

হেসে বললুম : রাজী হয়েছেন। বাড়ি ফিরে নাচ দেখতে পাব। তুই তো খুব ভাগ্যবান।

জোসেফ বলল : ভাগ্যবান বৈকি। আমরা শুনেই একটু আনন্দ পেতে চাই। বলুন এবারে।

শীলা বলল : মিথিলায় একটা মেয়েদের নাচ আছে, তার নাম জটা জটিন। এ নাচে পুরুষের যোগ দেবার অধিকার নেই। অল্প বয়সের সধবা ও কুমারী মেয়েরা কোন বাড়ির আঙিনায় নাচে। সেও শুধু বর্ষাকালের চাঁদিনী রাতে, সারা রাত ধরে জটা জটিনের কাহিনী নাচা হয়। এ একটা প্রেমের কাহিনী। জটিনকে ঘিরে যখন মেয়েরা নাচছে, তখন একটা দুর্বৃত্ত মাঝি এসে জটিনকে চুরি করে নিয়ে যাবে। অনেক দিনের বিরহ ও কষ্টের পর আবার তাদের মিলন হবে। এই হল গল্প।

এ নিয়ে আলোচনা আর হল না। জোসেফ বলল : আমি এখানেই নামব।

আমরা কি মুরি ছাড়িয়ে এসেছি ?

জোসেফ বলল : অনেকক্ষণ।

সত্যিই আমাদের এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। জোসেফকে আমরা নামিয়ে দিলুম। মনে হল, আমাদের একজন আত্মীয় নেমে গেল। শিল্পের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা হতে বুঝি বেশি সময় লাগে না।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা বাঁ হাতের পথ ধরলুম। এই পথ সোজা ধানবাদে পৌঁছবে। ধানবাদ শহরে আমরা যাব না, সিন্দ্রীর সারের কারখানাও দেখব না, আমরা সোজা মাইথনে ফিরব। এই পথের ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। এ ঘটনা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। এই পথেই আমি নিজেকে চিনতে পেরেছিলুম, চোখে আঙুল দিয়ে এরা আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিল।

শীলা বলেছিল: বাড়ি পৌঁছতে আজ আমাদের রাত হবে?

অনিমেষ বলেছিল: তা হবে।

আমি বলেছিলুম: জটা জটিনের নাচ তো রাতেই হয়, চাঁদিনী রাতে জমবে ভাল।

শীলা বলল: ও নাচ কি একজনে হয়!

বললুম: যা হয় তাই দেখব।

অনিমেষ বলল: রাতে তাহলে থাকতে হবে।

তারপর?

ভোর বেলায় দিল্লী মেলে তুলে দেব।

দিল্লী মেল কি এ দিকে দাঁড়াবে!

কোথাও তো দাঁড়াবে। দরকার হলে আসানসোলে গিয়ে ধরিয়ে দেব।

বললুম: দিল্লী মেল দশটার পরে কলকাতায় পৌঁছয়, পাঞ্জাব মেলে গেলে দশটার আগেই পৌঁছনো যাবে।

অনিমেষ সোৎসাহে বলল: কুছ পরোয়া নেহি, পাঞ্জাব মেলই ধরিয়ে দেব।

রাতে আমি থাকব শুনে শীলাও খুশী হয়েছিল। বলেছিল: আপনার কষ্টের পরিমাণ তাতে কমবে। এসে অবধি যা কষ্ট পাচ্ছেন, আর হয় তো আমাদের কাছে আসবেনই না।

আমি বলেছিলুম: কষ্টের চেয়ে যে আনন্দ বেশি পেলুম। আনন্দের লোভেই বারবার আসতে হবে।

তারপর তাল কেটে গেল। সমস্ত আবহাওয়াটাই সহসা বদলে গেল। আমি যে কত হীন কত অবাঞ্ছিত, শীলার একটি কথায় তা বুঝতে পারলুম।

কুমারডুবি পৌঁছবার আগে অনিমেষ হঠাৎ জানতে চেয়েছিল: আজ কাল কী করছিস তা আমাকে এখনও বলিস নি।

জানতে চাইলেই বলতুম। নিজে থেকে একবার বলতে গিয়ে দিল্লীতে খুব বকুনি খেয়েছিলুম।

কী রকম?

আই. সি. এস. ব্যানার্জি সাহেবের মেয়ে মিত্রা আমার পরিচয় জানতে চায় নি, কিন্তু তার দৃষ্টিতে সেই কৌতূহল দেখেছিলুম। তাই নিজেই আমার পরিচয় দিয়েছিলুম—নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আপনার বলতে দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই। উত্তরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘর আছে, আছে নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন, আর ডালহৌসী স্কোয়ারে আছে সারি সারি টেবলের ভিতর একখানা কাঠের চেয়ার।

দিল্লীর অফিসার রাণার মতো অনিমেষও অট্টহাস্য করে উঠল, কিন্তু শীলা বলল: আপনি কেরাণী!

চকিতে ফিরে আমি তার মুখের ভাব দেখলুম। কী তীব্র ঘৃণা তার দৃষ্টিতে! শুধু নাকের পাশ দুটিও নয়, সরু ভ্রূও সমান কুঁচকে ছিল। আমি কোন উত্তর দেবার সাহস পাই নি। অনিমেষও আর কোন কথা বলে নি।

মাইথনে পৌঁছতে আমাদের খুব বেশি দেরী হয় নি। বসবার

ঘরে আমাকে বসিয়ে ওরা যখন ভিতরে গেল, তখনও আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে পারি নি। স্থির করলুম খানিকটা পরে, যখন তাদের স্বামী স্ত্রীর কয়েকটা টুকরো কথা পাশের ঘর থেকে আমার কানে এল।

শীলা বলল ঃ যাকে তাকে কেন এনে বাড়িতে তোল ?

অপরাধীর মতো অনিমেষ বলল ঃ গোপালের চেয়ে ভাল ছেলে আমাদের ক্লাসে আর ছিল না।

এর পরে শীলা কি বলল আমি শুনতে পাই নি। শুনলুম অনিমেষের কথা ঃ এমন সময় তাকে কোথায় পৌঁছব ?

কেন, স্টেশনে !

এখন তো কোন ট্রেন নেই !

ওয়েটিং রুম আছে।

আমার কর্তব্য স্থির করতে আর একটুও সময় লাগল না। টেবিলের উপর থেকে আমার ঝোলাটা আমি সংগ্রহ করে নিলুম। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে ডাকলুম ঃ অনিমেষ।

পাশের ঘর থেকে অনিমেষ বেরিয়ে এল। তার শুকনো মুখ বড় করুণ বেদনার্ত দেখলুম। বললুম ঃ একটা খুব ভুল হয়ে গেছে। আমার এখুনি আসানসোলে যাওয়া দরকার। কোন্‌খান থেকে বাস ছাড়ে বলতে পার ?

বিস্ময়ে অনিমেষ উত্তর দিতে পারল না। শীলার কণ্ঠস্বর কিন্তু শুনতে পেলুম ঃ যাও, দেখিয়ে এস।

না, অনিমেষকে সে বলে নি। বলেছিল বেয়ারাকে। পরক্ষণেই সে বেরিয়ে এল পথ দেখাবার জন্য।

অনিমেষ গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। বলেছিলুম ঃ তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়ে গেলুম ভাই, কিছু মনে ক'রো না।

অনিমেষ কোন উত্তর দিতে পারল না।

সেদিন আমি আসানসোল থেকে রাতের ট্রেন ধরেছিলুম, উত্তর-পাড়ায় পৌঁছেছিলুম ভোর বেলায়। ট্রেনে ঘুম হয় নি, অত্যন্ত গরম বোধ হচ্ছিল। জানালা দিয়ে বাতাস আসছিল, তাতেও শরীর শীতল হচ্ছিল না। একটা অদ্ভুত যন্ত্রণায় আমি সারা রাত জেগে রইলুম।

পরে অনেকবার আমি এই ঘটনাটা ভেবে দেখেছি। শীলার কোন দোষ খুঁজে পাই নি। তার ঘৃণা তার নিজস্ব নয়। এই ঘৃণা সে তার চারি পাশের বাতাস থেকে আহরণ করেছে। তার শিক্ষায় ও সংস্কারে এই ব্যবহারের সমর্থন আছে। অনিমেষ আমার শৈশবের বন্ধু—তা না হলে সেও আমাকে ঘৃণা করত। হয়তো এর পর থেকে করবে। সরকারী কাজ নিয়ে যে কেরাণীরা তার কাছে আসে, সে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। কটু কথা না বললেই হয়তো যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করেছি ভাবে। কোন সাহেব তার অধস্তন বাবুদের বসতে বলে না. সেটা অফিসের নিয়ম বিরুদ্ধ। সাহেবের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার দুঃসাহস কোন সাধারণ কেরাণীর থাকে না। শীলা এ সবই জানে।

আমার এক বন্ধুর কাছে আরও একটি কৌতুকের কথা শুনেছিলুম। সে কাজ করে ভারত সরকারের দপ্তরে। তাদের নাকি দু রকমের সাহেব। এক দল সাহেব হয়েই জন্মায়, তারা প্রথম শ্রেণীর। আর এক দল প্রমোশন পেয়ে সাহেব হয়, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর সাহেবরা নাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহেবদের সাহেব বলেই স্বীকার করে না। প্রথম শ্রেণীর ছোকরারা দ্বিতীয় শ্রেণীর বুড়োদের সঙ্গে নাকি যথেচ্ছ ব্যবহার করে। শুধু অফিসে নয়, ক্লাবেও নাক সেঁটকায়। মেম সাহেবদের নাকই বেশি উঁচু।

সে বলেছিল, কৌতুকের শেষ এখানেই নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহেবরা কালক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পান, সে সরকারী

নিয়মের জোরে। তখনও তাঁদের পিঠে একটা ছাপ থাকে। নামের পরে একটা 'পি', পি মানে প্রমোটেড। ঐ চিহ্ন না থাকলে হয়তো একটা অবাঞ্ছিত লোক সভ্য সমাজে যথেচ্ছ বিহার করবে।

এ সব কথা শোনবার পর আমার দুঃখের কোন কারণ নেই। নিজের ভাগ্যকেও আমি ধিক্কার দিই না। আমাদের ঘৃণা করবার মতো লোক এ দেশে বেশি নেই। এই বিরাট দেশের দারিদ্র্য আজও ঘোচে নি। ক্ষুধায় অন্ন নেই, বস্ত্র নেই লজ্জা নিবারণের। আশ্রয়হীন মানুষ রোগে অনাহারে অত্যাচারে মরে যাচ্ছে। যারা বেঁচে থাকে, তারা শিক্ষা পায় না, খেটে খাবার সুযোগ পায় না। চুরি করে, ডাকাতি করে, খুন করে জেলে যায়। আমরা খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়ি, উপভোগ করি। অন্য দেশের কথা জানি না, নিজের দেশের এই দুর্দশায় কি কর্তাদের চোখে জল আসে না!

স্বাতির কথা আমার মনে পড়েছিল। দেশের কথা সে ভাবে না, সে ভাবে আমার কথা। আমি কোন সম্মানের কাজ করলে তার জীবনটা সুখের হত। সেদিন তার দুঃখ আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি নি। শীলার কাছ থেকে ফিরে এসে স্বাতিকে আমি শ্রদ্ধা করতে শিখলুম। সে আমাকে ঘৃণা করে না, অন্যের ঘৃণা দেখে সে দুঃখ পায়। সে আমার দারিদ্র্যকে ভয় পায় না, সে আমার সম্মানকে প্রিয় ভাবে। আমার মনে হল যে এত দিন অলস থেকে স্বাতির প্রতি আমি অন্যায় করেছি। সত্যিই আমার কিছু উন্নতির দরকার আছে।

এর পর আমি একটি মুহূর্তও নষ্ট করি নি। যে হাল্কা লেখায় হাত দিয়েছিলুম, তা সরিয়ে রাখলুম। ধুলোর ভিতর থেকে বার করলুম আমার গবেষণার কাগজ-পত্র। কিছু দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে থিসিসটা শেষ করে ফেললুম। যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে তা দাখিল করে দিয়েছি।

একটা ডক্টরেট পেলে আমার কেরাণীর চাকরিতে প্রমোশন

হবে না, কলেজের একটা মাস্টারি জুটবে। এখনও জুটতে পারে। কেন জানি না, এই ঘটনার পর দেশে বিদেশে কয়েকখানা দরখাস্তও করে দিয়েছি। এ সব কথা কাউকে বলি নি, মনোরঞ্জনকেও না। আমার মধ্যে তারা কোন চাঞ্চল্য দেখে না। আমাকে সুখী মানুষ বলেই তারা জানে।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পাঞ্জাব মেল ছুটছে সবেগে। গাড়ির ভিতর সবাই এখন ঘুমচ্ছে। আমি শুধু জানালার ধারে জেগে বসে আছি। আসানসোল থেকে গাড়ি এবারে বরাকর কুমারডুবির উপর দিয়ে যায় নি, মাইথনের আলো আমরা দেখতে পাই নি। শীলার সঙ্গে কি আর কখনও দেখা হবে? কে জানে!

১৬

জানালায় মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সহসা একটা কোলাহল শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ট্রেন এসে জসিডি স্টেশনে দাঁড়িয়েছে, আর একদল যাত্রী বোধহয় চেঁচিয়ে উঠেছিল : জয় বৈদ্যনাথজীকি জয়!

তারা এই স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল, না নামল এই গাড়ি থেকে, তা বুঝতে পারলুম না। কিংবা দূর পাল্লার ট্রেন দেখে হয়তো প্ল্যাটফর্ম থেকেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। গাড়ির জানালায় বসে তাদের দেখতে পাওয়া গেল না।

আমাদের গাড়িতে একজন ভদ্রলোক উঠলেন। প্রৌঢ় মানুষ, ধুতির উপরে খদ্দরের পাঞ্জাবী, কাঁধে একখানা চাদর। ফর্সা মুখে প্রসন্ন হাসি দেখে আমি তাঁকে বসবার জন্যে একটুখানি জায়গা ছেড়ে দিলুম। ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানিয়ে বসলেন।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। ঘড়িতে সময় দেখলুম, রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। তাই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা না করে আরও খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেবার জন্যে চোখ বন্ধ করলুম। কিন্তু সহসা আমার ঘুম এল না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর চোখে ঘুম তার নিজের ইচ্ছায় আসে, আসে না যাত্রীর সাধ্য সাধনায়। মনোরঞ্জন ঘুমচ্ছিল, তার নাক ডাকছিল। আরও অনেকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। যাঁরা হাত পা ছড়িয়ে শোবার জায়গা পেয়েছেন, তাঁদের ডাকলেও হয়তো সাড়া পাওয়া যাবে না। আমার মন যেন জসিডি স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মের ঐ যাত্রীদের সঙ্গে মিশে গেল।

কি গো, তোমরা বৈদ্যনাথ দর্শন করে ফিরলে, না সকাল হলে যাবে তাঁর দর্শনে?

কেউ আমাকে উত্তর দিল না। বোধহয় আমার প্রশ্ন তারা বুঝতে পারল না। আমার মন তাদের অপেক্ষায় না দাঁড়িয়ে অতীতে চলে গেল।

সে অনেকদিনের পুরনো কথা। শৈশবে আমি একবার বাবা মার সঙ্গে দেওঘরে এসেছিলুম। হাওয়া বদলের জন্য আমরা অনেকদিন ছিলুম সেখানে। এক একদিন সকালে বৈদ্যনাথ দর্শনে যেতুম। বাবা মা পূজো দিতেন, আমি থাকতুম সঙ্গে। দর্শনধারী পাণ্ডা তাঁদের পূজোর ব্যবস্থা করে দিতেন। কোনদিন সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে যেতুম আরতি দেখতে। প্যাঁড়া আর সর ভোগ দেওয়া হত। পরে আমরা প্রসাদ পেতুম। তার আস্বাদ যেন আজও আমার মুখে লেগে আছে।

দর্শনধারী পাণ্ডার কাছে আমি বৈদ্যনাথের গল্প শুনেছি। শিবপুরাণের সেই গল্প আমার আজও মনে আছে। ত্রেতাযুগে লঙ্কার রাজা রাবণ কৈলাসে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। শোনা যায় যে তিনি নাকি নিজের নটি মাথা কেটে শিবের পায়ে দিয়েছিলেন। শিব ভয় পেয়েছিলেন, ভক্ত হয়তো এর পরে শেষ মাথাটাও তাঁর পায়ে দেবে। তাড়াতাড়ি বললেন, বর নে।

রাবণ বললেন, আমি তো বর চাই নে, আমি তোমাকে চাই। তোমাকে আমি লঙ্কায় নিয়ে যাব।

শিবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ তৈরি আছে। তার একটি বার করে দিয়ে বললেন, এইটে নিয়ে যা, কিন্তু হুঁশিয়ার, পথে এটা মাটিতে নামাবি না। একবার নামালে আর তুলতে পারবি না।

রাবণ ভক্তি ভরে সেই শিবলিঙ্গ মাথায় নিয়ে লঙ্কায় চললেন।

দেবতারা দেখলেন বিপদ। শিব একবার লঙ্কায় গিয়ে কায়েম হলে লঙ্কাপুরী অজেয় হবে। দশানন রাবণ তখন তার বিশ হাতে সবার মাথা কাটবে। কিন্তু উপায়! বিষ্ণু বললেন, উপায় আছে। বরুণকে বললেন, তুমি রাবণের পেটে প্রবেশ কর।

যা বলা, তাই কাজ। রাবণ তখন হন হন করে দেওঘরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, বরুণের চাপে অস্থির হয়ে উঠলেন। কী করা যায়! দূর দিয়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডেকে বললেন, এই শিবলিঙ্গটা একটু ধরতো বাপু, আমি এখুনি আসছি।

ব্রাহ্মণ শিবলিঙ্গ হাতে নিয়ে বললেন, ও বাবা, এত ভারী! এ তো আমি বেশিক্ষণ ধরতে পারব না!

বেশিক্ষণ কেন ধরবে! আমি এখুনি ফিরে আসছি।

বলে রাবণ রাস্তার পাশেই বসে পড়লেন। •

বসলেন তো বসলেনই, উঠবার আর নাম নেই। কর্মনাশা নদী বয়ে গেল, তবু রাবণ উঠতে পারলেন না। পেট থেকে বরুণ যতক্ষণ নিঃশেষে না বেরচ্ছেন, ততক্ষণ শান্তি কোথায়! বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ বললেন, আর আমি পারছি না, এই রইল তোমার শিবলিঙ্গ।

বলে সেই জ্যোতির্লিঙ্গ মাটিতে নামিয়ে রাখলেন, বাস্, কার্য সিদ্ধি হয়ে গেছে। বরুণ বেরিয়ে গেলেন, ব্রাহ্মণও হলেন অন্তর্হিত। আর রাবণ! বেচারার দুর্দশার অন্ত নেই। শিবলিঙ্গ আর মাটি থেকে তুলতে পারলেন না। অনেক চেষ্টার পরে রাগ করে আঘাত করলেন। তাতে শিবলিঙ্গের খানিকটা ক্ষতি হল। এখন লক্ষ্য করলে এই আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। দর্শনধারী পাণ্ডা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি তাঁকে বলেছিলুম ঃ এই শিবলিঙ্গ আর কত ভারী হবে! ব্রাহ্মণ কি আর কিছুক্ষণ ধরে থাকতে পারতেন না!

এ কথার উত্তর দেবার সময় পাণ্ডা হেসেছিলেন, বলেছিলেন ঃ আমাদের শাস্ত্রে বলে, স্বয়ং নারায়ণ ব্রাহ্মণ সেজে এসেছিলেন ছলনা করতে। আবার অনেকে বলেন, ব্রাহ্মণ নয়, এক গোপের সঙ্গে রাবণের দেখা হয়েছিল, রাবণ শিবলিঙ্গ দিয়েছিলেন তারই হাতে।

শিবের নাম বৈদ্যনাথ কেন হল, সে কথা আছে শিবপুরাণের কোটি রুদ্র সংহিতায়। রাবণ তো তাঁর নয়টি মুণ্ড শিবের পায়ে

উৎসর্গ করেছিলেন, শিবের প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই মুণ্ডগুলি আবার জোড়া লেগেছিল। এ শুধু একজন অসাধারণ বৈদ্যের হাতেই সম্ভব। তাই রাবণেশ্বর শিবের নাম বৈদ্যনাথ।--

অমোঘয়া সুদৃষ্ট্যা বৈ বৈদ্যবদ্ যোজিতানি মে।
শিরাংসি সংঘয়িত্বা তু দৃষ্টানি পরমাত্মনা॥

সাধারণ লোকে কিন্তু অন্য কথা বলে। ত্রেতাযুগে তিনি রাবণেশ্বর শিব নামেই পরিচিত ছিলেন। রাবণই তাঁর মন্দির নির্মাণ করেন ও চন্দ্রকূপ কুণ্ড খনন করেন। তারপরে লোকে এসব ভুলে যায়। ঘন অরণ্যে পরিণত হয় এই স্থান। বৈজু নামে এক গোয়ালা এই অরণ্যে বাস করত। শিব তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, এখানে আমার পূজা করবার কেউ নেই, তুমি আমার নিত্য পূজা কর। প্রভাতে বৈজু শিবের অন্বেষণে বহির্গত হয়ে শিবলিঙ্গটি দেখতে পেল। জল ও বেলপাতা এনে করল শিবের পূজা। বৈজুর পূজার পরে রাবণেশ্বর শিব হলেন বৈজনাথ শিব, বৈজনাথ থেকেই বৈদ্যনাথ নাম।

এটি পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যের কাহিনী। হরিহর-সুত মুকুন্দ দ্বিজের বৈদ্যনাথ মঙ্গলেও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কাহিনী আছে। বৈজুর সম্বন্ধেও আর একটি প্রবাদ সমধিক প্রচলিত। সেটি আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংঘর্ষের কথা।

এখন যেখানে বৈদ্যনাথের মন্দির একদা সেই স্থান বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল, আর একদল অনার্য সাঁওতাল বাস করত সেখানে। সুখের মধ্যে একটি সুস্বাদু জলের সরোবর ছিল। এই সরোবরটি দেখেই একদল আর্য ব্রাহ্মণ এসে এখানে বসবাস শুরু করলেন। তাঁরা ছিলেন শিবের উপাসক, একটি মূর্তি স্থাপন করে শিবপূজা করতে লাগলেন। এরই নিকটে সাঁওতালদের তিনখণ্ড পাথর ছিল। তাদের পূর্বপুরুষেরা সেই পাথরের পূজা করেছিল বলে তারাও এসে পাথরের পূজা করে যেত।

আর্যরা চাষবাস শুরু করল, সরোবরের জল ক্ষেত্রে সেচন করে পেল প্রচুর শস্য। অনার্যরা শিকার করে মাছমাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। তারা সেই শস্য দেখে আশ্চর্য হল। ভাবল, শিবপূজার জন্যেই বোধহয় ব্রাহ্মণদের এই সম্পদ। তারাও শিবের ভক্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রার অনুকরণ করতে লাগল। আর্য সভ্যতার বিস্তার সর্বত্র এই ভাবেই হয়েছে। উন্নততর জীবনের আস্বাদ পেয়ে অনার্যরা আর্যদের আধিপত্য নিয়েছে মেনে।

তারপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা অলস ও বিলাসী হয়ে পড়লেন। শিবের পূজায় তাঁদের আগ্রহ আর রইল না, দেবতাকে তাঁরা অশ্রদ্ধা করতে লাগলেন। এবারে ব্রাহ্মণদের এই আচরণে অনার্যরা হল ক্ষুব্ধ, অদ্ভুত উপায়ে প্রতিবাদ জানাল বৈজু নামে এক অনার্য দলপতি। সে ভাবল যে শিবের অসম্মান করলে ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হবে। আর স্থির করল যে শিবের মাথায় একটি দণ্ডের আঘাত না করে সে কোন দিন জলস্পর্শ করবে না। কিন্তু প্রতিদিন এই কাজ করতে গিয়ে এক নতুন বিপদ উপস্থিত হল। নিরাহারী অবস্থায় শিবের দর্শন ও তাঁকে স্পর্শ করবার জন্য মন তার আকুল হয়ে উঠত। শেষে এইরকম অবস্থা হল যে প্রতিজ্ঞার চেয়ে মনের ব্যাকুলতা তার বড় হয়ে উঠল।

একদিন বনের ভিতর তার গরু হারিয়ে গিয়েছিল। সেই গরু খুঁজতে দিবা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলায় স্নান করে যেই খেতে বসেছে, অমনি তার শিবের কথা মনে পড়ল। শিবের দর্শন হয়নি, লাঠির আঘাত করা হয় নি তাঁর মাথায়। কাজেই বৈজু তখনি উঠে পড়ে শিবের মন্দিরে ছুটল।

শিব ভাবলেন, এই বৈজুই আমার যথার্থ ভক্ত। আমার কথা মনে হতেই তার ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমের কথা ভুল হয়ে যায়! বৈজুকে দেখা দিয়ে বললেন, বর নাও।

বৈজু বলল, আমার তো কোন প্রয়োজন নেই প্রভু। যদি কিছু দিতে চাও তো আমার নামেই যেন তোমার পরিচয় হয়।

শিব বললেন, তথাস্তু। আজ থেকে তোমার নাম হবে বৈজনাথ, আমাকে সবাই বৈদ্যনাথ বলে জানবে।

রাবণেশ্বর শিব এর পর থেকে বৈদ্যনাথ নামে বিখ্যাত হলেন।

রাবণের স্মৃতির সঙ্গে আরও কয়েকটি নাম এ অঞ্চলে জড়িয়ে আছে। পথের ধারে যেখানে তিনি প্রস্রাব করতে বসেছিলেন সেই স্থানের নাম ছিল হরীতকী বন। এখন বলে হরলাজুরি। এর উত্তরে কর্মনাশা নদী। এই স্থানটি দেওঘর থেকে চার পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্বে।

পদ্মপুরাণের বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যে রাবণের কথা আছে সবিস্তারে। বৈদ্যনাথমঙ্গলেও আছে সুন্দর বর্ণনা।—

শুন, রাম রঘুনাথ অপূর্ব কথন।
কৃপাসিন্ধু বৈদ্যনাথ হৈলা যে কারণ॥

বৈদ্যনাথের পূজা করতে এসে রাম এই শিব প্রতিষ্ঠার কথা শুনে গিয়েছিলেন। আমি এই গল্প নতুন করে শুনলুম রামচন্দ্রবাবুর কাছে। যে ভদ্রলোক জসিডিতে উঠে আমার পাশে বসেছিলেন, তাঁরই নাম রামচন্দ্র কনা। আমাকে উসখুস করতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ঘুম আসছে না বুঝি!

আমি তাঁর দিকে চেয়ে নীরবে এ কথা মেনে নিয়েছিলুম।

তিনি বললেন: কতদূর যাবেন?

আমি বললুম: কাশী। আপনি?

বিন্ধ্যাচল।

নিজের নামটিও তিনি বললেন। আমিও আমার নাম জানিয়ে বললুম: চমৎকার বাঙলা বলেন তো আপনি!

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন: সাঁওতাল পরগণার অনেকেই ভাল বাঙলা জানে। এক সময় তো বাঙলা দেশেই ছিল।

এই রামচন্দ্রবাবুর মুখেই আবার নতুন করে শুনলুম দেওঘরের কথা। তপোবন ত্রিকুট-পর্বতের কথা। বললেন ঃ এক সময় এখানে ধনী ও নির্ধন নির্বিচারে আসত নানা রোগ থেকে আরোগ্য হবার আশায়। শিবগঙ্গায় স্নান করে তারা বৈদ্যনাথের মন্দিরের বারান্দায় ধর্না দিত। তিনদিন তিনরাত্রি একেবারে অনাহারে। তারপর স্বপ্নাদেশ হত। রোগীর রোগ সারত, সন্তান আরোগ্য হত, এমনকি বন্ধ্যা নারীও মা হত। এখনও গরিবেরা আসে, কিন্তু ধনীরা বেশি আসে না। এযুগে মানুষের বিশ্বাস বদলে গেছে। অর্থ নিয়েছে দেবতার স্থান। অর্থ থাকলে নাকি সব আছে। অর্থ দিয়ে দেবতাকেও কেনা যায়। তবু—

তবু কী ?

এ প্রশ্নের উত্তর রামচন্দ্র বাবু চট করে দিলেন না। খানিকক্ষণ ভেবে বললেন ঃ তবু দেবতারা বেঁচে আছেন। ধনবান পুরুষেরা যখন যক্ষের সাধনায় উন্মত্ত, বাড়ির গৃহিণীরা তখন লুকিয়ে মানৎ করছে—স্বামীর মন যেন গৃহাভিমুখী হয়, পুত্রকন্যা যেন বকে না যায়, রাত্রে একটু নিদ্রা আর সংসারে একটু শান্তি। ভদ্রলোকের কথায় আমি হাসতে পারলুম না। এক নতুন ভাবনায় আমি বিব্রত হলুম। দেবতায় বিশ্বাস হারিয়েই কি আমরা সংসারে শান্তি হারিয়েছি!

মনোরঞ্জনের ঘুম তখন ভাঙে নি। সে হয়তো সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে। তারপরে জেগে উঠে বলবে, এতদিনের চেষ্টাতেও বৈদ্যনাথ দর্শন হল না।

ঘুমোবার আগেও সে এই কথাই বলেছিল। আমি বলেছিলুম ঃ বৈদ্যনাথ দর্শন আবার কঠিন কাজ নাকি!

সে বলেছিল ঃ কঠিন কাজ নয় বলেই তো আপশোস করছি। যাতায়াতের পথে এবারও জসিডিতে নামতে পারলুম না। এমন

গাড়িতে উঠি যে মাঝরাতে ঐ স্টেশন পেরিয়ে যাই। নামবার ইচ্ছা থাকলেও সে ক্ষমতা আর থাকে না।

বলেছিলুমঃ ফেরার সময় কথাটা মনে রেখ। এমন গাড়িতে উঠব যে দিনের আলোতেই জসিডি পৌঁছব। তখন আর তোমার আপশোস থাকবে না।

সহসা সে বলেছিলঃ তোমার কথা আলাদা। পথে ঘাটে তোমার ভাগ্যে এমন সব পণ্ডিত বন্ধু জোটে যে তাদের কাছে শুনেই তুমি মহাভারত লিখতে পার।

এ অভিযোগ আমি এর আগেও শুনেছি। শুনেছি দেশের বন্ধুদের কাছে। তাঁরা বই পড়েন, কিন্তু ভ্রমণ করেন না। ট্রেনের কামরায় বা দূর দেশের মোটর বাসে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়, আলাপ হয় স্টেশনের ওয়েটিং রূমে বসে, তাঁরা এমন কথা বলেন না। আমাকে তাঁরা আমার অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমি জানতে চাই তাঁদের অভিজ্ঞতার গল্প। জগতের বিরাট জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা একটা নিজস্ব ক্ষেত্রে মিলিত হই। পরস্পরের সুখদুঃখের কাহিনী শুনে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করি। দেশের প্রতিবেশীর সঙ্গে হয়তো দুবেলা দেখা হয়, কিন্তু অন্তরের ভাব বিনিময় হয় না। অন্তরঙ্গ না হলে আমরা অন্তরটা মেলে ধরি না। ঘরের বাহিরে আমরা একেবারে অন্যরকম মানুষ। একই নৌকায় পা দিয়েছি জানলে একমুহূর্তে একাত্ম হয়ে যাই। এ আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুতা।

আমার কোন উত্তর না পেয়ে মনোরঞ্জন বলেছিলঃ কেমন, ঠিক বলি নি!

আমি বলেছিলুমঃ আমার কেন, সকলের ভাগ্যেই জুটতে পারে।

মনোরঞ্জনের এখন ঘুম ভাঙলে দেখতে পেত যে আমি মিথ্যা বলি নি। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমি কখন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি তা

বুঝতেই পারি নি। আমাকে নীরব দেখে ভদ্রলোক বললেনঃ এখন একটু ঘুমিয়ে নিন, সকালে কথা হবে।

বললুমঃ সেই ভাল।

কিন্তু চোখে ঘুম এল না। শৈশবের অনেক অস্পষ্ট স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঠিক কোথায় কোন্ জায়গায় ছিলুম তা মনে পড়ল না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে মন্দির বেশি দূরে ছিল না। সকাল সন্ধ্যায় আমরা মন্দিরে যেতুম, কখনও পূজো দিতে, কখনও আরতি দেখতে, কখনও বা শুধু প্রণাম করতে। পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে দুটি বড় মন্দির—বৈদ্যনাথ ও জয়দুর্গার। তার চারিধার ঘিরে আরও দশটি ছোট ছোট মন্দির। সেসব মন্দিরে কোন্ কোন্ দেবতা আছেন, এখন আর তা মনে নেই। এসব মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য দেখি নি। কারুকার্যের জন্যে যে এ মন্দির বিখ্যাত নয় তা শুনেছিলুম, এ মন্দির প্রাচীন বলেই সমাদৃত। দর্শনধারী পাণ্ডা আমাকে রাবণের গল্প শুনিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন যে রাবণ এই মন্দির নির্মাণ করেছেন। কিন্তু গজানন পাণ্ডা বলেছিলেন, তা নয়। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গিধৌরের প্রথম রাজা পূরণমল এই মন্দির তৈরি করিয়েছেন। বৈদ্যনাথের মূল মন্দির বাহাত্তর ফুট উঁচু।

এই মন্দিরের কথা ভাবতে গেলেই আর একটি কথা আমার মনে পড়ে। বৈদ্যনাথ ও জয়দুর্গার মন্দিরের চূড়োয় নানা রঙের ধ্বজা নিশান, অসংখ্য কাপড় বা জরির সুতো দিয়ে দুটো মন্দিরের চূড়ো যুক্ত করা আছে। যাত্রীরা নাকি মানৎ করে এই ধ্বজা নিশান বাঁধে। স্বামী স্ত্রী গাঁটছড়া বেঁধে মন্দির প্রদক্ষিণ করে। ঢাক ঢোল বাজে। পাণ্ডারাই আয়োজন করে এই সবের। এখন আমি এ দেশের অনেক মন্দির দেখেছি। কিন্তু ধ্বজা নিশান বাঁধা এমন দুটি মন্দির আমি কোথাও দেখি নি।

পাণ্ডারা বলেন যে বৈদ্যনাথের মতো তীর্থ ভারতবর্ষে আর নেই

এক দিকে সতীর হৃদয় পীঠ অন্য দিকে শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ। দুটোর একটা পেলেই যে কোন স্থান মহাতীর্থ হতে পারে। কলকাতার কালীঘাট বা কামরূপের কামাখ্যা শুধু পীঠস্থান বলেই কতো মাহাত্ম্য। আবার সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ বা দক্ষিণের রামেশ্বর শুধু শিবের জন্যেই সারা বছর জমজমাট। বৈদ্যনাথ আমাদের বাড়ির কাছে বলে এসব কথা নাকি আমরা ভেবে দেখি না। অথচ বসন্ত পঞ্চমী শিবরাত্রি ও ভাদ্র পূর্ণিমায় এখানে লক্ষ লোকের সমাগম হয়। পায়ে হেঁটে কাঁধে করে তারা গঙ্গাজল আনে। আনে গঙ্গোত্রী ও মানস সরোবরের জলও।

গঙ্গাজল আনা আমি দেখেছি। গরিবেরাই কাঁধে করে এই জল আনে। বাঁশের বাঁকের দুধারে দুটো ঝুড়ি, নিচে তিনটি পায়া আছে। মাটিতে নামালে তা মাটি স্পর্শ করে না। রঙিন কাপড়ের টুকরোয় সাজানো সেই গঙ্গাজলের বাঁক নিয়ে একসঙ্গে অনেক যাত্রী আসে। তাদের দেখতে আমার ভারি ভালো লাগত। আমিও ভাবতুম যে শিবের মাথায় ঐ পবিত্র গঙ্গাজল চড়িয়ে তারা যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু কী চাইবে তারা! বড় লোক হতে চাইবে!

একদিন আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিলুম একজন যাত্রীকে। আমি বাঙলায় বলেছিলুম, কিন্তু সে উত্তর দিয়েছিল তার নিজের ভাষায়। বলেছিল, তোমার মতো একটি খোকা চাইব। সেদিন আমি এ কথা শুনে আশ্চর্য হই নি, কিন্তু আজ হই। আজও কি কেউ এই রকমের মনস্কামনা নিয়ে অত দূর দূর দেশ থেকে পায়ে হেঁটে গঙ্গাজল বয়ে আনে।

তারকেশ্বরের কথা আমার মনে পড়ল। সেখানে আজও এ নিয়ম আছে দেখেছি। সন্ধ্যারাতে গঙ্গাজল কাঁধে নিয়ে যাত্রীরা যাত্রা করে, আর ভোরবেলায় পৌঁছয় তারকেশ্বরে। রোগ-মুক্তির জন্যেই গরিবেরা মানৎ করে, কায়িক পরিশ্রম দিয়ে দণ্ড খেটে তারা দেবতার আশীর্বাদ চায়। বড়লোকের জন্য অন্য বিধান।

রোগমুক্তির জন্য তারা চিকিৎসা করে দেশে ও বিদেশে, মানৎ করে ঘটা করে পুজো দেবার। সেই পূজোর জাঁক-জমক দেখে সাধারণ যাত্রীরা বিস্ময়াপন্ন হয়। অর্থ দিয়ে কি ভক্তির শূন্যতা পূরণ হয়!

ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে। শিমুলতলা নামে একটা ছোট স্টেশনে এই ট্রেন দাঁড়ায় না। দিন কাল যখন ভাল ছিল, তখন বাঙালীরা হাওয়া বদলের জন্য এই পর্যন্ত আসত। মিহিজাম থেকে শিমুলতলা। মাঝখানে মধুপুর গিরিডি আর দেওঘর ছিল বেশি আকর্ষণীয়। ট্রেন এখন যেন উপর দিকে উঠছে। বোধহয় একটা পার্বত্য এলাকা। মনে হল যে নন্দন পাহাড়ের মতো কোন ছোট পাহাড় আমরা অতিক্রম করছি।

নন্দন পাহাড়ের কথায় আবার আমার দেওঘরের কথা মনে এল। এক একদিন বিকেলে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে জলসার নামে একটা সরোবরের ধার দিয়ে উইলিয়ামস্ টাউনে বেড়াতে যেতুম। এখানে তিনটি জলাশয় আছে পাশাপাশি—জলসার মানসর ও শিবগঙ্গা। তার মধ্যে শিবগঙ্গার জলই টলটলে। বাঁধানো ঘাট আছে। অগণিত যাত্রী দিবারাত্রি স্নান করছে। পাণ্ডারা বলেন যে এই শিবগঙ্গার ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন আকবর বাদশাহের সেনাপতি মানসিংহ। উড়িষ্যা যাবার পথে মানসিংহ বৈদ্যনাথ দর্শন করে যান। পশ্চিমের সরোবরটির নাম তাই মান সরোবর বা মানসর হয়েছে। জলসার তার পরে। দেওঘরের মূল শহর ক্যাস্টিয়ার্স টাউন থেকে উইলিয়ামস্ টাউনে যাবার পথ তারই প্রান্ত দিয়ে।

খান কয়েক পোড়ো বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ভয়ে আমার বুক দুরদুর করত। শুনেছিলুম যে ঐ সব পোড়ো বাড়িতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের তাই ফিরে আসতে হত। এই পথটাই ঘুরে নন্দন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বিদ্যাপীঠের মাঠে এসে পৌঁছত। নন্দন পাহাড় একটি টিলার মতো

ছোট পাহাড়, তার উপরে মন্দির ছিল একটি। বোধহয় শিব মন্দির, মন্দিরের দেবতার কথা এখন একেবারেই মনে পড়ছে না। আমি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যেতুম, আর নেমে আসতুম লাফিয়ে লাফিয়ে। যেদিন আমাকে উঠতে দিতে চাইতেন না, সেদিন মা আমাকে ভূতের কথা মনে করিয়ে দিতেন। বলতেন, অন্ধকার হলেই সেই পোড়ো বাড়ির ভূত বেরিয়ে পড়বে। ভয় পেয়ে আমি ফিরে আসতুম। আর বাবা মাকে বলতেন, ভয় দেখিও না। আর আমাকে বলতেন, রাম নাম করলে ভূত পালিয়ে যায়।

বিদ্যাপীঠের মাঠের কথাও আমার মনে পড়ছে। একটা মস্ত বড় মাঠের শেষে খানকয়েক বাড়ি। রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম আর ব্রহ্মচারী ছেলেদের স্কুল বলে জানতুম। যে ছেলেরা বড় হয়ে সাধু হবে ব্রহ্মচারী তাদের বলে—এই ধারণা ছিল। পরে শুনেছি যে ওটা আর পাঁচটা স্কুলের মতোই, কিন্তু সম্পর্ক তার কলকাতার সঙ্গে। সেই জন্যে নানা ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নাকি ছিল।

উইলিয়ামস্ টাউনের অনেকগুলো বাড়ির নাম আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মায়ালয় নামটা আমার আজও মনে আছে। পেয়ারা আর কুলের গাছ ছিল এই বাড়িটিতে।

এক একদিন আমরা উল্টোদিকে বম্পাস টাউনেও বেড়াতে যেতুম। কিন্তু বেশি যেতুম না সেদিকে। বাবা বলতেন, ওটা যক্ষ্মারোগীর পাড়া। সেদিকে বাড়ি ঘর বেশি, লোকজনও বেশি। কিন্তু সবাই এসেছে বাইরে থেকে স্বাস্থ্যান্বেষণে। আমরা বড় রাস্তার শেষে সূরজমল নাগরমলের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতুম।

সম্প্রতি শুনতে পাই যে দেবসঙ্ঘ নামে একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে। ঐ পথে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে সেই আশ্রম। মস্ত বড় মন্দির। ধর্মের আলোচনা হয় সেখানে। মনোরম পরিবেশে এই আশ্রমটি অনেকেরই ভাল লাগে।

দেওঘরে আরও একটি আশ্রম আছে। তার নাম বেশি

পরিচিত, প্রতিষ্ঠানও বড়। অনুকুল ঠাকুরের সৎ সঙ্ঘের নাম দেওঘরের বাইরের লোকেও জানে। শৈশবে আমি এই আশ্রমের নাম শুনি নি, শুনেছি পরিণত বয়সে। যাঁর কাছে এই আশ্রমের কথা শুনেছি তিনি বলেছিলেন যে ঠাকুরের বহু শিষ্য সেখানে পাকাপাকি ভাবে বাস করছেন। নানারকমের কাজ কর্ম হয় আশ্রমের ভিতরে। ভাল করে না দেখলে এই আশ্রমের ব্যাপার ঠিক অনুমান করা যায় না।

আমি তাঁকে বলেছিলুম ঃ অনুকুল ঠাকুরেব ধর্মমত সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ইতস্ততঃ করে ভদ্রলোক বলেছিলেন ঃ কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা না করাই উচিত। যা বুঝি না তা নিয়ে আলোচনা করলে অনধিকার চর্চা হবে।

তবু আমি মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বলেছিলেন ঃ তাঁর একজন প্রবীণ শিষ্য আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে তাঁরা নাকি উন্নততর সমাজ তৈরির চেষ্টা কবছেন, এবং সেটা নাকি—

ভদ্রলোক থামতেই আমি বলেছিলুম ঃ বলুন।

কাতর ভাবে তিনি বলেছিলেন ঃ আমাকে মাপ করুন, আমি হয়তো সঠিক বলতে পারব না।

যা শুনেছেন, তাই আপনি বলুন।

শুনেছি যে বাপ-মায়েরা চেষ্টা করলেই নাকি ভাল সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। ভাল সমাজ তারাই গড়তে পারবে।

তারপর ?

তারপর ভদ্রলোক বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা বলেছিলেন। তাঁর আশ্রমও দেওঘরে। দেবসঙ্ঘ আশ্রম থেকে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে যাবার একটা সংক্ষিপ্ত পথ আছে। শহর থেকে যে পথ হুম্‌কার দিকে গেছে, সেই পথের উপরে এই আশ্রম। ব্রহ্মচারী দেহরক্ষা করেছেন, তাঁর শিষ্যরা আছেন আশ্রমে। শান্ত সমাহিত

সুন্দর পরিবেশে এই আশ্রমটি বড় শান্তির স্থান। মন্দির ও প্রার্থনার স্থান আছে। সম্প্রতি নাকি একটি অপরূপ মন্দির নির্মিত হয়েছে, নওলাখা মন্দির নামে তা প্রসিদ্ধ। এই মন্দির নির্মাণের কাল আমার জানা নেই, শুনেছি খুব বেশি পুরনো নয়। কিন্তু শৈশবে আমি দেখেছিলুম বলে মনে পড়ছে না। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর এক শিষ্যা তাঁর আশ্রমের নিকটে এই মন্দিরটি নয় লাখ টাকায় তৈরি করে দিয়েছেন। বেলুড় মঠের মন্দির বা দিল্লীর বিড়লা মন্দিরের মতো এই মন্দিরও একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠেছে। মন্দিরের আকর্ষণই বড়, দেবতার মাহাত্ম্য নয়।

দেবতার আকর্ষণে মানুষ আরও খানিকটা পথ এগিয়ে যায়। সোজা পথ আরও খানিকটা এগিয়ে বাম হাতে দুম্‌কার দিকে গেছে, আর ডান দিকে কিছু এগিয়ে কুণ্ডেশ্বরী জগদ্ধাত্রীর মন্দির। বড় জাগ্রত দেবতা বলে অনেকেরই বিশ্বাস। কোন মানৎ করে নাকি ব্যর্থ হতে হয় না। যাঁরা আসতে পারেন না, তাঁরা দূর থেকে পূজার জন্য টাকা পাঠান। ডাকেই তাঁরা পূজার নির্মাল্য ও প্রসাদ পান। জগদ্ধাত্রীর মন্দিরের কাছে নবগ্রহের মন্দিরও আছে। এই জায়গার নাম কুণ্ড, জগদ্ধাত্রীর নাম তাই কুণ্ডেশ্বরী।

তপোবন পাহাড় দুম্‌কার পথে দেওঘর শহর থেকে প্রায় ছ মাইল দূরে। শীর্ণ একটা নদী পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। ঝিরঝিরে জল ও বালির উপর দিয়ে গাড়ি ঘোড়া আগে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যেত। এখন পুল তৈরি হয়েছে কিনা জানি না।

এই পথেই ত্রিকুট পাহাড়ে পৌঁছনো যায়। দেওঘর থেকে তার দূরত্ব দশ মাইল।

একটা ঝর্ণা ছিল এই পাহাড়ে। তার ধারে পিকনিক করতে আসত উৎসাহী স্বাস্থ্যান্বেষীরা। সকালে বেরিয়ে ফিরতে হত সন্ধ্যাবেলায়। গাড়ি ঘোড়ার সুবিধা ছিল না বলে ত্রিকুট পাহাড়ের চেয়ে তপোবন বেশি জনপ্রিয় ছিল।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী প্রথমে তাঁর আশ্রম এই তপোবন পাহাড়েই নির্মাণ করেছিলেন। পরে উঠে এসেছিলেন বর্তমান স্থানে। অনেকে বলেন যে আদি কবি বাল্মীকির আশ্রম ছিল তপোবন পাহাড়ে। একটি গুহায় তিনি তপস্যা করেছিলেন। এই কারণেই বোধহয় বালানন্দ ব্রহ্মচারী নিজের তপস্যার জন্য ঐ স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন।

বালানন্দ উজ্জয়িনীর মানুষ। জন্ম তাঁর ব্রাহ্মণকুলে, পূর্বনাম পীতাম্বর। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হয়েছিল, মাতা নর্মদা বাঈ তাঁকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু ঘরে বাঁধতে পারেন নি। উপনয়নের পর ন'দশ বৎসর বয়সেই তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। কেঁদে কেটে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মা প্রার্থনা জানিয়েছিলেন উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর শিবের কাছে যে তিনি যেন তাঁর হারানো ছেলের ভার নেন। শিব এ কথা শুনেছিলেন। বালানন্দের শেষ জীবন কেটেছে বৈদ্যনাথের ক্ষেত্রে, মাতা পুত্রের মিলন হয়েছিল এইখানে। মায়ের শেষদিন পর্যন্ত বালানন্দ সংসারীর মতো তাঁর সেবা করেছিলেন নিজের আশ্রমে।

মায়ের নাম নর্মদা, আর নর্মদার তীরে বালানন্দের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়েছে। নর্মদার তীরে গঙ্গানাথ আশ্রম, তারই অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা নিয়ে সেইখানেই বালানন্দ যোগ সাধনা করেছেন। আর একজনের কাছেও তিনি যোগাভ্যাস করেছেন, তাঁর নাম গৌরীশঙ্কর মহারাজ।

একবার তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে তিনি নর্মদার তীরেই ধরা পড়লেন এক ইংরেজ পুলিশ কমিশনারের হাতে। একটা চুরির তদন্ত হচ্ছিল। তাঁর হাতে একখানা কুঠার দেখে সাহেব তাঁকেই চোর বলে হাজতে পাঠাতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে কম্বল গাঁজা ও কিছু সেঁকো বিষও ছিল। বালানন্দ বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে কুঠারটা সিঁদ কাটবার জন্য নয়, কন্দমূল তোলবার জন্য আর মাদক দ্রব্য রেখেছেন শীতে শরীর গরম রাখবার জন্যে। সাহেব অবুঝ। শেষ

পর্যন্ত স্থির হল যে 'সাধু' যদি একসঙ্গে সমস্ত বিষটা খেতে পারেন তবেই ছাড়া পাবেন। বালানন্দ ভাবলেন যে জেলে জীবন কাটাবার চেয়ে বিষ খেয়ে মৃত্যু ভাল। তাই তা খেয়ে ফেললেন, বললেন যে মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ যেন নর্মদার জলে বিসর্জন দেওয়া হয়।

বিষের ক্রিয়ায় তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হল না। তিনি অনুভব করলেন যে নর্মদার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন যে ভয় নেই। বালানন্দ সুস্থ হয়ে উঠলেন, কিন্তু সাহেব পেলেন এক দুঃসংবাদ। তাঁর ছেলে শিকারে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে এশিয়াটিক কলেরায়।

আর একবার তিনি নর্মদার তীরেই চলতে চলতে দিনের শেষে এমন এক অরণ্যে এসে পৌছলেন যার কাছে কোন লোকালয় নেই, অন্ধকারে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পরিশ্রমে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। সহসা দূরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন, তার সঙ্গে একটি গরু। মেয়েটি তাঁকে দুধ খেতে দিল। তাঁর জীবন রক্ষা হল। কিন্তু তারপরেই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে কেউ কোথাও নেই।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী কামাখ্যায় গিয়েছিলেন, গিয়েছিলেন তারকেশ্বরে। সেখান থেকে এসেছিলেন দেওঘরে। শেষ জীবন তিনি এইখানেই অতিবাহিত করেন।

বালানন্দ তাঁর শিষ্যদের বলতেন যে চারটি পরীক্ষায় সবাইকে উত্তীর্ণ হতে হবে—ঘর্ষণ তাপন ছেদন ও তারণ। গুরু হলেন স্যাকরার মতো। সোনা হাতে পেলে স্যাকরা প্রথমে কষ্টি পাথরে ঘষে দেখে, তারপর আগুনের তাপে পুড়িয়ে খাঁটি থেকে মেকীকে ছেদন করে। সব শেষে খাঁটি সোনাকে ঠুকে পিটে অলঙ্কারে পরিণত করে। আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় এইরকমে। কঠিন নিগ্রহে গুরু শিষ্যের ভক্তি যাচাই করেন, তপস্যার আগুনে চিত্তশুদ্ধি হয়, ছিন্ন হয় মায়া, ভক্তি উত্তীর্ণ হয় আত্মচেতনায়।

বালানন্দ দেহরক্ষা করেছেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।

১৭

এ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। জেগে নেই, ঘুমিয়েও পড়িনি। একরকমের নির্জীব আচ্ছন্ন অবস্থায় চোখ বুজে চলেছি। চেষ্টা করলে হয়তো চোখ খুলতে পারব না, গাড়ির ভিতরের ঝকঝকে আলোয় চোখ তখনই বন্ধ হয়ে যাবে। যারা শোবার জায়গা পেয়ে ঘুমিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে তাদের নাকের ডাক গাড়ির চাকার শব্দকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। পাশের তন্দ্রাচ্ছন্ন যাত্রী চমকে উঠে আবার ঢুলতে শুরু করছে। তা দেখে উপভোগ করবার মতো যাত্রী গাড়ির ভিতরে এখন নেই। আমি নিজে কী করছি, তা বুঝতে পারছি না।

বৈদ্যনাথের চিন্তা শেষ হয়েও যেন হচ্ছে না। তিনখানা বড় বড় পাথরের কথা মনে পড়ছে। নিজের চোখে দেখেছি না কোনও বইএ পড়েছি, তাও এখন স্মরণ করতে পারছি না। মন্দিরের পশ্চিম দরজার কাছে একটি পাথরের চত্বরের উপরে তিনখণ্ড পাথরের একটি তোরণ যেন। দুজন মানুষের সমান উঁচু দুখানা পাথরের উপরে আর একখণ্ড পাথর চাপানো আছে। খুব ভারি পাথর, কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যের কোন চিহ্ন নেই। শুধু উপরের পাথরের দু-পাশে এক সময় হাতি বা কুমিরের মুখ খোদাই করা ছিল বলে মনে হয়।

এই পাথরগুলি এখানে কেমন করে এল, কেন সাজানো হল এমন করে, এ নিয়ে পণ্ডিতরা মাথা ঘামিয়েছিলেন। সন্দেহ করেছিলেন যে পুরাকালে এই অঞ্চলে একটা বৌদ্ধ বিহার ছিল। কিছু মূর্তি ও তার পাদমূলে শিলালিপি দেখেই তাঁরা এই সন্দেহ করেছিলেন। তাঁরা মনে করেন যে বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে হিন্দুরা এখানে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বৈদ্যনাথ ও পার্বতীর মন্দির তাদের অন্যতম। এই মন্দির দুটিই প্রাচীন বেশি। এই

হুটি মন্দির ঘিরে ছোট ছোট মন্দির আরও অনেকগুলি আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ সূর্য নারায়ণ:নীলকণ্ঠ মহাদেব অন্নপূর্ণা কালী আনন্দ-ভৈরব কালভৈরব দেবী সিংহবাহিনী সরস্বতী গঙ্গা ব্রহ্মা ও গণেশ হনুমান ও কুবের রামলক্ষ্মণের মন্দির। সূর্য মূর্তির পায়ের নিচে একটি পরিচিত বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত আছে—যে ধর্ম ইত্যাদি। এই রকমের মূর্তি আরও আছে। কাজেই এখানে একটি বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলে অনুমান করলে অন্যায় হবে না।

শৈশবে আমি যখন মন্দির দেখতে যেতুম, তখন আমি এ সব কথা জানতুম না। পরবর্তী কালে বই পড়ে এ সব কথা জেনেছি। কিন্তু জানবার পরে আর বৈদ্যনাথ দর্শনে যাইনি। গেলে আমি নতুন চোখ দিয়ে আবার সব দেখতুম। মন্দিরের চারিদিক ঘিরে যে সব মূর্তি আছে, ভালো করে তা দেখলে আমার চোখেও হয়তো কিছু ধরা পড়ত। পণ্ডিতদের কথা আমি নিজের কথা বলে চালাতে পারতুম।

কিন্তু তিনখণ্ড পাথর আর গোটাকয়েক মূর্তি দেখে একটা সংঘারামের অস্তিত্ব কল্পনা করলে হয়তো নিতান্ত অসঙ্গত হবে। আরও কিছু প্রমাণের জন্য বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে অন্বেষণ করা উচিত। পালি ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থে উত্তানিয় নামে একটি সংঘারামের উল্লেখ দেখা গেছে, কিন্তু এই সংঘারাম কোথায় ছিল তা সঠিক ভাবে জানা যায় নি। তবে নানা বিবরণ থেকে এর অবস্থান অনুমান করা সম্ভব হয়েছে। এক জায়গায় আমরা পাই যে রাজা পাটলিপুত্র থেকে তমলিত্ত জনপদে গিয়েছিলেন বিঞ্জবনের ভিতর দিয়ে, এতে তাঁর সময় লেগেছিল সাত দিন। পাটলিপুত্র আমরা জানি, বর্ত্তমান পাটনার নামই পাটলিপুত্র। তমলিত্তও আমাদের জানা নাম। বর্ত্তমান তমলুক তাম্রলিপ্ত নামে পরিচিত ছিল, তাম্রলিপ্তেরই প্রাকৃত রূপ তমলিত্ত। বিঞ্জবনও বুঝতে পারি, তা বিন্ধ্যবন, বিন্ধ্যের প্রাকৃত রূপ বিঞ্জ। কিন্তু পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্ত যাবার পথে বিন্ধ্যবন

কোথায় ছিল তা বোঝা যায় না। তবে এই বিন্ধ্যবনেই যে উত্তানিয় সংঘারাম ছিল তা জানা যায় আর একটি কথায়।—উত্তর ষাট হাজার শ্রমণ নিয়ে বিঞ্জবনের অন্তর্গত উত্তানিয় মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ কথাও আছে যে নানাদেশ থেকে শ্রমণেরা বিঞ্জ সংঘারামে আসতেন। সঙ্গত কারণেই মনে হয় না যে এই বিঞ্জবন বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে ছিল।

যথাযথ অনুসন্ধান করলে পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত একটি প্রাচীন পথের নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। পাটনা থেকে বিহারের উপর দিয়ে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত পথ আছে, সেখান থেকে ভাগলপুর, তারপর মন্দার সিউড়ির উপর দিয়ে বাঁকুড়া, বাঁকুড়া থেকে তমলুক। পুরাকালের এই পথের কথা চিন্তা করলে সাঁওতাল পরগণার অধিত্যকা অঞ্চলকেই বিন্ধ্যবন বলে মেনে নিতে হয়। তার উপরে বৌদ্ধ নিদর্শন আছে বৈদ্যনাথে। মাটির উপরে যা আছে, তাই আমরা পেয়েছি। যা আছে মাটির নিচে, তার খবর আমরা রাখি না। দেওঘরের মাটির নিচে নালন্দার মতো বিরাট কিছু লুকনো আছে কিনা কে জানে। সে যুগের উত্তানিয় সংঘারাম যে এইখানে ছিল পণ্ডিতরা তা অনুমান করেছেন। যেখানে ষাট হাজার শ্রমণ এসে থাকতে পারত, তা কত বিরাট, সহজেই তা অনুমান করা চলে। নালন্দার চেয়েও বড় কিনা তাই বা কে বলতে পারে!

এ কথাও মনে হয় যে তা সম্ভব নয়। নালন্দার চেয়ে বড় হলে উত্তানিয় নাম আমাদের পরিচিত হত। হিউএন চাঙ ও ফা হিয়েন তার বিবরণ লিখে যেতেন আমাদের জন্যে। উত্তানিয় একটা বড় সংঘারাম হতে পারে, কিন্তু নালন্দার মতো বিরাট নিশ্চয়ই নয়।

নালন্দার কথায় আমার বিক্রমশিলার কথা মনে এল। বিক্রমশিলা একটি মহাবিহার নামে সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু আমি একখানি গ্রন্থে একটি নূতন কথা পড়েছিলুম। বিক্রমশীল বা বিক্রমশিলা পালরাজাদের সময় মগধের অন্যতর রাজধানী ছিল।

বক্তিয়ারপুর জংসন স্টেশন থেকে বিহার শরিফের উপর দিয়ে রাজগিরে যাবার পথে ছোট একটি স্টেশনের নাম শিলাও। এই স্থানেই ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী, বৌদ্ধ সংঘারামও ছিল এইখানে। লোকে তখন এই নগরকেই বিক্রমশিলা বলত।

রাজগিরে যাবার পথে আমি এই স্টেশনটি দেখেছিলুম। খুবই নগণ্য জায়গা। প্রাচীনকালের কোন নিদর্শনও নেই। তবু এই জায়গাটি যাত্রীদের কাছে খুব প্রিয়, ভাল খাজা পাওয়া যায় এই-খানে। দিল্লী এক্সপ্রেসে কলকাতা থেকে বেরলে ভোরবেলায় বক্তিয়ারপুরে নামতে হয়, তারপরে রাজগিরের গাড়ি। সুন্দর সকালে শিলাওএর খাজা আরও সুস্বাদু মনে হয়।

কিন্তু এই বিক্রমশিলায় যে মহাবিহার ছিল না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নালন্দার এত কাছে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। তবে নালন্দা সে সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে অন্য কথা।

আমি শুনেছিলুম যে অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে রাজা ধর্মপাল এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর তার চারশো বছর পরে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজী এটি ধ্বংস করেন। সাধারণ প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য আদিশূর পাঁচজন পণ্ডিত এনেছিলেন কনৌজ থেকে, পাঁচটি চতুষ্পাঠী খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর পর ধর্মপাল নিয়োগ করলেন বৌদ্ধ শ্রমণ, গৌড় ও মগধের নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হল। নালন্দা ছিল গৌড় থেকে দূরে, তাই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বিক্রমশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন।

এ কথা যদি সত্য হয় তো বিক্রমশিলা নালন্দার নিকটে ছিল না, ছিল গৌড়ের নিকটে। বর্তমান বিহারের ভাগলপুর জেলার চম্পক নগরের নিকটে গঙ্গার তীরে এই মহাবিহারটি নির্মিত হয়েছিল বলে সাধারণের ধারণা। কোন বৌদ্ধগ্রন্থে পড়েছিলুম যে বিক্রম নামে

এক যক্ষ একটি শিলাস্তূপের উপবে বাস কবত। তার মৃত্যুর পরে সেই স্থানটি বিক্রমশিলা নামে পরিচিত হয়। তিব্বতীদের বিশ্বাস যে তান্ত্রিক আচার্য কাম্পিল্যের এই স্থানটি খুব পছন্দ হয়। তিনি এখানে একটি বিহার নির্মাণের জন্য রাজার সাহায্য চান। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মারা যান। পরবর্তী জন্মে কাম্পিল্যই জন্মেছিলেন গৌড়ের রাজা হয়ে, তাঁরই নাম ধর্মপাল। তান্ত্রিক কাম্পিল্য যা পারেন নি, রাজা ধর্মপাল তা পেরেছিলেন। বিক্রমশিলা মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন গৌড়ের রাজা ধর্মপাল।

বক্তিয়ার খিলজী এই প্রতিষ্ঠানটি এমন ভাবে ধ্বংস করেছিলেন যে শুধু এর অবস্থান নয় পরিচালনার ব্যাপারেও কিছু জানা সম্ভব নয়। বাহিরে প্রচারিত কিছু প্রাচীন পুঁথি থেকে যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা নিতান্তই নগণ্য। গৌড়ের রাজা ও তাঁর সামন্তরা এই প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যয় বহন করতেন। ছাত্রদের কাছ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করা হত না। শুধু বাসস্থান ও আহারের জন্য নয়, পুস্তক ও বস্ত্রাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যও ছাত্রদের কোন ব্যয় করতে হত না। একবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পেলে কর্তৃপক্ষই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

এই নিয়ম থেকেই বোঝা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। জ্যোতিষ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রের বিদ্যাভবন ছিল ছয়টি, এবং এই সব বিদ্যাভবনে প্রবেশের জন্য দ্বারও ছিল ছয়টি। প্রত্যেকটি দ্বারে এক একজন বিখ্যাত ব্যক্তি দ্বারপণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রবিচারে এঁদের সন্তুষ্ট করতে পারলেই ছাত্রেরা প্রবেশের অনুমতি পেত। লামা তারানাথ তাঁর বিবরণে এই সব দ্বারপণ্ডিতের নাম লিখেছেন—রত্নাকর শান্তি ভগীশ্বরকীর্তি নারোপা প্রজ্ঞাকরমতি রত্নবজ্র ও জ্ঞানশ্রী মিশ্র। ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য আরও দুজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। এই আটজনকে বিক্রমশিলার আটটি স্তম্ভ বলা হত।

আরও কিছু টুকরো খবর সংগ্রহ করতে পারা গেছে। দ্বার-পণ্ডিতেরা ছিলেন বর্তমান কালের অধ্যক্ষের মতো। এক একটি বিদ্যাভবন তাঁদের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং একশো আটজন করে আচার্য তাঁদের সাহায্য করতেন। প্রাচীরবেষ্টিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর কয়েকশো পণ্ডিত ছিলেন ও কয়েক হাজার ছাত্র পড়াশুনো করত। ধর্মসভা প্রভৃতি বিশেষ অধিবেশনে আট হাজার ছাত্র মিলিত হত একটি মুক্ত অঙ্গনে।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একটি গ্রন্থে আমরা এমনি একটি ধর্মসভার বিবরণ পাই। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্য তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভ একটি প্রতিনিধি দল বিক্রমশিলায় পাঠিয়েছিলেন। অতীশ পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের লোক, বিক্রমণীপুররাজ কল্যাণশ্রী তাঁর পিতা। প্রথমে মায়ের কাছে ও পরে ভারতের নানাস্থানে সিংহল ও সুবর্ণদ্বীপে বিদ্যার্জন করে বিক্রমশিলায় অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রতিনিধিদের একজন একটি ধর্মসভার কথা লিখে রেখে গেছেন।

সেই সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন লামা বিদ্যাকোকিলা। পুরোভাগে আর একজন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত তিনি, নাম নরোপন্থ। এঁরা দুজনেই ছিলেন অতীশের গুরু। বিক্রমশিলার রাজাও এই সভায় এসেছিলেন। সকলের শেষে এসেছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। তাঁকে দেখে সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেন নি, বিক্রমশিলা ছেড়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। তাঁরই আগমনে তিব্বত তার আদিম ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। তিব্বতেই তিনি দেহরক্ষা করেন। আজও অতীশ সমগ্র তিব্বতে বুদ্ধের অবতাররূপে পূজিত, লাসার নিকট তাঁর সমাধিস্থল পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে।

বসে বসেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। যখন ঘুম ভাঙল তখনও সকাল হয় নি। বাহিরে ঘন অন্ধকার তখনও জমাট বেঁধে আছে। রামচন্দ্রবাবু জেগে ছিলেন। আমাকে চোখ খুলতে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন: ঘুম হল?

হয়তো অল্পক্ষণই ঘুমিয়েছি, কিন্তু তাতেও আরাম পেয়েছি অপর্যাপ্ত। বললুম: হ্যাঁ।

আমি যে বিক্রমশিলার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, সে কথা আমার মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি তো এ অঞ্চলের মানুষ। বিক্রমশিলা দেখেছেন নিশ্চয়ই!

ভদ্রলোক বললেন: দেখিনি, কেননা দেখবার মতো কিছু নেই বলেই শুনেছি।

কোন প্রশ্ন না করে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন: বিক্রমশিলা ছিল গঙ্গার ধারে, প্রায় সবটাই গঙ্গার জলে চলে গেছে। শুধু নাকি একটুখানি জেগে আছে পাহাড়ের মতো।

এর পরে ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কত দূর এসেছি আমরা?

রামচন্দ্রবাবু বললেন: ঝাঝা কিউল ও মোকামা ছাড়িয়ে এসেছি।

তারপর বললেন: বিক্রমশিলা দেখবার ইচ্ছা থাকলে ফেরার পথে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে চাপবেন। দিল্লী থেকে এলাহাবাদের উপর দিয়ে বেনারসে আসে, তারপর কিউল থেকে ঘুরে জামালপুর ভাগলপুর সাহেবগঞ্জ হয়ে কলকাতায় যায়। ইচ্ছে হলে জায়গাটা দেখে নিতে পারেন।

আমি বললুম: আপনি তো বললেন যে দেখবার আজকাল কিছুই নেই।

তা ঠিক। সেই হিসেবে ভাগলপুর আর মুঙ্গেরে কিছু প্রাচীন

দ্রষ্টব্য স্থান আছে। এই সব স্থান ছিল মহাভারতের অঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত। অঙ্গের রাজধানী চম্পা ভাগলপুরের নিকটে। মুঙ্গের দুর্গের ভিতর কর্ণচৌরা নামে একটা জায়গা আছে। লোকে একটা খুব প্রাচীন গাছ দেখিয়ে বলে যে মহারাজ কর্ণ সেইখানে বসে প্রজাদের সোনা বিলোতেন। মুঙ্গেরে যান নি ?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম ঃ না।

ভদ্রলোক বললেন ঃ তবে এসব জায়গা একবার দেখে নেবেন। কষ্টহারিণী ঘাটে স্নান করে মুঙ্গের দুর্গ দেখবেন। এখন সব গভর্নমেণ্টের অফিস হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন জিনিস অনেক দেখতে পাবেন। তারপর পীর পাহাড়, গরম জলের সীতাকুণ্ড, হৃষীকেশ। কত রকমের জিনিস তৈরী হচ্ছে—বন্দুক সিন্ধুক সোনা রূপো লোহার জিনিস। ভাগলপুরের তসর আর এণ্ডির কথা তো জানেনই। সুলতানগঞ্জে গঙ্গার মধ্যে একটি পাহাড়ের উপর আজগৈবিনাথের মন্দির দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। গৌহাটিতে উমানন্দ ভৈরব দেখেছেন ?

বললুম ঃ না।

ভদ্রলোক বললেন ঃ কামাখ্যা দেবীর ভৈরব উমানন্দ ব্রহ্মপুত্র নদীর মাঝখানে। আজগৈবিনাথও ঐ রকম। তারপরে রাজমহল ও মন্দার হিল দেখুন। পুরাণে সমুদ্র-মন্থনের কথা পড়েছেন তো! এই মন্দার পর্বতকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে মন্থনদণ্ড করা হয়েছিল।

অঙ্গরাজ্যের কথায় আমার মন চলে গিয়েছিল অতীতের দিকে। এই নামটি আমার কাছে অতি পরিচিত। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থানে এই নাম দেখেছি। ঋগ্বেদে অঙ্গের উল্লেখ নেই, কিন্তু অথর্ব বেদে আছে। অঙ্গবাসীদের অথর্ব বেদে ব্রাত্যজাতি বলা হয়েছে। গঙ্গা ও শোণ নদের অববাহিকায় ছিল তাদের বসতি।

অঙ্গ নাম কেন হল তা নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। মহাভারতে দেখি যে অঙ্গ নামে এক রাজার নামেই রাজ্যের নাম অঙ্গ হয়েছে। কিন্তু রামায়ণে আছে অন্য কথা। শিবের শাপে মদন এইখানেই ভস্ম হয়েছিলেন, তাঁরই অঙ্গ হারানোর জন্যই দেশের নাম অঙ্গ হয়েছে। রাজা দশরথের বন্ধু লোমপাদ এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। দেশের অনাবৃষ্টি দূর করবার জন্য তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে এনেছিলেন যজ্ঞের জন্য। তারপর নিজের কন্যা শান্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন।

মহাভারতে আমরা ঊর্ধ্বরেতা বলিরাজার কথা পাই। অন্ধমুনি দীর্ঘতমার সেবা করে তাঁর মহিষী সুদেষ্ণা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্রের জননী হয়েছিলেন। অঙ্গ হয়েছিলেন অঙ্গের রাজা। আধুনিক নৃতাত্ত্বিকেরা নাকি অঙ্গ ও কলিঙ্গবাসীদের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ছিলেন অঙ্গের রাজা। কর্ণ সূতপুত্র বলে অর্জুন তাঁর সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষায় অসম্মত হয়েছিলেন। দুর্যোধন তখনই তাঁকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করে রাজসম্মান দেন। আজীবন কর্ণ এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং দুর্যোধনের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে।

স্মৃতিশাস্ত্রে অঙ্গরাজ্য নিন্দিত, তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কাজে সেখানে গেলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। কিন্তু তান্ত্রিকরা এ বিধান মানেন নি, তাঁরা বলেছেন যে 'তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দূষ্যতে' অঙ্গদেশ যাত্রায় কোন দোষ নাই।

এই তন্ত্রশাস্ত্রেই আমরা অঙ্গদেশের সীমানা পাই।—

বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।

বৈদ্যনাথ থেকে আরম্ভ করে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত ছিল অঙ্গদেশ। বর্তমান বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা এই অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তার রাজধানী ছিল চম্পায়। চম্পার আরও কয়েকটি

নাম পাওয়া যায়—লোমপাদপুর কর্ণপুর মালিনী চম্পাপুরী বা চম্পানগরী। অনেক জায়গায় এই রাজ্যকেও চম্পা বলা হয়েছে। ভাগলপুরের নিকটে ছিল এই চম্পাপুরী। চীনা পরিব্রাজক হিউএন চাঙ এই নগরের একটি সুন্দর বিবরণ লিখে গেছেন। তিনি বলেছেন যে চেন-পো নগরে অনেক প্রাচীন সংঘারাম ছিল, সেগুলি তিনি জীর্ণ অবস্থায় দেখেছেন। বুদ্ধ ও মহাবীরের জীবনের স্মৃতিমণ্ডিত বলে চম্পা ছিল বৌদ্ধ ও জৈন দুই সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান।

আর একটি প্রাচীন নাম হিরণ্য প্রভাত। এটি একটি নগরের নাম। হিউএন চাঙ বলেছেন যে এই নগরের নিকটে ছিল হিরণ্য নামে এক পর্বত, সেই পর্বতের চূড়া থেকে বাষ্প ও ধোঁয়া বেরিয়ে সূর্য ও চন্দ্রকেও আচ্ছন্ন করে ফেলত। কানিংহাম সাহেব বলেছেন যে এই হিরণ্য প্রভাত মুঙ্গের শহরের প্রাচীন নাম। মুঙ্গেরে এখনও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তার নাম সীতাকুণ্ড। পুরাকালে হয়তো সেখান থেকেই বাষ্প ও ধোঁয়া বাহির হত।

মোদাগিরি নামে আর একটি নাম আমরা মহাভারতে পাই। অনেকে মনে করেন যে মুঙ্গেরকেই সে যুগে মোদাগিরি বলত।

রামচন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবারে আস্তে আস্তে বললেন: সব জায়গায় নামতে আপনাকে বলি না, নামবেন জামালপুরে। রেলের কারখানা দেখে সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সিতে কিংবা বাসে চলে যাবেন মুঙ্গের। মাইল সাতেক পথ, ট্রেনেও যাওয়া যায়। প্রতি ঘণ্টায় বাস আছে বলে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। মুঙ্গেরের দুর্গে প্রবেশ করলে অনেক পুরনো কথা আপনার জানা হয়ে যাবে—শুধু হিন্দুযুগের কথা নয়, মুসলমান ও ইংরেজ আমলের কথাও।

ভদ্রলোকের কথা আমাকে নীরবে মেনে নিতে হল।

১৮

মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য হলুম। সুখী লোক। পরম নিশ্চিন্তে সে ঘুমচ্ছে। বাঙ্কের উপরে শুয়ে আরও অনেকে তারই মতো আরামে ঘুমচ্ছে। বেঞ্চে কাৎ হয়ে বলেও ঘুমচ্ছে অনেকে। কার নাক ডাকছে আর কার ডাকছে না, গাড়ির চাকার শব্দে তা ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

আমরা একটা আলোকিত স্টেশন পার হচ্ছিলুম। মনে হল যে গাড়ির গতি যেন সহসা বেড়ে গেল। রামচন্দ্রবাবু সোজা হয়ে বসে বাহিরের দিকে চাইলেন। ভাল করে নজর দিয়ে দেখে বললেন ঃ আমরা বক্তিয়ারপুর পেরলাম না!

আমি বললুম ঃ বক্তিয়ারপুরে তো সব গাড়ি দাঁড়ায়!

রামচন্দ্রবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ জংসন স্টেশন, বড় লাইনের জংসন। সব গাড়িই তো দাঁড়াবার কথা।

অনেকদিন আগের কথা আমার মনে পড়ল। কয়েকজন বন্ধুতে মিলে আমরা রাজগিরে এসেছিলুম। তখন এই স্টেশনে নেমে ন্যারো গেজের ট্রেন ধরতে হত। পাটনা পৌঁছবার আগেই বক্তিয়ারপুর। দিল্লী এক্সপ্রেস আসত ভোর বেলায়। বড় লাইনের বড় গাড়ি থেকে নেমে সরু লাইনের খেলনার মত গাড়ি। সময় মতো গাড়ি ছাড়ে না, কর্মীদের মধ্যে মহা অসন্তোষ। যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এই রেল পরিচালনা করত, তারা সময় মতো মাইনে দিত না, দিতে পারত না। নানা অসুবিধার জন্য জনসাধারণ মোটর বাসে যেত। ভাল রাস্তা ও যানবাহনের সুব্যবস্থা আছে বলে যাত্রীরা মোটরেই বেশি যাতায়াত করত। শুধু মাল বহনের জন্য ট্রেন, আর কিছু যাত্রী আমাদের মতো। তখনই শুনেছিলুম যে বেশিদিন

এ রেল চলবে না, বড় লাইন বসবে, তখন আর কোন কষ্ট থাকবে না।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে রামচন্দ্রবাবু বললেন: পাঞ্জাব মেল বোধহয় দাঁড়ায় না। রাত দুপুরে কে নামবে এখানে!

আমি বললুম না যে এখন রাত দুপুর নয়, রাত ফুরিয়ে এসেছে। রাত দুপুরে তিনি নিজে এই গাড়িতে চেপেছেন। রেলে যারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, তাদের কাছে দুপুর আর রাত দুপুরে কোন তফাৎ নেই।

তবু আমি আর একটুখানি ঘুমিয়ে নেবার জন্য চোখ বুজলুম।

গাড়ির ভিতরে প্রখর আলো জ্বলছে। এই আলোয় আমার ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা।—

সেবারে আমাদের দুদিন মাত্র ছুটি ছিল। রবিবারের পর সোমবার সরস্বতী পূজো। রবিবার আমরা রাজগির দেখব, আর সোমবার নালন্দা। সময় পেলে পাওয়াপুরী দেখে বক্তিয়ারপুরে সন্ধ্যার ট্রেন ধরব। মঙ্গলবার সকালে অফিস আছে।

বক্তিয়ারপুরে দিল্লী এক্সপ্রেস থেকে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে সবাই বসেছিলুম। এক সময় আমাদের ট্রেন ছাড়ল। দেশলায়ের বাক্সের মতো ছোট কামরায় বসে মনে হল, এ এক নূতন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। জানালা দিয়ে বাতাস আসে, সেই বাতাসে ভ্রমণবিলাসী মন অসুবিধার কথা ভুলে যায়। বিহার-শরিফে আমরা নামব না, নালন্দাতেও না, আমরা সোজা রাজগির যাব। ফেরার পথে নালন্দা দেখব, সময় থাকলে বিহার। বিহার এ লাইনের সব চেয়ে বড় শহর, কিন্তু আমাদের মতো যাত্রীর কাছে তার আকর্ষণ সামান্য। জৈনেরা তীর্থ করতে আসে, পাওয়াপুরীর বাস ছাড়ে বিহার থেকেই।

বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগিরের দূরত্ব মাত্র তেত্রিশ মাইল। ছোট লাইনের ট্রেনে গড়িয়ে গড়িয়ে যেতেও আড়াই ঘণ্টার বেশি সময়

লাগে না। নালন্দায় আমরা নামলুম না, পরের স্টেশন সিলাও-এর খাজা খেয়ে রাজগিরে এসে নামলুম। এইখানেই এ লাইনের শেষ।

আমরা স্টেশনের নিকটে একটা হোটেলে উঠেছিলুম। বড় দীন দরিদ্র অবস্থা, কিন্তু যত্নের ত্রুটি ছিল না। স্নান সেরে খেয়ে নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম।

এইখানেই জানতে পারলুম যে গিরিব্রজ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মার চতুর্থ পুত্র বসু। রামায়ণের আদি কাণ্ডে আছে যে বিশ্বামিত্র যখন রাম লক্ষ্মণকে মিথিলায় নিয়ে যাচ্ছেন, তখন এই কথা তিনি তাঁদের বলেছিলেন। বসুর নামে এই নগরীর অপব নাম ছিল বসুমতী, আর পাঁচটি পর্বতের মাঝখান দিয়ে সুমাগধী নদী প্রবাহিত হত।

মহাভারতেব সভা পর্বেও গিরিব্রজের উল্লেখ আছে, বন পর্বে আছে রাজগৃহ নাম। অনেকে তাই মনে করেন যে এ দুটি এক জায়গা নয়। হিউএন চাঙ এর একটা সদুত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে পর্বতবেষ্টিত নগরীব নাম গিরিব্রজ, আব তার উত্তরের নূতন নগরের নাম রাজগৃহ।

মহাভারতে গিরিব্রজের আরও নাম আছে। রাজা বৃহদ্রথের নামে বৃহদ্রথপুর এবং তাঁরই উত্তর-পুরুষ কুশাগ্রের নামে কুশাগ্রপুর। হিউএন চাঙ এই নগরের চারি দিকে এক রকমেব সুগন্ধ ঘাস দেখতে পেয়ে বলেছিলেন যে এই ঘাস থেকেই কুশাগ্রপুর নাম হয়েছে। এখনও এই অঞ্চল থেকে ঘাস সংগ্রহ হয়।

প্রথমে আমরা বাজারের দিকে গিয়ে একখানা এক্কা গাড়ি সংগ্রহ করলুম। সেই এক্কাওয়ালাই আমাদের গাইড হবে। চুক্তি হল যে সব কিছু যত্ন করে দেখিয়ে সন্ধ্যার আগেই সে আমাদের হোটেলে ফিরিয়ে আনবে।

রাজগিরে প্রধান রাস্তা একটিই। উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে

দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। রেলের স্টেশন ছাড়িয়ে খানিকটা এগোতেই বাঁ হাতে একটা সুন্দর মন্দির দেখতে পেলুম। একেবারে রাস্তার ধারে নয়, অল্প উঁচুতে। এক্কাওয়ালা বলল ঃ এটি বার্মিজ মন্দির। বছর পঁয়ত্রিশ আগে ব্রহ্মদেশের একজন বৌদ্ধ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন।

এক্কাওয়ালা রাস্তার ধারে এক্কা দাঁড় করিয়ে বলল ঃ ডান দিকে দেখুন।

ডান দিকে অজাতশত্রুর রাজধানী দেখলুম নব রাজগৃহ, অজাতশত্রুগড়। একটা ফলকে ইংরেজীতে পরিচয় লেখা আছে। এই মাটি ও পাথরের তিন মাইল দীর্ঘ বিরাট প্রাচীর খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বিম্বিসার কিংবা অজাতশত্রু কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

এর পর রাস্তা নিচু হয়ে নেমে গেছে, তার পর একটা পুল পেরিয়ে আবার উপরে উঠেছে। ডান হাতে যে সরু রাস্তাটা বেরিয়েছে, এক্কাওয়ালা বলল যে তারই উপর ইনস্পেকশন বাংলো ও রেস্ট হাউস। থাকার ব্যবস্থা সেখানে ভাল।

একটুখানি এগিয়ে বাঁ হাতে একটা সুন্দর মন্দির দেখলুম। সেটি জাপানী মন্দির।

মন্দিরটি ঢালু জায়গায়, তার সামনে উঁচুতে যে ধ্বংস স্তূপ তারই নাম অজাতশত্রু স্তূপ। সরকারী ফলকে এর পরিচয় লেখা আছে। পাথরের স্তম্ভগুলি আমরা ভাল করে দেখলুম। মার্বল পাথরের মতো সাদা নয়, একটু নীলাভ। এই পাথরের নাম নাকি ডলোমাইট।

আরও একটু এগিয়ে যে বিরাট বটগাছ দেখলুম, তার নাম ধুনীবট। এক্কাওয়ালা বলল ঃ পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখুন। ইনস্পেকশন বাংলোর সামনে যে জায়গা দেখছেন, তার নাম বেণুবন।

আমরা পাহাড়ের সন্নিকটে আসছি। এটি বিপুল পাহাড়, নাম বিপুল। এরই পাদদেশে মখদুম কুণ্ড। উপরে যে গুহা আছে,

তার নাম দেবদত্ত গুহা। দেবদত্ত বুদ্ধের ভাই, পরিচয় লিপিতে লেখা আছে যে তিনি এই স্টোন হাউসে সমাধি লাভ করেছিলেন খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম অব্দে।।

উষ্ণ প্রস্রবণ এখানে একটি নয়। মখদুম কুণ্ডের কাছে সূর্য কুণ্ড সীতা কুণ্ড গণেশ কুণ্ড। মখদুম কুণ্ডের নাম আগে ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড ছিল। মখদুম শাহ শরফুদ্দিন নামে এক মুসলমান সাধু এখানে বারো বৎসর বাস করেছেন। তাঁরই নামে কুণ্ডের নাম বদলেছে।। নিকটে একটি মসজিদ তৈরি হয়েছে, আর মুসলমান যাত্রীদের থাকবার জন্য আছে মুসাফিরখানা।

এই পাহাড়ের মাথায় অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে। দুটি মহাবীরের মন্দির, আদিনাথ হেমন্ত চন্দ্রপ্রভা ও সুব্রত মুনির মন্দির। একেবারে পাহাড়ের শিখরে তিরিশ ফুট উঁচুতে একটি ধ্বংস স্তূপ দেখা যায়। প্রস্তর ফলকে নাকি লেখা আছে যে এইখান থেকেই মহাবীর তাঁর জৈন ধর্ম প্রথম প্রচার করেন। শুধু যে মহাবীর এখানে অনেক বর্ষা অতিবাহিত করেছেন তা নয়, বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতর এটি জন্মস্থান। রাজগির জৈনদেরও তীর্থ।/

মনে পড়ছে যে এক বন্ধু রহস্য করে বলেছিল : পাহাড়ের মাথায় উঠবে নাকি ?

আর একজন বলেছিল : বেশ তো, তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি ওঠ।

আর তোমরা ?

আমরা এগিয়ে যাই, ফেরার সময় তোমাকে তুলে নেব।

একাওয়ালা এ দেশী হলেও বাঙলা বোঝে। বলল : পাহাড়ে ওঠার ইচ্ছা থাকলে ভোর বেলায় বেরতে হয়। রোদে এখন কষ্ট হবে।

একটু থেমে বলল : গৃধ্রকুট পাহাড়ে তো উঠতেই হবে।

কেন ?

বুদ্ধদেবের পাহাড় বেশি উঁচু নয়। ও পাহাড়ে না উঠে কোন যাত্রী ফেরেন না।

এবারে আমরা ডান হাতে যে পাহাড় পেলুম, তার নাম বৈভার। এই পথটি মনে হল একটি গিরিপথ, বিপুল ও বৈভার পাহাড় যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য একটি স্বাভাবিক গিরিবর্ত্ম রচনা করে রেখেছে। এই গিরিপথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। একটি দুটি নয়, পাঁচ সাতটি পাহাড় একটি সমতলভূমিকে ঘিরে আছে। এক্কাওয়ালা পাহাড়ের নামগুলি আমাদের বলে দিল : একেবারে চোখের সামনে যেটা তার নাম উদয়গিরি, ডান হাতে শোনগিরি, আর রত্নগিরি বাম হাতে, বিপুল পাহাড়ের সঙ্গে তার ছেদ নেই।

এই যে একটু আগে গৃধ্রকূটের নাম করলে সেটা কোথায়?

গৃধ্রকুট কোন স্বতন্ত্র পাহাড় নয়, রত্নগিরির দক্ষিণ অংশের নাম গৃধ্রকুট।

এক্কাওয়ালা আমাদের আর একটা জিনিস বলল : উদয়গিরি ও শোনগিরির মাঝখান দিয়ে রাস্তা গেছে নওয়াদার দিকে। বাণগঙ্গা বলে ওই জায়গাটাকে। একটি সুন্দর ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে তরতর করে।

প্রায় পাঁচ বর্গমাইল বিস্তৃত এই সমতল ভূমি। আজ এই ভূমি আদৃত পরিচ্ছন্ন নয়, লতাগুল্মে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। যে যুগে দুর্গ নির্মিত হত পর্বতের উপরে, নগর সুরক্ষিত হত প্রাচীর ও পরিখায়, সে যুগে এই স্থান আদর্শ নগরীর উপযুক্ত ছিল। পর্বত প্রাচীর বেষ্টিত এই নগর স্বাভাবিক কারণেই দুর্ভেদ্য ছিল। আমরা আরও বিস্মিত হয়েছিলুম আর একটা জিনিস দেখে। একটি বিরাট প্রাচীরের অবস্থান। পাহাড়গুলির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রাচীরের উচ্চতা এক মানুষের চেয়ে কম কোথাও নয়, কোথাও দুই মানুষের সমান। দৈর্ঘ্যে এই

দেওয়াল মাইল পঁচিশের কম হবে না। ইংরেজী নাম সাইক্লোপিয়ান ওয়াল। নগর সুরক্ষিত করবার জন্য আরও একটি দেওয়াল ছিল, তার পরিধি পাঁচ মাইল। সেটি সমতলভূমির উপর।

বাণগঙ্গায় পৌঁছে আমরা এই প্রাচীরের একটা অংশ দেখে আশ্চর্য হয়েছিলুম। প্রাচীর সেখানটায় ভেঙে পড়ে নি, এখনও এমন সুদৃঢ় আছে যে তার উপর দিয়ে যানবাহন চলতে পারে অনায়াসে।

ততক্ষণে এই অঞ্চলের সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মেছে। আমরা ঠিক করলুম যে এই দুপুর রোদে এক্কা থেকে সহজে নামব না। শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাব। নামা ওঠা করব ফেরার পথে। তাই সাতধারায় নামলুম না, মনিয়ার মঠ থেকে শোনভাণ্ডারের দিকেও গেলুম না, বিম্বিসারের জেল ছাড়িয়ে গৃধ্রকূট পর্বতের পথে না গিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিলুম। শেল ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন এরিয়াতেও না নেমে আমরা উদয়গিরি ও শোনগিরির মাঝখানের সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে উপস্থিত হলুম। এক্কাওয়ালা বলল: এইখানে নামতে হবে, এরই নাম বাণগঙ্গা। দক্ষিণে এই পথ নওয়াদার দিকে গেছে।

স্পষ্টই বুঝতে পারছিলুম যে রাজগৃহের সীমা এইখানে শেষ হল। দূরে সেই বিরাট প্রাচীর দেখা যাচ্ছে, উদয়গিরি থেকে নেমে এসে শোনগিরির উপর উঠে গেছে। বাণগঙ্গার উপরেই ছিল দক্ষিণের দরজা। এক্কা থেকে নেমে এই অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম।

বড় শুষ্ক রুক্ষ স্থান। যে ছায়াশীতল গাছটির নিচে আমরা নামলুম, তার আশেপাশে আর কোন শ্যামল দৃশ্য নেই। প্রস্তরময় পর্বতের উপরে মধ্যাহ্নের রৌদ্র প্রকৃতিকে উপহাস করছে।

কিন্তু নয়ন মুগ্ধ হল আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে। পথের উপরে যে পুলটি দেখতে পাচ্ছিলুম, সেটি একটি নদীর উপরে। এই

জলের ধারা নেমেছে শোনগিরি থেকে। পুলের নিচে দিয়ে এসেছে উদয়গিরির কোলে, তার পরে বয়ে যাচ্ছে। অনেক নিচে এই জলের ধারা, তৃণগুল্মে গাছের ছায়ায় মায়াময় স্থান। পাহাড়ের উপব প্রাচীর দেখতে যারা উঠছিল, আমি তাদের সঙ্গ নিলুম না। আমি এই জলধারার পাশে গিয়ে বসবার জন্য নিচে পা বাড়িয়ে দিলুম।

কিন্তু না, নিচে নামবার উপায় নেই। বাধা প্রাকৃতিক নয়, বাধা সভ্যতার। এধারে যে বয়স্কা স্ত্রীলোকটি পাথরের উপর আছড়ে কাপড় কাচছিল, তাকে দেখে থামবার প্রয়োজন ছিল না। ওধারে পুলের নিচে এক দল অসংবৃত মেয়ে দেখে চমকে উঠলুম। গ্রামাঞ্চলের নানা বয়সের মেয়েরা এই পথ অতিক্রম করবার সময় শীতল জলের লোভে নিচে নেমেছে। তাদের খড়কুটো কাঠের বোঝা পথের ধারে দেখতে পাচ্ছি। এক বস্ত্রের মেয়েরা কী কবে স্নান করছে, তা দেখবার সাহস হল না। সভ্যতার দুর্বলতা। মন যখন অপবিত্র, তখনই ভয়। সাহস তো ধার্মিকের।

সিরসির করে হাওয়া আসছিল জলের ধার থেকে। সেই আমেজটুকু নিয়ে আমি পালিয়ে এলুম। কিন্তু বাণগঙ্গার রূপের কথা আমি ভুলব না। বাণগঙ্গা এই নদীর নাম।

দূরে এক দল মহিষ চরছিল। একজন লোককেও দেখলুম সেই গাছের নিচে এসে বসেছে। কিন্তু ওরা কোথা থেকে এসেছে তা বুঝতে পারলুম না। যত দূর দেখা যাচ্ছে তাতে লোকালয়ের চিহ্ন নেই। মানুষও নেই। সাতধারার পরেই মানুষের দেখা আর পাই নি।

পাহাড়ের উপর থেকে সঙ্গীরা নেমে এলে আমরা আবার এক্কায় উঠলুম। এক জন রাজগির থেকে এই বাণগঙ্গার দূরত্ব অনুমান করবার চেষ্টা করল। বলল: মাইল তিনেক হবে।

কোথা থেকে?

ওই যে, কী বলে কুণ্ডগুলোর নাম—

একাওয়ালা বলল : সেখান থেকে সাড়ে তিন মাইল।

ফেরার পথে আধ মাইল পথ পেরিয়েই আমরা শেল ইন্স্‌ক্রিপ্‌সন এরিয়ায় পৌঁছলুম। পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটি অঙ্গন। এক্কা থেকে নেমে আমরা ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। এই সমতল স্থানটি সম্পূর্ণ পাথরের। তার উপর নানা রকমের দাগ, রথের চাকারও গভীর চিহ্ন আছে। এই দাগগুলি কোন প্রাচীন শিলালিপি কিনা আমরা বোঝবার চেষ্টা করছিলুম। এক্কাওয়ালা এগিয়ে এসে বলল : নানা জনে নানা রকম কথা বলে।

কী রকম ?

কেউ বলে ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ এইখানেই হয়েছিল। তাঁরাই জায়গাটাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। আবার কেউ বলে যে শোনভাণ্ডারে যে ধনরত্ন লুকনো আছে, তারই হদিস লেখা আছে এইখানে। যে পড়তে পারবে সেই পাবে গুপ্তধন।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই লিপি এদেশে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে প্রচলিত ছিল এবং প্রথম চার-পাঁচ শতাব্দীর লোকেরা এই লিপিই ব্যবহার করত। এ যুগে তার পাঠোদ্ধার আর সম্ভব নয়। কিছু ক্ষয়ে মুছে গেছে, কিছু যানবাহনের চলাচলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এক্কাওয়ালা বলল : এই যে চাকার দাগ দেখছেন, এ চাকা জরাসন্ধের রথের।

জরাসন্ধের না হলেও এ দাগ রথের চাকারই দাগ বলে মনে হচ্ছে। কাঁচা মাটির রাস্তার উপর গরুর গাড়ির চাকার দাগের মতো পাথরের উপরে এই চিহ্ন আজও দর্শকের কৌতূহল উদ্রেক করছে।

শেল ইন্স্‌ক্রিপ্‌সন কেন বলে, এ নিয়েও আমরা আলোচনা করলুম। পাথরের রঙ লালচে, কিন্তু ঝিনুকের শেলের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্যের জন্যই হয়তো এই নাম হয়েছে। এই লিপির ইংরেজী নাম শেল কিনা জানি না। Shell ইংরেজী শব্দ।

আমরা যখন গৃধ্রকুট পর্বতের দিকে অগ্রসর হলুম, তখন একাওয়ালা বলল যে বুদ্ধ-জয়ন্তীর বৎসরে নাকি অনেক বৌদ্ধ যাত্রী এখানে আসতেন। তাঁদের গ্রন্থে বুঝি আছে যে এইখানে এই প্রাচীর বেষ্টিত অঙ্গনে বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম ভিক্ষার খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। রাজা বিম্বিসারও তাঁর দর্শনের জন্য এইখানে এসে মিলিত হয়েছিলেন। আমি কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে এই কথা পড়ি নি, কিন্তু গৃধ্রকুটের সঙ্গে বুদ্ধের স্মৃতিব কথা সর্বত্র পড়েছি।

রাজগিরের পাহাড়গুলির নানা শাস্ত্রে নানা নাম। মহাভারতে দেখি—

বৈহারো বিপুলঃ শৈলো ববাহ বৃষভস্তথা।
তথৈব গিরয়শ্চৈব শুভাশ্চৈত্যক পঞ্চমা॥

বৈহার বিপুল বরাহ বৃষভ ও চৈত্যক। স্থানান্তবে অন্য নামও আছে। পালি ভাষায় এই পাহাড়ের নাম বেভাব বেপুল গিজ্‌ঝকুট পাণ্ডব ও ইসিগিলি। বর্তমান কালে এই পাহাড়গুলি বৈভার বিপুল রত্নগিরি উদয়গিবি ও শোনগিরি নামে পরিচিত। এগুলি বোধ হয় জৈন নাম। তাদের নাকি আবও দুটি নাম আছে।

গৃধ্রকুট রত্নগিরিরই দক্ষিণের অংশ। বিপুল পাহাড় যেমন সব চেয়ে উঁচু, গৃধ্রকুট তেমনি সব চেয়ে নিচু। বিপুল পাহাড় এক হাজার ফুটের কিছু বেশি উঁচু, উপরে উঠবার জন্য ভাল সিঁড়ি আছে। গৃধ্রকুটে উঠবার জন্য আছে বিম্বিসার রোড হিউএন চাঙ বলেছেন যে রাজা বিম্বিসার এই রাস্তা তৈরী করেছিলেন বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাতে যাবার সময়। রাজার লোকেরা পাথর কেটে পথ ও সিঁড়ি তৈরী করেছে। খানিকটা উপরে উঠে যে স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়, সেইখানে তিনি রথ থেকে নেমেছিলেন, আর দ্বিতীয় স্তূপের নিকট পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁর অনুচরদের।

আমারও ধীরে ধীরে উপরে উঠছিলুম। এক বন্ধু বলল : গৃধ্র মানে তো শকুন?

আর একজন বলল ঃ কুট মানে পাহাড়ের চূড়ো।

তবে কি পুরাকালে এই পাহাড়ে শুধু শকুন বসত?

আমি এ কথার উত্তর দিতে পারতুম, কিন্তু দিলুম না। পাঁচ জনের কাছে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি গোপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সবজান্তা বলে লোকে নিন্দা করে। বেশি জানা এ যুগে গুণের নয়, পাণ্ডিত্য নয় ঈর্ষার বস্তু। বেশি জানবার জন্য যে সময় উদ্যম ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়েছিল, তা অপব্যয় হয়েছে বলে লোকে মূর্খ ভাবে। ফা হিয়েনের ভ্রমণ-কাহিনীর কথা আমার মনে পড়েছিল, কিন্তু আমি তা বললুম না। ফা হিয়েন লিখেছিলেন যে মার পিশুন গৃধ্রের রূপ ধারণ করে বুদ্ধের প্রিয় সহচর আনন্দকে ভয় দেখাতে এসেছিল। আনন্দ তখন এই পর্বতের একটি গুহায় সাধনা করতেন। বুদ্ধদেব থাকতেন অন্য একটি গুহায়। তিনি আনন্দকে অভয় দেবার জন্য অলৌকিক ক্ষমতায় তাঁর একটি হাত আনন্দের কাঁধে রাখেন। এই হাত ও গৃধ্রের চিহ্ন এখনও বর্তমান বলে পর্বতের নাম গৃধ্রকুট।

উপরের একটি বড় গুহার নাম আনন্দ গুহা। পাহাড়ের উত্তর দিকে এটি। দক্ষিণে আরও কয়েকটি গুহা আছে। এগুলি ছাড়িয়ে একেবারে উপরে উঠলে একটি প্রশস্ত চত্বর। লোকের বিশ্বাস যে বুদ্ধদেব এইখানে বসে তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। এইখানে প্রাপ্ত একটি বুদ্ধের পদ্মাসন মূর্তি এখন নালন্দার যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

বাঁধানো চত্বরে বসে আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলুম। পরম রমণীয় স্থান। নিকটে ও দূরে শুধু পর্বত, আর নীল আকাশ। মন্দ বাতাসে দেহের ক্লান্তি দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যে তপস্যার জন্য এ উপযুক্ত স্থান। শুধু তপস্বীর জন্য শ্রেয় নয়, কবির জন্যও প্রিয়।

বুদ্ধকে যাঁরা শুধু দার্শনিক তপস্বী বলেন, তাঁরা বোধহয় ভুল করেন। নিঃসন্দেহে বুদ্ধ সৌন্দর্যের উপাসক কবি ছিলেন। সাধনার

জন্য স্থান নির্বাচনেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। একদিন আনন্দ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রভু! মহৎ জীবনের অর্ধাংশই সৌন্দর্যের সাধনা, এ কথা মনে করলে কি ভুল হবে?

বুদ্ধ বলেছিলেন, তা হবে বৈকি আনন্দ।

আনন্দ আশ্চর্য হয়েছিলেন এই উত্তর শুনে।

তারপরে বুদ্ধ তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, অর্ধেক নয়, সম্পূর্ণ জীবনই হল সৌন্দর্যেব সাধনা।

একদা এই গৃধ্রকুট পর্বতের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল জীবকের আম্রবন। জীবক রাজা বিম্বিসাবেব চিকিৎসক ছিলেন। মগধের এই যুবক তক্ষশিলায় গিয়েছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। সে গল্প এখানে অবান্তর। এখানে তিনি তাঁর আম্রবনটি বুদ্ধকে দান করেছিলেন এবং একটি সুন্দর বিহার নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এই স্থানের নিকটেই মদ্দ কুচ্ছি, সংস্কৃত শব্দ মর্দ কুক্ষি। বিম্বিসারের রানী যখন দৈবজ্ঞের কাছে জানলেন যে তাঁর গর্ভে আছে এমন এক শিশু যে তার পিতাকে হত্যা করবে, তখন তিনি তাঁর কুক্ষি মর্দন করে সেই সন্তানকে অসময়ে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অজাতশত্রু ঠিকই জন্মেছিলেন এবং পিতাকে হত্যা করেছিলেন। বুদ্ধের খুড়তুতো ভাই দেবদত্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে বুদ্ধকেও হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে বিম্বিসার যখন পুত্রেব হাতে রাজ্যভার দিয়ে বুদ্ধের সেবায় মনোনিবেশ করতে চাইলেন, তখন অজাতশত্রু তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। বিম্বিসার শুধু অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁকে এমন জায়গায় কারারুদ্ধ করা হোক, যেখান থেকে প্রভুর গৃধ্রকুট পর্বত দেখা যায়। বিম্বিসারের জেল সেই কারা, যেখানে তিনি নিজে বন্দী থেকে সারাক্ষণ গৃধ্রকুট পর্বত দেখতেন। এটি নাকি জরাসন্ধেরই কারাগার ছিল। নানা দেশের রাজাদের তিনি এইখানেই বন্দী করে রাখতেন।

ফা হিয়েন বলেছেন যে এখানে অম্বাপালিরও এক বাগান ছিল। সেই বাগানে এক বিহার নির্মাণ করে রাজবৈদ্য জীবক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন অম্বাপালির পূজা গ্রহণের জন্য। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এই অঞ্চলে অশ্বজিতের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

আর একটি স্থানের বর্ণনা আছে হিউএন চাঙের বর্ণনায়। তার নাম বেণুবন। বাঁশ গাছের বন। নিকটে করণ্ড হ্রদ, বা কালন্দক নিবাপ। যে সরস্বতী নদী উষ্ণ প্রস্রবণগুলির নিকট প্রবাহিত, তার নাম ছিল তপোদা।

আড়াই হাজার বৎসর পুর্বে বুদ্ধ আনন্দকে যে·কথা বলেছিলেন, সেই কথা আমার মনে পড়ল। "ওহে আনন্দ, রাজগৃহ কী রমণীয় স্থান ; তথায় গিঝ্যকুট, গৌতম, নিগ্রোধ, চোরপর্বত, বেভারগিরির পার্শ্ববর্তী সপ্তপর্ণী গুহা। ইষিগিরির পার্শ্ববর্তী সিতবন, তপোদারাম, বেণুবনে কালন্দক নিবাপ, জীবকাম্ব বন, মধ্যকুচ্ছিতে মৃগারণ্য এ সমস্তই মনোহর, বড়ই সুন্দর।"

১৮

গৃধ্রকূট পর্বত থেকে আমরা মনিয়ার মঠে গেলুম। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়ে এই স্থানটি আবিষ্কার করেছে। ইঁটের গাঁথুনি দেওয়া একটি প্রায় গোলাকার ঘর, উপরে ঢেউ খেলানো টিনের ছাদ। আশেপাশে বাঁধানো চত্বর আছে সিঁড়ি-দেওয়া। পুরাকালে এও একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তার প্রমাণ নেই। জানা গেছে যে কিছু দিন পূর্বে এর উপর জৈনদের মনিয়ার মঠ ছিল। সেটা ভেঙ্গে এই সব বার করতে হয়েছে। মাটির নিচে আরও অনেক কিছু এখনও আছে। কালে হয়তো তাও খুঁড়ে বার করা সম্ভব হবে।

মনিয়ার মঠ নাম কেন হল, এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে। একটা সন্তোষজনক অনুমানও করা হয়েছে। মাটি খুঁড়ে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রধান হল নানা আকার ও আকৃতির মাটির পাত্র। কোনটি কলস, কোনটি বা ভৃঙ্গারের মতো। কিন্তু সবগুলির চারি দিকে অনেকগুলি করে মুখ। এই মুখগুলিও নানা আকৃতির। শঙ্খ প্রদীপ প্রভৃতির আকৃতিই নয়, কোনটি বা সাপের ফণার মতো। এমন পাত্রও পাওয়া গেছে যা এখনও বাঙলা দেশে মনসা পূজায় ব্যবহৃত হয়। এ সবের কিছু নমুনা নালন্দার যাদুঘরে আছে। আর ভাঙা পাত্রগুলি মঠেরই এক জায়গায় ছড়ানো আছে।

যে মূর্তিগুলি এখানে পাওয়া গিয়েছিল, তা এখন দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়মে আছে। তার মধ্যে কয়েকটির নিচে ব্রাহ্মী লিপিতে পরিচয় লেখা ছিল। মণি নাগ, ভগিনী সুমগধী, ইত্যাদি। মণি নাগের উল্লেখ আছে মহাভারতে গিরিব্রজের বর্ণনায়।—

স্বস্তিকস্যালয়শ্চাত্র মণিনাগস্য চোত্তমঃ।

এইখানে ছিল স্বস্তিক নাগ ও মণি নাগের উত্তম আলয়। তারপর পালি গ্রন্থে দেখি মণিভদ্র যক্ষের মন্দির মণ্রিমালা চৈত্য। মনে হয়, এই সমস্ত শব্দ থেকেই মনিয়ার নামেব উৎপত্তি হয়েছে।

আমরা যখন পশ্চিমে বৈভার পাহাড়ের গায়ে শোনভাণ্ডাব গুহা দেখবার জন্য অগ্রসর হলুম, তখন এক্কাওয়ালা বলল: এই মনিয়ার মঠের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে, কিন্তু আসল কথাটা কেউ জানে না।

সে কথা কী?

ঠিক কথা বাবু, এই জায়গায় বিম্বিসার রাজার মাটির জিনিস তৈবি হয়ে পোড়ানো হত। রাজাব ব্যবহারের বলে নানা ফ্যাশনেব জিনিস তৈরি হত।

সবাই হেসে উঠেছিল, কিন্তু আমি হাসি নি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল: আমি তো বাবু মূর্খ মানুষ, আপনাদের কথা শুনেই আপনাদেব বলি। যে কথাটা আমার মনে ধরেছে, তাই বললাম।

জিজ্ঞাসা করলুম: আর কিছু শোন নি?

শুনেছি। মনিয়ার মঠকে অনেকে নির্মল কুয়া বলেন। পুজার পব নির্মাল্য এখানে ফেলা হত।

বন্ধুরা আবার হেসে উঠল।

শোনভাণ্ডারকে অনেকে বলেন স্বর্ণ ভাণ্ডার। জরাসন্ধের ধনাগার। সাধারণ লোকের ধারণা যে অনেক ধনরত্ন এই গুহার পিছনে এখনও লুকানো আছে। পাহাড়ের ভিতর কোথায় সেই গুপ্তধন, তার সন্ধান কারও জানা নেই, কেউ তা বার করতে পারে নি।

পাহাড়ের নিকটে এসে আমরা এক্কা থেকে নামলুম। সামনেই সেই গুহা। একটা নয়, দুটো। পাশাপাশি। পশ্চিমের গুহায়

জানালা আছে, দরজাও আছে, পূর্বেরটার ছাদ মাটিতে ধ্বসে পড়েছে। একাওয়ালা আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল, বলল: সাহেবরা কামান দেগে পাহাড়ের ধনরত্ন উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল। তাতে ছাদটাই শুধু ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু ভিতরে ঢোকবার পথ পাওয়া যায় নি।

সত্যি নাকি?

সত্যি নয়! জরাসন্ধ যত রাজাকে জয় করে এইখানে এনে জেল খাটিয়েছে, তাদের ধনরত্ন সব গেল কোথায়! সবই এই পাহাড়ের মধ্যে লুকানো আছে। আর ওইখানেই যে পাথরের উপব লেখা দেখলেন, ওতেই সব কিছু লেখা আছে। বত্রিশটা লিপি। যে পড়তে পারবে সে রাজা হয়ে যাবে।

পড়বার চেষ্টা কেউ করে না?

শুনেছি, সাহেবরা খুব চেষ্টা করেছে। আমাদের দেশী পণ্ডিতদের ধরে এনে পড়তে বলেছে। কিন্তু কেউ পারে নি।

গুহার ভিতরে দরজার সামনেই আমরা একটি ত্রিকোণ পাথরের খণ্ড দেখতে পেলুম। এই পাথরের তিন দিকেই তিনটি মূর্তি। বোধ হয় জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। দেওয়ালেও কিছু শিলালিপি দেখলুম।

আমার মনে হল যে গুহার ছাদটি আপনা-আপনি ভেঙে পড়েছে। অন্যটার ছাদেও ফাটল আছে। পাহাড়ের এই অংশটি বোধ হয় মূল পাহাড় থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন। তাই তেমন মজবুত নয়, কালের ওজন বেশি দিন বহন করতে পারেনি।

এখানে আমরা আরও অনেক যাত্রীকে দেখলুম। অনেক পুরুষ ও নারী। সবাই বড় আগ্রহ নিয়ে সব কিছু দেখছেন। এক জন বললেন: এটি বিম্বিসারের ট্রেজারি ছিল।

তার প্রমাণ কী?

এর ব্যবস্থা দেখছ না, এ যুগের কাউন্টারের মতো ব্যবস্থা!

এইখান থেকে লোকে পয়সাকড়ি পেত, কিংবা প্রজারা খাজনা দিত।

তাতে বিম্বিসারের নাম কেন আসছে?

এখানকার সবই তো বিম্বিসারের কীর্তি। তাঁর বংশধরেরা গিয়েছিল পাটলিপুত্রে।

আমরা আবার এক্কায় বসলুম। আকাশের সূর্য তখন পশ্চিমে হেলেছে। রৌদ্রে আর উত্তাপ নেই, শুধু আলো আছে। একজন বন্ধু বলল: ফেরো এইবারে।

আমরা যে পথে এসেছিলুম, সেই পথেই ফিরলুম। দুপুরে সে ঘোড়াকে বেশি কষ্ট দেয় নি, আস্তে আস্তেই এক্কা চালিয়েছিল। এবারে সে এক্কা ছুটিয়ে সাতধারার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমরা যে পুলটা পেরলুম, শুনলুম, সেটি সরস্বতী নদীর পুল। শীর্ণ ধারার নদী, বর্ষায় স্ফীত হয়ে প্লাবন আনে বলেও মনে হল না। ধাপে ধাপে উপরে উঠে কুণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেল। যাত্রীরা যাতায়াত করছে। সকলেই স্নানার্থী। যত পুরুষ, মহিলাও তত। পরিবেশটি মনে হল তীর্থস্থানের মতো।

আমাদের সঙ্গে কাপড় গামছা ছিল না বলে আমরা স্নান করলুম না। ঠিক হল যে পরে এসে স্নান করব। এই সব কুণ্ডে স্নানের একটা অভিজ্ঞতা আছে। কুণ্ড তো শীতল জলের নয়, জল উষ্ণ। গায়ে সইয়ে স্নান করতে হয়। প্রথম দিনই যারা অনেকক্ষণ ধরে স্নান করবার চেষ্টা করেছে, তাদের অজ্ঞান হতেও দেখা গেছে। আবার যারা কায়দাটি শিখে ফেলতে পেরেছে, তারা প্রতি দিন বারে বারে এসেছে স্নান করতে।

ঘুরে ঘুরে আমরা কুণ্ডগুলি দেখলুম। উষ্ণ প্রস্রবণের জল কোথা থেকে এসে জমছে তা দেখতে পাওয়া যায় না। তার পর নালা দিয়ে সেই জল নানা কুণ্ডে বিতরণ করা হচ্ছে। সপ্তর্ষি কুণ্ডেই সাতধারা, পাঁচটি পশ্চিম দিকে ও দক্ষিণ দিকে দুটি।

নব্বই ফুট দীর্ঘ ও আঠারো ফুট চওড়া একটি আয়তক্ষেত্রে জল জমে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়, কিন্তু উপরে ছাদ নেই।

সপ্তর্ষি কুণ্ডের সামনেই ব্রহ্ম কুণ্ড। বর্গক্ষেত্র। জল এখানে লোকের গলা পর্যন্ত। আরও দুটি কুণ্ড দেখলুম—কামাখ্যা কুণ্ড ও অনন্ত ঋষি কুণ্ড। মেয়েরা যেখানে স্নান করছে তার নাম ব্যাস কুণ্ড।

অনুসন্ধান করে জানলুম যে এই সব কুণ্ডের জলে লোহা সালফেট নাইট্রেট ও ক্লোরিন আছে। বাত পক্ষাঘাত ও চর্মরোগে উপকার হয়, পেটের গোলমালও সারে।

হঠাৎ আমার মনে হল, এই কুণ্ডের জলে স্নান করা মারাত্মক। কত চর্মরোগের রুগী যে সারাক্ষণ এই জলে স্নান করছে তার হিসেব নেই। জল নিশ্চয়ই বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে স্নান করলে আর রক্ষা থাকবে না। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, কুণ্ডের থেকে উঠে কেউ গা মুছছেন না। আবার তাঁরা ধারার নিচে বসে স্নান করে নিচ্ছেন। চর্মরোগের ভয়েই বোধ হয় এই রীতি হয়েছে।

এই সব কুণ্ডের জল বয়ে গিয়ে সরস্বতী নদীতে পড়ছে।

বৈভার পাহাড়ে উঠবার বাসনা কারও ছিল না। এখন উপরে উঠলে সন্ধ্যার পূর্বে নামা যাবে না। অন্ধকারে উপরে থাকা নাকি নিরাপদ নয়।

শুনলুম যে উপরে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। প্রথমেই জরাসন্ধকা বৈঠক। অনেকে বলেন যে এইটিই বৌদ্ধদের পিপ্পল গুহা বা পিপ্পলীভবন। খণ্ড খণ্ড পাথরে তৈরি প্রায় আশি ফুট লম্বা ও চওড়া একটি স্থান। মার্শাল সাহেব একে একটি প্রাগৈতিহাসিক ওয়াচ-টাওয়ার বলে মনে করেছিলেন।

তার পর জৈনদের কতকগুলি মন্দির। শিব মন্দিরও একটি আছে।

বিখ্যাত সপ্তপর্ণী গুহায় পৌঁছতে হলে অন্য পথে খানিকটা নিচে নামতে হবে। ছুটি গুহা। সপ্তপর্ণী মানে ছাতিম গাছ। অনেকে বলেন যে পালি ভাষায় এই সপ্তপর্ণী শব্দের মানে গৌরবময়। সত্যিই এই গুহার একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। বুদ্ধের নির্বাণের পর প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম সভা এইখানে হয়েছিল। এইখানেই ত্রিপিটক রচিত হয়েছে। একটি গুহার ভিতরে নাকি সুড়ঙ্গ পথ আছে। কিন্তু তার শেষ কোথায় কেউ তা জানে না।

পাহাড়েব নিচের দিকে একটি ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। অনেকে মনে কবেন যে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম সভা সেইখানেই হয়েছিল। সেই জায়গাটিব ইংরেজী নাম 'সপ্তপর্ণী হল'।

হোটেলে ফেবাব পথে এক বন্ধু জিজ্ঞাসা কবল : বাজগিবে আর বোধ হয় বাকি কিছু রইল না।

আব একজন বলল : পাহাড়ে ওঠাই তো বাকি রয়ে গেল।

তা থাক। আমি সমতলের কথা জানতে চাইছি। কি হে একাওয়ালা ?

একাওয়ালা কোন উত্তব দিল না।

একজন বলল : জরাসন্ধের আখড়া বলে একটা জায়গা আছে শুনেছিলুম।

আখড়া, না বৈঠক ? জবাসন্ধেব বৈঠক তো শুনলুম পাহাড়ের উপরে।

একাওয়ালাকে প্রশ্ন করে জানা গেল যে জরাসন্ধেব আখড়া নামেও আর একটা জায়গা আছে শোনভাণ্ডার থেকে মাইল খানেক পশ্চিমে। তার অপর নাম বণভূমি। জরাসন্ধের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল সেইখানে।

তা সেখানে কেন নিয়ে গেলে না ?

ভয়ে ভয়ে একাওয়ালা বলল : পায়ে হাঁটবার পথ আছে, ভাবলাম আপনারা যাবেন না।

আমি তখন জরাসন্ধের কথা ভাবছিলুম। সে যুগে জরাসন্ধের মতো বীর মহাভারতে কম ছিলেন। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবার বাসনা করেন, তখন তাঁর অমিতবিক্রম জরাসন্ধের নাম প্রথম মনে আসে। মগধের এই রাজাকে জয় না করলে রাজসূয় যজ্ঞ অসম্ভব। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের শরণ নিলেন। কৃষ্ণ নিজেই জরাসন্ধকে ভয় পেতেন। লোকে বলে যে কৃষ্ণ জরাসন্ধের ভয়েই মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকাবাসী হয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর অন্য উপায় ছিল না। জরাসন্ধ আঠারো বার মথুরা আক্রমণ করে মথুরাবাসীকে উৎখাত করেছিলেন। এই শত্রুতার সঙ্গত কারণ ছিল।

জরাসন্ধের একটা জন্মবৃত্তান্ত আছে। মগধের রাজা বৃহদ্রথের দুই রানী ছিল, কিন্তু কোন সন্তান ছিল না। কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে তিনি বিবাহ করে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে দুজনের প্রতি তিনি সমান অনুরক্ত থাকবেন। একদিন রাজা সংবাদ পেলেন যে তপঃক্লান্ত ঋষি চণ্ডকৌশিক একটি আম গাছের নিচে বিশ্রাম করছেন। রাজা দুই রানীকে নিয়ে গিয়ে ঋষির সেবা করে তাঁর বর পেলেন। গাছ থেকে একটি আম ঋষির কোলে পড়েছিল। তিনি সেটি রাজার হাতে দিলেন। রাজা দুই স্ত্রীকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন। সেই আম খেয়ে দুই রানীরই ছেলে হল, কিন্তু একটি ছেলেরই দুটি অংশ—এক পা, এক হাত, আধখানা করে শরীর। ক্ষুব্ধ দুঃখিত রাজা এই দুই অংশ রাজপ্রাসাদের বাহিরে ফেলে দিলেন। জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুই অংশ জোড়া দিয়ে জরাসন্ধকে জীবিত করে রাজার হাতে সমর্পণ করল।

এই জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির বিবাহ হয়েছিল কৃষ্ণের মাতুল কংসের সঙ্গে। কৃষ্ণ কংসকে বধ করে জরাসন্ধের শত্রু হয়েছিলেন। জামাতা বধের সংবাদ পেয়ে জরাসন্ধ তাঁর গদা মাথার উপরে নিরানব্বই বার ঘুরিয়ে মথুরার দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। মথুরার যে স্থানে সেই গদা পড়েছিল তার নাম গদাবসান ক্ষেত্র।

তার পর তাঁর মথুরা আক্রমণ। একবার তুবার নয়, আঠারো বার। কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য ভীম অর্জুনকে নিয়ে ব্রাহ্মণ বেশে গিরিব্রজে জরাসন্ধের কাছে এলেন। স্নাতক ব্রাহ্মণবেশী এই তিন শত্রুকে জরাসন্ধ সম্মান করেছিলেন, কিন্তু সন্দেহ করেছিলেন তাঁদের হাতের জ্যা চিহ্ন দেখে। তখন কৃষ্ণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, যুদ্ধং দেহি। কিন্তু কার সঙ্গে যুদ্ধ? জরাসন্ধ বললেন, যে সব চেয়ে শক্তিমান সেই ভীমের সঙ্গেই যুদ্ধ হোক। কৃষ্ণ বললেন, যদি রক্ষা পেতে চাও তো বন্দী ক্ষত্রিয় রাজাদেব তুমি মুক্তি দাও। জরাসন্ধ বললেন, আমি জয় করে যাদের বন্দী করেছি, ভয় পেয়ে তাদের মুক্ত করব না।

জরাসন্ধ তাঁর পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকের আদেশ দিলেন। পুরোহিত এলেন রাজার স্বস্ত্যয়নে। তার পর রণসজ্জা। পুরবাসী পুরুষ ও স্ত্রী সকলে সমবেত হল রণাঙ্গনে। তুই বীরের মল্লযুদ্ধ শুরু হল। প্রকর্ষণ আকর্ষণ অনুকর্ষণ ও বিকর্ষণে তুজনেই উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। কার্তিক মাসের প্রথম প্রতিপদ থেকে মাসের শেষ ত্রয়োদশী পর্যন্ত আটাশ দিন দিবারাত্র যুদ্ধ হয়েছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা মহাভারতের সভা পর্বে লিপিবদ্ধ আছে। যুদ্ধে জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখে কৃষ্ণ ভীমকে উত্তেজিত করলেন, বললেন, এইবারে তোমার দৈববল দেখাও। ভীম অমনি জরাসন্ধকে মাথার উপরে তুলে একশো বার ঘোরালেন, তার পর মাটিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করে তাঁর দেহ দ্বিধাবিভক্ত করলেন। গিরিব্রজের রণভূমিতে জরাসন্ধের মৃত্যু হল।

২০

সন্ধ্যা বেলায় উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে একটা নূতন অভিজ্ঞতা হল। শীতকালে যাঁরা গরম জলে স্নান করেন, তাঁরাও এত গরম জল ব্যবহার করেন না। এত গরম জল মাথায় ঢালার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এখানে সবাইকে দেখে আমরাও একে একে স্নান করলুম। প্রথমটায় একটু তাপ লেগেছিল, তার পর সয়ে গেল। এক রকমের অদ্ভুত তৃপ্তি পেলুম স্নানের পর।

হোটেলে আমরা কোন রকমে রাত কাটালুম। এঁদো ঘর, তার উপর মশার অত্যাচার। এখানে যে ভাল থাকবার জায়গা আছে, পরে সে সংবাদ পেয়েছিলুম। বহু যাত্রীর থাকার জন্য একটা ডরমিটরি তৈরি হয়েছে। বেণুবনের রেস্ট হাউস দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় দুখানা ঘরের স্যুইট, আর উপর তলায় একখানা করে ঘর। এক সঙ্গে এক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবার অনুমতি পাওয়া যায়। অনেকে আবার ইনস্পেকসন বাঙলোতেও থাকেন, বিশেষ করে যাঁরা সরকারী কর্মচারী।

নালন্দায় কোন খাবারের ব্যবস্থা নেই শুনে আমরা কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে নিলুম। সকালের চা খেয়ে বেরলুম নালন্দা দেখতে।

রাজগির থেকে নালন্দার দূরত্ব মাইল সাতেক। ট্রেন আছে। সরকারী বাসও নিয়মিত যাতায়াত করছে। আমরা সকালের ট্রেনটা পেয়ে গেলুম বলে ট্রেনেই নালন্দায় এসে নামলুম।

বিচিত্র স্টেশন। গাড়ি থেকে নেমে মনে হবে একটা লেভেল ক্রসিঙের উপর নামলুম, আর স্টেশনটি যেন কোন গেটম্যানের বাড়ি। রাজগির থেকে যে সরকারী রাস্তা বক্তিয়ারপুর গেছে, তারই উপর

স্টেশন। পা প্ল্যাটফর্মে পড়ে না, প্ল্যাটফর্ম নেই, পড়ে এই বড় রাস্তার উপরেই। সেখানে একার মতো অগণিত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। উঠে বসলেই পাকা রাস্তা ধরে টেনে আনবে নালন্দার দরজায়।

এই দুই মাইল রাস্তা আমরা দু পাশের ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে এলুম। ডান হাতে একটি তিব্বতী ধর্মশালা দেখলুম। এটি যে ধর্মশালা তা একাওয়ালা বলল, আর তিব্বতী বুঝলুম গেটের আকৃতি দেখে। দুটো থামের উপর যেন একটি নৌকো বসানো।

অনেকটা এগিয়ে বাঁ হাতে একটা নূতন সৌধ দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম। নালন্দায় আমরা ধ্বংসাবশেষ দেখতে এসেছি, এমন নূতন ধরনের বিরাট বাড়ি দেখব সে আশা করি নি। একাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে সেটা নব নালন্দা মহাবিহার। এই প্রতিষ্ঠানের কথা কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ল। পালি ভাষা বুদ্ধলজি ও বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়নের জন্য বিহার সরকার এই মহাবিহার নির্মাণ করেছেন। বিনয় ও অভিধর্ম বুদ্ধলজির দুটি ভাগ। হীনযান পড়ানো হয় ইণ্টারমিডিয়েট ও বি. এ. ক্লাসে, এম. এ. ক্লাসে মহাযান। একাওয়ালার কাছেই জানতে পারলুম যে এখানকার শিক্ষক ও ছাত্রেরা শুধু ভারতবর্ষেরই অধিবাসী নন, শ্যাম মালয় জাপান তিব্বত সিংহল এমন কি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেরও মানুষ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করছেন।

আমাদের একা এসে যেখানে থামল তার বাঁ দিকে একটি বড় গাছ। গাছের নিচে একটি চালার সামনে বসে জনকয়েক মেয়ে পুরুষ চা খাচ্ছে। চায়ের দোকান সেটি। তারই পাশ দিয়ে পথ গেছে নালন্দার ভিতর। কিন্তু সোজা সেদিকে যাবার উপায় নেই। টিকিট নিতে হবে। সামনেই বুকিং অফিস। একই টিকিটে যাদুঘরও দেখা যায়। যাদুঘরের রাস্তা ডান হাতে। একটুখানি এগিয়ে প্রশস্ত বাগানবাড়ি, তার ভিতরে নালন্দার যাদুঘর।

টিকিট নিয়ে আমরা অন্য ধারে এগিয়ে গেলুম। দু ধারে ফুলের বাগান, মাঝখানে পথ। নানা জাতের নানা রঙের মরসুমী ফুলে বাগান আলো হয়ে আছে।

আমাদের সামনে যে ছোট দলটি ভিতরে ঢুকে গেলেন তাঁরা ভারতীয় নন। অদ্ভুত তাঁদেব বেশভূষা। লম্বা ঢিলে আলখাল্লা নয়, পবনে পুরু মোটা কাপড়ের ঘাগরা, গায়ে জামা, তাব উপরে ছোট কোট। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেব প্রভেদ এত কম যে তাদের চিনতে একটু সময় বেশী লাগে। এক বন্ধু বলল: ওরা তিব্বতী।

আব একজন বলল: ভুটিয়া।

সিকিমেব লোকও হতে পারে।

আমার মন তখন অন্য দিকে ছিল। সিংহদ্বাবেব সামনে দাঁড়িয়ে আমি তখন নালন্দাব রূপ দেখছিলুম। উঁচু প্রাচীবে ঘেরা বিরাট এক ক্ষেত্র। একটা শহর। একদা নালন্দা একটি স্বতন্ত্র শহর ছিল। একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি শহব। তার আইনকানুন আলাদা, জীবনধারণের সমস্ত রীতি নীতিই আলাদা। আজকের যাত্রীরা দু আনার টিকিট কিনে ভিতরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে দিন পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে কোন মানুষ এখানে প্রবেশের অধিকার পায় নি। ঘুষ দিয়েও পারে নি, তদ্বির সুপারিশের জোরেও না। আজকের মতো সরকারী উর্দিপরা দারোয়ান সে দিন ফটকে ছিল না। যাঁরা ছিলেন তাঁদের কথা সবাই ভুলে গেছে। শুধু ইতিহাস ভোলে নি।

ভিতরে ঢুকে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। কত অসংখ্য ভগ্ন স্তূপে একটি বিরাট প্রান্তর পরিপূর্ণ। রাস্তা ছেড়ে একটা উঁচু স্তূপের উপর গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখান থেকে ভিতরের অনেকটা জায়গা দেখা যায়। সেই সাত তলা স্তূপ, আর তার উপর উঠবার সারি সারি বাঁধানো সিঁড়ি! কত মানুষ উঠছে, নামছেও

কত। অনেকে ছাদের উপরে দাঁড়িয়েও ছবি নিচ্ছে নিচের ধ্বংস স্তূপের।

এই নালন্দা। এত দিন ভাবতুম, শুধু এই তিনটি অক্ষরই একটা যুগকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একটি মাত্র ধ্বনি একটা যুগের ইতিহাসকে নিঃশব্দে ধারণ করে আছে। কিন্তু এইখানে দাঁড়িয়ে এই ভুল আমার ভেঙে গেল। এ তো শুধু অক্ষর নয়, ধ্বনিও নয়। এ যে একটা ঐশ্বর্যময় অতীতের অমর ইতিহাস, বিস্মৃত দিনের বিপুল কীর্তির বিরাট স্বাক্ষর। স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি ভারতের অন্য রূপ দেখলুম—শান্ত সমাহিত ধ্যানগম্ভীর মৌন রূপ। প্রাচীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা আমার চোখের সামনে।

নালন্দা নাম কেন হল, এ নিয়ে গবেষণা অনেক হয়েছে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে নাল নালক ও নালক গ্রাম নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে সারিপুত্রের জন্ম ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত, রাজগৃহ থেকে তার দূরত্ব অর্ধ যোজন। শুধু জাতক ও মহাবস্তুতে নয়, তিব্বতী গ্রন্থেও এই শব্দের উল্লেখ আছে। অনেকে তাই মনে করেন যে নাল নালক ও নালক গ্রাম নালন্দারই অন্য নাম।

চীনের বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউএন চাঙ সপ্তম শতাব্দীতে এ দেশে এসে বলেছিলেন যে নালন্দা নাম হয়েছে নালন্দ নাগের নামে। এইখানে একটা পদ্মের সরোবরে সেই নাগ থাকত। তিনিই আবার বলেছেন যে তা নয়, কোন এক জন্মে বোধিসত্ত্ব এখানে রাজা ছিলেন। এমন দানশীল ছিলেন যে দেব না বলতে পারতেন না— ন অলং দা, নালন্দা। কেউ বলেন, নাল মানে পদ্ম, খণ্ড মানে সন্দহ। এমন পদ্মের দেশ বলে নাম নালন্দা।

নালন্দা রাজগৃহের মতো প্রাচীন নয়, রামায়ণ মহাভারতে এই স্থানের কোন পরিচয় নেই। নালন্দার প্রথম উল্লেখ দেখি জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থে। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে মহাবীর ও বুদ্ধের জীবনকালে নালন্দা বিদ্যমান ছিল।

তারানাথের ইতিহাসে দেখি মৌর্য সম্রাট অশোক এখানে সারিপুত্তের চৈত্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে এসেছিলেন, আর নালন্দায় একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন। তাঁর মতে অশোকই নালন্দা বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। এই ঘটনা ঘটেছিল তৃতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তিনি আরও বলেছেন যে বিখ্যাত মহাযান দার্শনিক নাগার্জুন এর পরের শতাব্দীতে নালন্দায় অধ্যয়ন করে এখানেই অধ্যাপক হয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পণ্ডিতেরা আজ মাটি খুঁড়ে এ কথা সমর্থন করেন না। কেন না মাটিব নিচে সে যুগের কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় নি। সব চেয়ে প্রাচীন যা পাওয়া গেছে, তা সমুদ্রগুপ্তের আমলের একটি নকল তামার প্লেট, আব কুমারগুপ্তেব একটি তামার মুদ্রা। হিউএন চাঙের কথাই তাহলে বিশ্বাস কবতে হয় যে নালন্দার প্রতিষ্ঠা করেন শক্রাদিত্য, তার পর তাঁব বংশধর বুদ্ধগুপ্ত তথাগতগুপ্ত বালাদিত্য ও বজ্র নালন্দার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করেন। এঁদের অনেকেই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন।

চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন এ দেশে এসেছিলেন পঞ্চম শতাব্দীব গোড়ার দিকে। এই অঞ্চলে এসে তিনি সারিপুত্তের জন্ম ও সমাধিস্থান নাল গ্রাম দেখেছিলেন। সে সময়ে এখানে একটি স্তূপ ছিল, আর কিছু নয়। নালন্দার মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা তখনও হয় নি।

হিউএন চাঙের রচনায় আমরা নালন্দার গৌরবের কথা পড়েছি। তিনি এখানে অনেক দিন ছিলেন এবং অনেক কথা লিখেছেন যত্ন করে। নালন্দার প্রথম সংঘারাম নির্ম্মাণ করেছিলেন বৌদ্ধরাজা শক্রাদিত্য। তার পর চারটি সংঘারাম তৈরি করেছেন বুদ্ধগুপ্ত তথাগতগুপ্ত বালাদিত্য ও মহারাজা বজ্র। আর একটি সংঘারাম কোন্ রাজার তৈরি, তাঁর নাম জানা যায় না। এই

সংঘারামে অসংখ্য সৌধ আছে। উঁচু ইটের প্রাচীর দিয়ে সমস্ত সৌধগুলি বেষ্টিত। অদ্ভুত ভাস্কর্য। অপরূপ কারুকার্যময় অসংখ্য স্তম্ভ, শৈলশিখরের মতো সৌধচূড়া সূক্ষ্মাগ্র, সারি সারি সুবিন্যস্ত, স্থানে স্থানে প্রবাল খচিত।

কনৌজের অধিপতি হর্ষবর্ধনের নাম এই মহাবিহারের সঙ্গে স্থায়ী ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। তিনি ছেষট্টি হাত উঁচু একটা বিহার নির্মাণ করে তা পিতলের পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। সবাই তা সোনার বলে ভুল করত। তিনি এই মহাবিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য শতাধিক গ্রাম দান করেছিলেন।

দশ হাজার বিদ্যার্থী এখানে প্রতি দিন অধ্যয়ন করত। অধ্যাপক ও ভিক্ষুরাও ছিলেন কয়েক হাজার। শুধু বৌদ্ধ গ্রন্থই পড়ানো হত না, সমগ্র শাস্ত্রই পড়ানো হত। বেদ সাংখ্য আয়ুর্বেদ হেতু বিদ্যা শব্দ বিদ্যা প্রভৃতি কোন বিদ্যাই বাকি নেই। বৌদ্ধদের আঠারো সম্প্রদায়ের গ্রন্থ মহাযান ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের বিচার এখানে সকলে জানতেন। হিউএন চাঙ বলেছেন যে ত্রিপিটক না জানা একটা সাংঘাতিক লজ্জার ব্যাপার ছিল।

নালন্দায় প্রবেশের অধিকার পাওয়া বড় কষ্টসাধ্য ছিল। দ্বার-পণ্ডিতদের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিতে হত। কথোপকথন ছলে তাঁদের পরীক্ষা। কিন্তু বিচারের বিষয়গুলি এমনই দুরূহ যে বিদ্যার্থীরা প্রায় সকলেই ফিরে যেত। একশো জনের ভিতর দশ থেকে বিশ জন কোন রকমে প্রবেশ করত। যাদের অধ্যবসায় কম, তারা দ্বিতীয় বার আর আসত না। যাদের মনোবল দৃঢ়, তারাই আসত বার বার। বিশ্ববিশ্রুত হবার অভিলাষ নিয়ে পণ্ডিতেরাই এখানে বিদ্যার্থী হয়ে আসতেন।

নালন্দার খাদ্যের কথাও হিউএন চাঙ লিখে গেছেন। চারি দিকের দুশো গ্রাম থেকে এখানে খাদ্য আসত, দুশো মানুষ রোজ আসত খাদ্য দ্রব্যের সম্ভার নিয়ে। প্রত্যেক বিদ্যার্থী পেত শিমের

বীচির মতো বড় বড় দানার চাল, সাদা চকচকে সুগন্ধ চাল। তার সঙ্গে গম জায়ফল সুপারি আর কর্পূর—তেল ঘি ও অন্যান্য জিনিস।

শীলভদ্র শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্করের মতো বড় বড় পণ্ডিত এখানে ছিলেন। শীলভদ্র যখন নালন্দার অধ্যক্ষ তখন সেখানে দশ হাজার মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা সূত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থের কুড়িটি সংগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তিরিশটি পারতেন পাঁচশো জন, আর দশজন পঞ্চাশটি। শীলভদ্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন না এমন গ্রন্থ সে যুগে ছিল না।

হিউএন চাঙ যখন নালন্দায় এসেছিলেন, তখন শীলভদ্রের বয়স প্রায় একশো বছর। কুড়ি জন মহাপণ্ডিত হিউএন চাঙকে শীলভদ্রের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের কথা হিউএন চাঙ চীন দেশেই শুনেছিলেন। তাই তিনি সম্মান প্রদর্শনের কোন ত্রুটি রাখলেন না। হাঁটুর উপর ভর করে তাঁর কাছে গেলেন, এবং শীলভদ্রের চরণদ্বয় চুম্বন করে মাটিতে মাথা ঠেকালেন। শীলভদ্র তাঁকে এমন ভাবে গ্রহণ করলেন যেন কত কালের পরিচিত তাঁরা। কাছে বসিয়ে নানা কুশল প্রশ্ন করলেন, তার পর ডাকলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্রকে। তিনিও মহাপণ্ডিত। বয়স সত্তর। বললেন, আমার অসুখের ঘটনা এঁর কাছে বিবৃত কর।

তাঁর আদেশে বুদ্ধভদ্র একটি অলৌকিক ঘটনা শোনালেন। তিন বৎসর আগেকার একটি ঘটনা। কুড়ি বৎসর যাবৎ শীলভদ্র শূলের বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। এক দিন যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে তিনি মৃত্যু ইচ্ছা করলেন। কিন্তু মৃত্যু হল না। রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন। জ্যোতির্ময় আলোকের ভিতর তিনি স্পষ্ট ভাবে দেখলেন মঞ্জুশ্রী অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়কে। তাঁরা বললেন, তোমার কার্য এখনও শেষ হয় নি। চীন দেশ থেকে তোমার শিষ্য

আসছে, তাকে তোমার জ্ঞান দান করতে বাকি আছে। এই বলে তাঁরা অন্তর্হিত হলেন। স্বপ্ন মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু যা সত্য তা নিদ্রা ভঙ্গের পরই জানা গেল। এই ঘটনার পর শীলভদ্র আর কখনও শূলের ব্যথায় কষ্ট পান নি।

হিউএন চাঙ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, দরদর ধারে তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তিনি শীলভদ্রের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিলেন।

এক বন্ধু আমার হাত ধরে স্তূপের উপর থেকে টেনে নামাল। বলল ঃ পাগল নাকি ?

পাগলই বটে ! যে অতীতকে ইতিহাস ভাল করে ধরে রাখতে পারে নি, সেই অতীতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম। বন্ধু আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে এখানে আমরা ভাবতে আসি নি, এসেছি দেখতে, 'চোখ ভরে সব কিছু দেখে ফিরব। যা মনে থাকবে তাই জমা হবে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে। বন্ধুর সঙ্গে আমি ধ্বংসস্তূপের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

এই সব প্রাচীন স্থানের বিশদ বিবরণ ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ সযত্নে প্রকাশ করেছেন। তাতে প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তুর খুঁটিনাটি বিবরণ আছে। চৈত্য ও বিহারগুলির নম্বর দিয়ে তাঁরা যাবতীয় বক্তব্য বিবৃত করেছেন। অত খুঁটিনাটি দেখবার ধৈর্য আমাদের ছিল না। আমরা একটা সামগ্রিক ধারণা করতে পারলেই খুশী হই।

যেখানে আমরা নেমেছিলুম, সে একটা বিহার। পুরু দেওয়ালের সারি সারি কক্ষ, দরজা আছে, জানালা নেই, শয্যা পাথরের। বাঁধানো চত্বরের মাঝখানে কুপ দেখলুম, নালা দিয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা। এগুলি বিদ্যার্থীদের বাসস্থান ছিল।

খানিকটা এগিয়ে আমরা সেই বিরাট স্তূপের পাদদেশে পৌঁছলুম। কয়েক তলা বাড়ির সমান উঁচু, অগণিত সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়। যাত্রীরা উঠছে, নামছে। কারও ক্লান্তি নেই। আমরা যে তিব্বতী বা সিকিমের পরিবারটি দেখেছিলুম, তাঁরাও উপরে উঠছেন। আমরাও উঠলুম। শুধু উপরে উঠবার জন্য ওঠা, নয়তো উপরে কিছু দেখবার নেই।

শুধু উপর থেকে নিচের দৃশ্যটা দেখতে আশ্চর্য লাগে। কত বিশাল জায়গা জুড়ে এই মহাবিহার ছিল, কত বিচিত্র ব্যবস্থা, কত উদার, কত গম্ভীর!

এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন: একালের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটা লাইব্রেরি থাকে, তাও একটা বড় বাড়ির একটা অংশে। অথচ এই নালন্দায় তিনটি লাইব্রেরি ছিল আলাদা আলাদা বাড়িতে।

সত্যি?

সত্যি মানে! সেই তিনটে বাড়ির নামও পাওয়া যায়—রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক। এদের ধর্মগঞ্জ বলত।

এই সব প্রাচীন নাম আমি হিউএন চাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে পড়েছিলুম। শীলভদ্রের নাম ছিল ধর্মরত্ন, আর হিউএন চাঙ প্রথমে ধর্মগুরু ও পরে মোক্ষদেব নাম পেয়েছিলেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গী বলল: কোন্‌টা কোন্ রাজার সংঘারাম দেখিয়ে দাও।

ভদ্রলোক অবিলম্বে বললেন: পারব না।

কেন?

যে চেষ্টা পণ্ডিতেরা করেন নি, আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাব না। দেওয়াল যার কয়েক হাত উঁচু, ছাদ নেই, কারুকার্য নেই কোনখানে, এমন জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়েও কোন লাভ নেই।

উপর থেকে নামবার সময় দেখলুম, সেই তিব্বতী পরিবারটি সিঁড়ির উপর অপেক্ষা করছেন। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। পরক্ষণেই দেখতে পেলুম, এক ভদ্রলোক নিচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। তাড়াতাড়ি আমরা নেমে এলুম।

এই ছবি তোলার তাৎপর্য আমি বুঝি। কত দূর দেশ থেকে কত পরিশ্রমে কত অর্থ ব্যয়ে তাঁরা এখানে এসেছেন। এখানকার স্মৃতি তাঁরা ধরে রাখবেন। নিজের দেশে ঘরে বসে যখন এই ছবি

দেখবেন, তখন এই ভ্রমণের বিলাসের কথা মনে পড়বে। যারা আসে নি তারা দেখবে। উত্তরপুরুষ দেখবে পূর্বপুরুষের অভিযান।

এই বিরাট স্তূপ ঘিরে অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে। কারুকার্য-মণ্ডিত ছোট ছোট স্তূপ ও চৈত্য। বড় স্তূপটি যেমন সাত বার সংস্কৃত ও নির্মিত হয়েছে, তেমনি এই ছোট স্তূপগুলিও দু তিন বার নির্মিত হয়েছে। এই সব স্থানে শুধু কারুকার্য নয়, বুদ্ধ ও বোধি-সত্ত্বের মূর্তিও ক্ষোদিত আছে।

এক বন্ধু বলল: এখানে আমাদের বেশি সময় কাটানো চলবে না।

কেন?

বাইরে যাদুঘর আছে, তার পরে জৈন তীর্থ পাওয়াপুরী।

একজন সন্দেহ প্রকাশ করে বলল: পাওয়াপুরী কি দেখা হবে?

কেন হবে না! একটু তাড়াতাড়ি করলে সবই হবে।

আমরা সেই বন্ধুকে অনুসরণ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

যাদুঘর একেবারে সামনা সামনি। শুধু খানিকটা পথ অতিক্রম করতে হয়। গেট দিয়ে ঢুকে একটি প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ডান দিকের একখানা এক তলা বাড়ি নালন্দা মিউজিয়ম। নালন্দার ধ্বংস-স্তূপ খুঁড়ে বার করবার সময় মূল্যবান যা কিছু পাওয়া গেছে, তাই এখানে রাখা হয়েছে যত্ন সহকারে। নানা দেবদেবীর মূর্তি, ধাতুর ও মাটির নানা তৈজসপত্র।

দেবতাদের মূর্তির মধ্যে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর এই সব মূর্তিই প্রধান। ঐশ্বর্যের দেবতা জম্ভল তারা প্রজ্ঞা-পারমিতা সরস্বতী আছেন। এঁরা বৌদ্ধ দেবতা। হিন্দু দেবতা শায়িত শিবপার্বতীর উপর বৌদ্ধ দেবতা ত্রৈলোক্যবিজয়। গণেশের উপর অপরাজিতা। বিদ্যুজ্জ্বালা করালীর বাহন ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। ব্রহ্মার ছিন্ন মুণ্ড হাতে বৌদ্ধ দেবতার মূর্তিও আছে।

এই সব মূর্তি থেকে ধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। কোন
র্ম যখন দুর্বল হয়ে আসে, তখন সে আক্রমণ করে অপরের ধর্মকে।
হিন্দুরা বৌদ্ধদের আক্রমণ করেছিল অন্য ভাবে। তারা বলেছিল,
বুদ্ধ আমাদেরই অবতার, বুদ্ধকে মানতে হলে হিন্দু ধর্ম পরিহারের
প্রয়োজন নেই। কিন্তু নালন্দার এই সব মূর্তি দেখে যে আক্রমণ
অনুমান করি, তা বোধ হয় তন্ত্র মতের জনপ্রিয়তার জন্য প্রয়োজন
হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য শেষ হয়ে তখন পাল বংশের অধিকার
চলছে। দেশে পরিবর্তন আসছে নানা ভাবে। শিল্পীদের দক্ষতাতেও
পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। শুধু পাথর নয় ব্রোঞ্জের .মূর্তি তৈরি হয়েছে
অপর্যাপ্ত ভাবে। মূর্তির ছড়াছড়ি দেখে মনে হয় যে এই ধাতু শিল্প
নালন্দার শিক্ষা বিষয়েরই অন্তর্গত ছিল।

বিষ্ণু বলরাম গণেশ শিব-পার্বতী মহিষমর্দিনী দুর্গা—এ সব হিন্দু
দেবদেবীও পাওয়া গেছে। মনে হয় বিহারে যাঁরা বাস করতেন,
তাঁরা এই সব দেবদেবীর আরাধনা করতেন। হয়তো মূর্তি
তৈরিও করতেন কেউ কেউ। তা না হলে এত ছোট ছোট মূর্তির
এমন প্রাচুর্য কেন হবে!

প্রথম কক্ষ থেকে দ্বিতীয় কক্ষে এসে দুখানি শিলালিপি দেখলুম
আর দেখলুম মাটির তৈরি নানা জিনিস। শুধু দেবদেবী বা পশু-
পক্ষী নয়, সংসারের প্রয়োজনীয় নানা তৈজসপত্র পানপাত্র পেয়ালা
প্রদীপ প্রভৃতি। অন্য দিকে লোহার জিনিস—ছুরি কাঁচি কাস্তে
কোদাল আরও কত কী। চুনবালির কাজ বা স্টাকো ওয়ার্ক,
পোড়ামাটির কাজ বা টেরাকোট্টা ওয়ার্ক। বাহিরে পোড়ামাটির
একটি বিরাট হাঁড়ি দেখেছিলুন। এতে বোধ হয় শস্য সঞ্চয় হত। এক
হাজার বছরের পুরনো এই মাটির হাঁড়ি দেখে অনেকে আশ্চর্য হল।

তৃতীয় কক্ষে ব্রোঞ্জের মূর্তি দেখলুম, দেখলুম পাথরের খড়ম,
হাতির দাঁতের চটিজুতো, রাজদণ্ড। অসংখ্য জিনিসের মধ্যে এই
কটিই শুধু মনে আছে।

যাদুঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমরা সেই চায়ের দোকানের সামনে বসলুম। সেই বড় গাছটি এমন ছায়া বিস্তার করেছে যে রৌদ্রের উত্তাপ এখানে নেই। চা চেয়ে নিয়ে মধ্যাহ্নের আহার আমরা এইখানে সেরে নিলুম। এখান থেকে পাওয়াপুরী যাব।

একখানা একায় চেপে আমরা স্টেশনের দিকে এলুম। স্টেশন তখন বন্ধ হয়ে গেছে, দরজায় তালা ঝুলছে। আমরা এখানে আসবার পরে আর একখানা গাড়ি বক্তিয়ারপুরের দিকে চলে গেছে। শীঘ্র আর কোন গাড়ি নেই বলে স্টেশনের কর্মচারীরা যে যার বাড়িতে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাদের ঝোলাঝুলি স্টেশনের ঘরের ভিতর রেখে গিয়েছিলুম। তাও সংগ্রহ করে নেবার উপায় রইল না।

নিকটে কয়েকটি খাবারের দোকান ছিল। সেখানে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে খানিকক্ষণ পরে মোটর বাস পাওয়া যাবে। রাজগির থেকে বক্তিয়ারপুর যাচ্ছে বিহার-শরিফের উপর দিয়ে। সেই বাসে বিহারে গিয়ে পাওয়াপুরীর বাস পাব। সেখানে ট্যাক্সিও আছে, ঘোড়ার গাড়িও আছে। আট মাইল পথ। যাতায়াতে ষোল মাইল। ফিরে এসে বক্তিয়ারপুরের ট্রেন ধরতে অসুবিধা হবে না। এই ট্রেনখানি আমাদের ধরতেই হবে। সন্ধ্যা বেলায় বক্তিয়ারপুরে বড় লাইনের ট্রেন ধরতে না পারলে সকাল বেলায় কলকাতায় পৌঁছতে পারব না। সকলেরই অফিস আছে।

খোঁজ খোঁজ। স্টেশনের লোক কোথায় গেছে খুঁজে বার করতে সময় লাগল না। পাশেই তাদের কোয়ার্টার। আমাদের ডাকাডাকিতে খালি গায়ে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে ঝোলাঝুলি ফিরিয়ে দিল। আমরা তাদের ধন্যবাদ দিলুম।

কিন্তু বাস তাড়াতাড়ি এল না। রাস্তায় পায়চারি করে ক্লান্ত হয়ে দোকানে এসে বসলুম, চা নিয়ে খেলুম। তখনও বাসের দেখা নেই। যখন এল তখন সেই বাসের অবস্থা দেখে চক্ষু স্থির। তিল

ধারণের জায়গা নেই। তবু তারা আদর করে ভিতরে তুলে নিল। আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম।

দু ধারের দৃশ্য আমাদের দেখা হল না, যাত্রার আনন্দ থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হলুম। ভিড়ের ভিতর মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে শরীরটা সামলাবার চেষ্টাতেই সময়টা কেটে গেল। বিহার-শরিফের পথে নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

প্রথমে আমরা বাসের খবর নিয়েছিলুম। সঠিক খবর কেউ জানে না। তবে জানা গেল যে বাস আমাদের যেখানে নামিয়ে দেবে, সেখান থেকে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়; আর ফেরার সময় বাস পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় নেই। ঘোড়ার গাড়িতে গেলে এত সময় লাগবে যে আমাদের হাতে তত সময় নেই। অগত্যা ট্যাক্সি। আমরা ট্যাক্সির চেষ্টায় যত্নবান হলুম। অনেক কষ্টে একটি ট্যাক্সি পাওয়া গেল, কিন্তু তার দাবি শুনে পিছিয়ে গেলুম।

এক বন্ধু বলল: থাক তোমার পাওয়াপুরী। তার চেয়ে কোন হোটেলে গিয়ে বসি।

প্রস্তাবটা অসঙ্গত নয়। খানকয়েক পাঁউরুটি চিবিয়ে পেট ভরে নি। তার পরে বাসের ঝাঁকানি। এখানেও ছুটোছুটি হয়েছে। আর একজন সমর্থন করল: সেই ভাল।

আমি বললুম: পাওয়াপুরীতে কী দেখবার আছে জেনে নেবে না?

কাকে ধরা যায়! শেষ পর্যন্ত ঠিক হল হোটেলওয়ালাকেই ধরা হবে। কাজেই একটা অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন গোছের হোটেলে ঢুকে জাঁকিয়ে বসলুম। পুরি তরকারি পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে রাবড়ি।

পাওয়াপুরীর খবরও পাওয়া গেল। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এখানে নির্বাণ লাভ করেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বাহাত্তর বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয় রাজা

হস্তিপালের লেখশালায়। এই মন্দিরটির নাম গাঁও মন্দির। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা রাজা নন্দীবর্ধন এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন।

পাওয়াপুরীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হল জলমন্দির। যেখানে তাঁর দেহ দাহ করা হয়, সেইখানে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। একটি বিশাল জলাশয়ের মাঝখানে এই মন্দিরের আকার বিমানের মতো। নিচে শ্বেত পাথরের মেঝে, উপরে সোনার শিখর। মহাবীরের পাদুকা আজও মন্দিরের ভিতর রক্ষিত আছে।

এই মন্দিরে কি নৌকোয় যেতে হয়, না সাঁতার কেটে?

নৌকোয় নয়, সাঁতার কেটেও নয়। তীর থেকে মন্দিরে যাবার জন্য লাল পাথরের সেতু আছে।

হোটেলওয়ালা জিজ্ঞাসা করল : অমৃতসর গেছেন?

বললুম : না।

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের মতো, হিন্দুদের দুর্গিয়ানা মন্দিরেও এই একই ব্যবস্থা।

তার পর সে একটি কিংবদন্তী শোনাল। এই জলাশয় কী করে হল, সেই গল্প। মহাবীরের শেষ কৃত্যের সময় তাঁর এত অগণিত ভক্ত এসে উপস্থিত হয়েছিল যে তা ধারণা করা যায় না। সবাই একটু চিতাভস্ম চায়, একটুখানি মাটি। তারা এক এক মুঠো মাটি সংগ্রহ করে ফিরল, আর সেখানে সৃষ্টি হল একটি বিশাল গর্তের। সেই গর্ত জলে ভরে জলাশয় হয়েছে।

একজন উচ্চ স্বরে হেসে উঠল, কিন্তু সকলে হাসল না। ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কৌতুক করতে সকলে ভালবাসে না।

খেতে খেতেই আমরা বাকি গল্পটুকু শুনলুম। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই অঞ্চলটা সরগরম হয়ে ওঠে। পাওয়াপুরীতে এখন অনেক ধর্মশালা। সে সমস্তই যাত্রীতে ভরে যায়। সেখানকার উৎসব শেষ হলে সেই যাত্রীরাই যায় রাজগিরে।

সেখানেও অগণিত জৈন মন্দির। সমস্ত পাহাড়ে পাহাড়ে তাদের মন্দির আছে ছড়িয়ে।

ছোট লাইনের গাড়িতে চড়ে ফেরার পথে আমি দুই মহাপুরুষের কথা ভাবছিলুম। বুদ্ধ ও মহাবীর। প্রায় একই সময় এই দুই মহাপুরুষ একই দেশে জন্মগ্রহণ করে দুটি বিশিষ্ট ধর্মের প্রবর্তন করেন। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁরা তাঁদের শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন পাটনা জেলার এই অঞ্চলে—রাজগির ও পাওয়াপুরীতে। তাঁদের জীবনে সাদৃশ্য আছে, অভিজ্ঞতায় আছে, এমন কি ধর্ম প্রচারের জন্য স্থান নির্বাচনেও অদ্ভুত সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়েছে।

আজ অনুমান করা হয় যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম খ্রীষ্টের জন্মের ৫৬৭ বৎসর পূর্বে কপিলাবস্তুর নিকট লুম্বিনী বনে, বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলে। গৌতমের পিতা শুদ্ধোদন শাক্য জাতির একজন নায়ক ছিলেন। কপিলাবস্তুতে তাঁর রাজধানী। শৈশবেই তাঁর মাতা মায়া দেবীর মৃত্যু হয়। গৌতম বড় চিন্তাশীল, বড় অন্যমনস্ক ছিলেন। পিতা তাই গোপার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন তাঁকে সংসারী করবার জন্য।। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে গৌতমের পুত্র জন্মাল, আর তার পরেই তিনি গৃহত্যাগী হলেন। কিন্তু তাতে জগতের দুঃখমোচনের কোন উপায় হল না। গয়ার বোধিদ্রুম মূলে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে তিনি বুদ্ধ হলেন।

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি নানা স্থানে ঘুরে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়ালেন। এই রাজগিরেই তিনি চৌদ্দ বৎসর যাপন করেছেন। তার পর আনুমানিক আশি বৎসর বয়সে বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার প্রাচীন কুশী নগরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এঁরই সঙ্গে জৈন ধর্মের প্রচার করেন বর্ধমান মহাবীর। বর্তমান মজঃফরপুর জেলার বৈশালী নগরের উপকণ্ঠে কুণ্ড গ্রামে

বর্ধমানের জন্ম হয় বুদ্ধের সাতাশ বৎসর পরে। এঁর পিতা সিদ্ধার্থ একজন ক্ষত্রিয় নায়ক ছিলেন, এবং মাতা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবি রাজকন্যা। বর্ধমান বিবাহ করেন যশোদাকে। তাঁদের একটি কন্যা জন্মে। ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে বর্ধমান বারো বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। এঁরও লক্ষ্য ছিল সংসারের দুঃখ মোচনের উপায় উদ্ভাবন। সিদ্ধি লাভের পর মহাবীর জিন নামে খ্যাত হন, এবং তাঁর সম্প্রদায়ের নাম হয় জৈন। বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে এই পাওয়াপুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের উপর যে বুদ্ধের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিষদের সবটুকু তিনি গ্রহণ করেন নি। উপনিষদ ব্রহ্মকেই শুধু সত্য বলে মেনেছেন, আর জগৎ বলে যা কিছু আমরা দেখছি তা সবই মিথ্যা। এই দৃশ্যমান জগৎ জীব ও প্রকৃতি যে অনিত্য ও প্রতিভাস মাত্র, এ কথা বুদ্ধ মেনে নিলেন। বললেন, এরা কতকগুলি ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহ মাত্র। সর্বম্ অনিত্যম্ সর্বম্ শূন্যম্। উপনিষদের ব্রহ্মকে বুদ্ধ মানলেন না, বললেন, জীবাত্মা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এবং এই সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মূল্যও অস্বীকার করলেন

সংসার ত্যাগের পূর্বে মানুষের জরা ব্যাধি ও মৃত্যু দেখে বুদ্ধের দুঃখের সীমা ছিল না। বিশ্বের এই দুঃখ দূরীকরণের জন্যই তাঁর দীর্ঘ জীবনের সাধনা। শেষে এই দুঃখের রহস্য তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন। দুঃখ দুঃখহেতু দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়—এই হচ্ছে চত্বারি আর্যসত্যানি। এই দুঃখময় জগতে দুঃখের কারণ নির্ণয় করে সেই কারণকে বন্ধ করার উপায়ও তাঁকে বার করতে হল। বুদ্ধ বললেন, প্রবৃত্তির বিনাশে হয় নির্বাণ, আর এই নির্বাণই হল দুঃখের হেতু নিরোধের একমাত্র উপায়। তিনি যে মুক্তিমার্গের সন্ধান দিলেন তা গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ, ব্রাহ্মণ্য

ধর্মের বানপ্রস্থ ও যতির মতো। বানপ্রস্থকে সর্বজনীন করার চেষ্টা ছিল বুদ্ধের ধর্ম প্রচারে।

বৌদ্ধদের মতো জৈন ধর্মের ভিত্তিও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমূহে। জৈনরাও বেদের অপৌরুষেয়তা ও অবিসংবাদিত্ব জাতিভেদ ও যাগযজ্ঞের বিরোধী। প্রকৃতি বা এই দৃশ্যমান জীব জগতের পিছনে কোন আত্যন্তিক সত্য নেই, মানুষ নিজের কর্মফলের জন্যই সংসারে দুঃখ ভোগ করে, এবং সর্ব জীবে অহিংসা ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন যাপনই মুক্তির একমাত্র উপায়। এই মুক্তিব জন্য সংসার ত্যাগ করে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। এই সাধনার পদ্ধতিতে জৈনদের চরমপন্থী বলা যেতে পারে। বৌদ্ধদের মতো জৈনরা বিলাস ও বৈবাগ্যের মধ্য পথ অবলম্বনে বিশ্বাসী নন। অহিংসা ও সাধনার ব্যাপারে মধ্য পথ নেই। যা পালন করবার তা কঠোর ভাবেই পালন করতে হবে। জৈনদের দিগম্বর সম্প্রদায় বস্ত্র পরিধানেরও বিরোধী।

এই দুই ধর্মের প্রতি তুলনামূলক দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে জৈনদের কিছু সম্পর্ক চিরদিনই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধরা একেবারেই দূরে সরে গিয়েছিলেন। পরিণামেও তাই হল। হিন্দুদের সঙ্গে জৈনরা বেঁচে রইল ভারতবর্ষে। বৌদ্ধদের বিদায় নিতে হল। বুদ্ধ ও মহাবীর এই দুই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়েছে প্রায় একই সময়। তখন তাঁদের ধর্মের প্রতিপত্তি ছিল প্রায় একই রকম। পাঁচ শো বছরের ভিতর বৌদ্ধ ধর্ম সমগ্র এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের স্থানে স্থানে প্রসার লাভ করে এক মহা ধর্মে পরিণত হল। জৈন ধর্ম ভারতেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। তার পর আজ প্রায় পাঁচ শো বছর হল বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর জৈনরা আজ সংখ্যায় ও ঐশ্বর্যে অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র।

মামার কথা আমার মনে পড়ল। দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের সময়

তিনি বলেছিলেন, লোকে বলে বুদ্ধ সোস্তালিস্ট ছিলেন, ব্রাহ্মণের প্রভাব ও বর্ণাশ্রম ধর্ম নষ্ট করে বৌদ্ধ সংঘ নামে গণতন্ত্র স্থাপন ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

আমি এ কথার প্রতিবাদ করেছিলুম। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে নীচ জাতীয় ছিলেন সত্যি, কিন্তু নীচ জাতীয়ের জন্যই তাঁর ধর্ম নয়। আমাদের বানপ্রস্থের মতই তাঁর ধর্মেও জাতি বা বর্ণের বিচার নেই। বর্ণাশ্রমধর্ম নষ্ট করা তাঁর বড় উদ্দেশ্য ছিল না। আর ব্রাহ্মণের যে সংজ্ঞা তিনি তাঁর ধম্মপদে দিয়েছেন, সে উপনিষদের ব্রহ্মদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ, মানবশ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ বিনয় ব্যবহার ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের বিধিনিষেধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু ব্রহ্মচারীর মতে বৌদ্ধ ভিক্ষুও সবাই মুক্তিকামী। কেউ বা মুক্ত। বুদ্ধের জীবৎ কালে তিনিই গুরু ছিলেন, তাঁর নির্বাণের পর অধ্যাত্ম সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করে ভিক্ষুরাই সংঘনায়ক হতেন। এই সব সংঘে রাজনীতি কোন দিন আলোচিত হয় নি বলেই আমার বিশ্বাস।

মামা প্রশ্ন করেছিলেন : তবে কি দুঃখবাদই লোকে চাইল না ?

বলেছিলুম : দুঃখবাদ তো তাঁর ধর্ম ছিল না। সেটা তাঁর ধর্মের ভূমিকা। দুঃখকে সম্পূর্ণ ভাবে জয় করে চির আনন্দময় নির্বাণ লাভের চেষ্টাই তাঁর ধর্ম। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যত গণ্ডগোল বেধেছে সবই এই নির্বাণ কথাটি নিয়ে। দুঃখ জয় করতে যদি মৃত্যুকেই বরণ করতে হল, তাহলে আনন্দ কোথায় ? কিন্তু নির্বাণ তো মৃত্যু নয়, নির্বাণ আনন্দময় চেতনা। ভিক্ষু নাগসেন গ্রীসের রাজা মিলিন্দকে নির্বাণের যে উপমা দিয়েছিলেন সেইটেই বোধ হয় সব চেয়ে সরল উপমা। রাজ্য রক্ষা রাজ্য শাসন ও প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাজাকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়, তা রাজ্য সুখের ভূমিকা মাত্র। উপসংহারটুকু সর্বতোভাবে আনন্দময়। রাজ্য পালনকে যদি দুঃখবাদ বলি, তবে নির্বাণ হল রাজ্য সুখ।

মামা চট করে নিজের মতটি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন : এ দেশে দুঃখ এমন ঘন হয়ে আছে যে দুঃখের আলোচনা লোকের ভাল লাগবে কেন। প্রবৃত্তির বিনাশের জন্য সংসার ত্যাগ কর, রূপে রসে ভরা পৃথিবীটাকে উপেক্ষা কর একটা কাল্পনিক আনন্দের জন্য—এ কথা সাধারণে বুঝবে, এ আশা করাই অন্যায়।

আমার কোন উত্তর দিতে ইচ্ছা হল না। বাহিরে অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছিল। আমার মনেও লেগেছিল ঘোর। মনে পড়েছিল, ধম্মপদে বুদ্ধের নির্বাণের সংজ্ঞা। কী গভীর সেই আনন্দময় চেতনা!

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো॥
সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা।
আতুরেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনাতুরা॥
সুসুখং বত জীবাম উস্সুকেসু অনুস্সুকা।
উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুকা॥
সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং।
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভস্সরা যথা॥

—বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরিহীন হয়ে সুখে জীবন যাপন করব, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বেষ শূন্য হয়ে বিচরণ করব। আতুরগণের মধ্যে আমরা ক্লেশ রহিত হয়ে সুখে জীবন যাপন করব ও বিচরণ করব। আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হয়ে সুখে জীবন যাপন করব ও বিচরণ করব। আমাদের মধ্যে যাদের কোন আসক্তি নেই তারা ভাস্বর দেবগণের ন্যায় আনন্দ ভাজন হয়ে সুখে জীবন যাপন করবে।

২২

ট্রেন যখন পাটনা সিটি স্টেশনে এসে দাঁড়াল, বাহিরের অন্ধকার তখন স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। আর অল্পক্ষণ পরেই হয়তো পূর্বাকাশে আলোর রেখা ফুটে উঠবে, নানা রঙে রঙীন হয়ে উঠবে প্রত্যুষের আকাশ। সহসা আমি যেন এই আলোর প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলুম।

রামচন্দ্রবাবু আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন, বললেনঃ পাটনায় নামবেন নাকি ?

আধুনিক পাটনার সম্বন্ধে সত্যিই আমার কোন কৌতূহল নেই। নূতন শহরের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমার আছে, পাটনা সেই নূতন শহরের পর্যায়ে পড়ে। আমি তাই সংক্ষেপে বললুমঃ না।

রামচন্দ্রবাবু বললেনঃ বিহারের রাজধানী পাটনা, ইচ্ছে করলে একবার দেখে যেতে পারেন। একসময় তো ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহর ছিল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুমঃ কী রকম!

রামচন্দ্রবাবু বললেনঃ পাটনাই তো প্রাচীন পাটলিপুত্র!

সে তো মাটির নিচে।

রামচন্দ্রবাবু বললেনঃ বছর ত্রিশেক আগে এই পাটলিপুত্র শহর খুঁজে পাওয়া গেছে। মাটির নিচে থেকে যা খুঁড়ে বার করা গেছে তা মেগাস্থিনিসের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়।

আমি এ কথা জানতুম না, বললুমঃ সত্যি নাকি!

ভদ্রলোক গর্বিত ভাবে বললেনঃ কুমড়ার নামে একটা গ্রামে অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন।

আমার একটা অনেক দিনের পুরনো কথা মনে পড়ল। এই পাটলিপুত্র যখন নির্মিত হচ্ছিল তখন বুদ্ধদেব এই পথে বৈশালী যাচ্ছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে এই শহর এক দিন খুব সমৃদ্ধিশালী হবে। হয়েও ছিল। মহারাজ অশোক এখানে রাজত্ব করেছেন। অত বড় সম্রাট ভারতবর্ষে আর জন্মায় নি। অনেকে বলে যে তিনি বৌদ্ধ না হলে ভারত কোন দিন বিদেশীর পদানত হত না।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে ভদ্রলোক বললেন: নেমে পড়ুন পাটনা জংসনে। একটা রিকৃশ নিয়ে এক চক্কর লাগিয়ে দিল্লী কিংবা জনতা এক্সপ্রেস ধরবেন। দু-তিন ঘণ্টায় মোটামুটি একটা ধারণাও হয়ে যাবে, আবার দুপুর বেলায় কাশীও পৌঁছে যাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: পাটনায় আর কী দেখবার আছে?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: আছে অনেক কিছু। শহরেরই তিনটি ভাগ দেখতে পাবেন—পুরনো পাটনা ষোড়শ শতাব্দীতে শের শাহর তৈরি, ব্রিটিশ আমলের বাঁকিপুর, আর নতুন রাজধানী।

পাটনা সিটিতে ট্রেন অল্পক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এর পরে দাঁড়াবে পাটনা জংসন স্টেশনে। মাঝখানে গুলজারবাগ স্টেশনে দূর পাল্লার ট্রেন দাঁড়ায় না, দাঁড়াবে মাইল সাতেক দূরে দানাপুরে। এই দুই স্টেশনের মাঝেও ফুলওয়ারি-শরিফ নামে একটা স্টেশন আছে, সেখানেও কোন ভাল ট্রেন দাঁড়ায় না। শুনেছি যে এই স্টেশনের পাশেই দেখা যায় পাটনার এয়ারোড্রোম।

রামচন্দ্রবাবু থামেন নি, বললেন: পাটনা জংসনে বড় বড় সরকারী ঘর বাড়ি যদি না দেখেন তাতে ক্ষতি নেই, শুধু গোলঘরের উপরে একবার উঠবেন।

সে আবার কী!

ভদ্রলোক বললেন: মৌচাকের আকারের একটি ঘর, কিন্তু

উঁচু প্রায় একশো ফুট। উপরে উঠলে গান্ধী ময়দান ও পাটনা শহব দেখতে পাবেন, গঙ্গাও পাবেন দেখতে।

আর ?

আর একটি স্থান অবশ্য দেখবেন। গুরুগোবিন্দ সিংহেব জন্মস্থান হরিমন্দির। শিখদের শেষ গুরু যেখানে জন্মেছেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ সেখানে একটি গুরুদ্বার নির্মাণ করে দিয়েছেন। গুরুব কৃপাণ ও আরও অনেক জিনিস সেখানে রাখা আছে।

কথায় কথায় ট্রেন এসে পাটনা জংসনে দাঁড়াল। প্রখর আলোয় উজ্জ্বল স্টেশন. কলরবে তখন মুখর হয়ে উঠেছে। চাওয়ালাব চিৎকার শুনে মনে হল যে সত্যিই এবারে সকাল হয়েছে। সোজা হয়ে বসে আমি বললুম ঃ একটু চা খান।

ভদ্রলোক আমার কথায় যেন বিব্রত বোধ করলেন। কিন্তু তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আমি সময় পেলুম না। জানলার পাশ দিয়ে চাওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল, তাকে ডাকলুম ঃ এই চা—

রামচন্দ্রবাবু বললেন ঃ আপনি খান, মুখ হাত না ধুয়ে আমি কিছু খাই না।

হাতে এক ভাঁড় গরম চা পেয়ে মন আমার প্রসন্ন হয়ে উঠল। একবার ভাবলুম যে মনোরঞ্জনকে জাগিয়ে তাকেও এক ভাঁড় চা দিই, তারপরেই তার ঘুম ভাঙাতে মায়া হল। ঘুমোক সে, আরও কিছুক্ষণ ঘুমোক। দানাপুর আরা বক্সারেও ট্রেন দাঁড়াবে, সেখানেও পাওয়া যাবে গরম চা।

জানলার পাশে বসে আমি চা খাচ্ছিলুম। এ দিকে চায়ের ভাঁড় দু রকমের। বাংলা দেশের মতো ছোট ভাঁড় আছে, আবার বড় ভাঁড়ও আছে এক রকমের। কিছু না বললে তারা বড় ভাঁড়ের চা দিয়ে দেয়। আমার হাতেও ছিল একটি বড় ভাঁড়, ধোঁয়া উঠছিল সেই চা থেকে। যাত্রীদের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলুম।

আমি বসেছিলুম প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ করে। যাত্রীরা যখন স্টেশনের বাহিরে যাবার জন্য মালপত্র নিয়ে এগিয়ে আসছিল, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিলুম। সহসা আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। আমি শক্ত হয়ে বসলুম।

অনিমেষ তার স্ত্রী শীলাকে নিয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দুজনেই আমার দিকে তাকাল, তারপর শীলা তাকাল অনিমেষের দিকে। অনিমেষের মুখে আমি কোন ভাবান্তর দেখলুম না, দেখলুম শীলার চোখে। আমার মনে হল যে অনিমেষ আমাকে চিনতে পারে নি। এখানে এমন অবস্থায় যে দেখা হতে পারে এ তার স্বপ্নেরও অতীত। ভালই হয়েছে যে সে আমাকে চিনতে পারে নি, তা না হলে আবার সে হয়তো একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসত। নিশ্চিন্ত মনে আমি আবার চায়ে চুমুক দিলুম।

কিন্তু সেই চা গলা দিয়ে নিচে নামল না, আমি যেন বিদ্যুতের ছোঁয়ায় আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

খানিকটা এগিয়েই যে শীলা থমকে দাঁড়িয়েছিল তা বুঝতে পেরেছিলুম তার কণ্ঠস্বর শুনে। সে বলল: গোপালবাবু না!

অনিমেষ কী উত্তর দিল আমি শুনতে পেলুম না। শীলা বলল: নিশ্চয়ই গোপালবাবু।

অনিমেষ এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল: চল চল, কুলি এগিয়ে গেছে অনেকখানি।

এই কুলি—

বলে শীলা অনিমেষকে বলল: এস না, গোপালবাবুকে আমরা টেনে নামাই।

ঢক করে আমি মুখের চা গিলে ফেললুম।

কিন্তু শীলার প্রস্তাবে অনিমেষ রাজী হল না। বলল: চল না, কেন ঝামেলা করছ।

পরের মুহূর্তেই আমি শীলাকে দেখলুম নিজের জানালার পাশে, দু হাত জুড়ে নমস্কার করে বলল : কোথায় যাচ্ছেন গোপালবাবু ?

আমি আমার দু হাত জুড়ে নমস্কার করতে পারলুম না, আমার ডান হাতে ছিল চায়ের ভাঁড়। একবার ভাবলুম যে তাদের চিনতে পারি নি এমনি ভাব দেখাব, আর একবার ভাবলুম যে সে বড় অসৌজন্য হবে। শীলা হেসে বলল : চিনতে পারলেন না আমাকে ! কই গো, এগিয়ে এস। গোপালবাবু যে আমাকে চিনতে পারছেন না !

বলে অনিমেষকে শীলা হাত ধরে সামনে টেনে আনল।

ততক্ষণে আমি চা শেষ করে ভাঁড়টা নিচে ফেলে দিয়েছি। দু হাত জুড়ে নমস্কার করে বললুম : বেনারস যাচ্ছি।

শীলা বলে উঠল : না না, আপনাকে আমরা কিছুতেই ছেড়ে দেব না, নেমে আসুন আপনি।

বাধা দিয়ে অনিমেষ বলল : কেন ওকে কষ্ট দিচ্ছ !

কষ্ট কিসের ! দুদিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন, তারপরে যাবেন বেনারসে। কই, উঠছেন না যে ! নেমে আসুন না তাড়াতাড়ি।

রামচন্দ্রবাবু আমাকে একটা ঠেলা দিলেন, বললেন : ভালই তো, ওঁদের সঙ্গেই পাটনা শহরটা দেখে নেবেন।

তবু আমি উঠতে পারলুম না। মনে হল, আমার হিসাবে একটা মস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে আমি যে শীলাকে দেখেছি, এ যেন সেই শীলা নয়, এ একেবারে অন্য মানুষ। আমি তাকে ভুল বুঝেছি, না সে আজ বদলে গেছে, তা বোঝবার আগেই জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে শীলা তার হাত বাড়িয়ে দিল, বলল : নিজে থেকে না নামলে জোর করে টেনে নামাব।

রামচন্দ্রবাবু এবারে আমাকে ঠেলে তুলে দিলেন, আর হাতে ধরিয়ে দিলেন আমার ঝোলাটি। মনোরঞ্জনকে আমি জাগালুম

না। রামচন্দ্রবাবুকেই বললুম তাকে খবরটা দিতে। তারপর নেমে পড়লুম পাটনার প্ল্যাটফর্মে।

আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল শীলা, কিন্তু অনিমেষ নির্বিকার ভাবে এগিয়ে গেল।

একটা কথা ভেবে আমার আনন্দ হল। মনোরঞ্জনের ফাঁদে আমাকে পা দিতে হল না। একটা লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে আমি পরিত্রাণ পেয়ে গেলুম।

২৩

বেশি দূর আমরা অগ্রসর হই নি। ওভারব্রিজের উপর দিয়ে সদর প্ল্যাটফর্মে এসে নেমেছি মাত্র। একজন মহিলাকে দেখলুম হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে। বোধ হয় এই পাঞ্জাব মেল ধরবেন, এই রকমের ব্যস্ত ভাব। আমি তাঁর দিকে ভাল করে তাকাই নি, কিন্তু তিনি আমাদের দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন : ও মা, গাড়ি এসে গেছে বুঝি !

দিদি !

বলে শীলা তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

এইবারে আমি মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখলুম। কতকটা একই রকম দেখতে, কিন্তু বয়সে কিছু বড়। শীলার দিদি বলে চিনতে কারও ভুল হওয়া উচিত নয়। ততক্ষণে আর একজন ভদ্রলোক কাছে এসে গেছেন, কালচে পাতলুন পরা মস্ত চেহারার মানুষ, মুখে পাইপ। অনিমেষের হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন : হ্যালো ব্রাদার !

দিদিকে ছেড়ে দিয়ে শীলা তার জামাইবাবুকে প্রণাম করল। ভদ্রলোক একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন : থাক থাক।

মুখ তুলেই শীলা বলে উঠল : গোপালবাবুর লেখা পড় নি দিদি ! কী অদ্ভুত লেখা ! এই গাড়িতে উনি বেনারস যাচ্ছিলেন, জোব করে ওঁকে টেনে নামিয়েছি।

সত্যি নাকি !

বলে শীলার দিদি আমাকে নমস্কার করলেন। আমি তাঁদের দুজনকেই নমস্কার করলুম।

শীলার জামাইবাবু বললেন : আমার নাম বোস, হাইকোর্টে

আমি ওকালতি করি, সাহিত্যের খবর রাখি নে। আপনার লেখার সঙ্গে পরিচিত নই বলে ক্ষমা করবেন।

লজ্জা পেয়ে আমি বললুম: আমার লেখার সঙ্গে খুব অল্প লোকই পরিচিত, সেজন্য কৈফিয়ত দিয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

শীলা বলল: কিন্তু আমাকে এ কথা বললে আমি মানব না। তুমি মানবে কি?

বলে শীলা অনিমেষের দিকে তাকাল। কিন্তু অনিমেষ কোন উত্তর দিল না।

মিস্টার বোস স্টেশনের বাহিরে যেতে যেতে বললেন: এমন আগ্‌লি ট্রেন তোমরা সিলেক্ট কর যে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার উপায় নেই। দিল্লী এক্সপ্রেসে এলেই পারতে!

অনিমেষ এ কথার উত্তর দিল, বলল: আপনার শ্যালিকাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করুন। তার নাকি সন্ধ্যে বেলাতেই ঘুম পায়।

মিস্টার বোস তাঁর মোটর গাড়ি নিয়ে স্টেশনে এসেছিলেন। মালপত্র গাড়িতে তোলা হল। শীলার দিদি সামনে বসলেন তাঁর স্বামীর পাশে। আমরা তিনজন পিছনে বসলুম।

গাড়ি চালাতে চালাতে মিস্টার বোস বললেন: ব্রাদারকে আজ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে!

শীলা বলল: বন্ধুকে দেখে ভয় পেয়ে গেছেন। এক সঙ্গে পড়াশুনা করেছিলেন কিনা, ভাবছেন যে লেখক বন্ধু হয়তো এ সব কথা লিখেই দেবেন।

সে অভ্যেসও ওঁর আছে নাকি!

বলে শীলার দিদি পিছন ফিরে তাকালেন।

উৎসাহ পেয়ে শীলা বলল: সাংঘাতিক অভ্যেস। গত বছর পূজোর সময় আমরা রাজস্থানে গিয়েছিলাম তো। আজমীরের ধর্মশালায় এক বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। কী নাম ডাক্তারবাবুর?

বলে অনিমেষের দিকে তাকাল।

অনিমেষ সংক্ষেপে বলল: ডাক্তার বোস।

শীলা বলল: হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কী সুন্দর ব্যবহার তাঁদের, কত যত্ন করলেন আমাদের। কিন্তু কী বললেন জান দিদি! গোপালবাবুর বই আনেন নি সঙ্গে? ছি ছি, করেছেন কি! গোপালবাবুর বই না পড়লে কি রাজস্থান দেখা সম্পূর্ণ হয়!

বাধা দিয়ে আমি বললুম: ভদ্রলোকের ওই একটি দোষ, সবার কাছেই অমনি করে বাড়িয়ে বলেন।

শীলা আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না, বলল: বাড়ি এসে পড়লাম গোপালবাবুর বই। আমাদের লাইব্রেরিতেই ছিল। ডাক্তার বোসের সব কথা তাতে আছে। তুমি পড় নি দিদি!

আমি জানি, এঁরা আমার নাম শোনেন নি। কিন্তু শীলার দিদি বললেন: এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

বাড়ি এঁদের বেশি দূরে নয়। বড় রাস্তার ধারেই একখানা সুন্দর বাড়ি, সামনে ফুলের বাগান। গেট খুলে ভিতরে ঢুকতে হল। ভোরের আলোয় পৃথিবী তখন ঝকঝক করছে।

গাড়ি থেকে নেমে শীলার দিদি আমাকে বললেন: একটা সুখবর আছে ভাই, দুদিন ওঁর ছুটি।

এই ভাই সম্বোধনটি আমার ভারি ভাল লাগল। বললুম: সে আমারই সৌভাগ্য দিদি, দশাশ্বমেধ ঘাটের বদলে—

বাধা দিয়ে মিস্টার বোস তাঁর স্ত্রীকে বললেন: রাজসূয়ের ব্যবস্থা কর। কিন্তু বাড়িতে নয়, কোন ভাল জায়গায় বসতে হবে।

শীলার দিদি বললেন: পাটনায় আর ভাল জায়গা কোথায়!

শীলা বলল: তবে পাটনার বাহিরে চলুন।

অনিমেষ বলল: রাজগির আর নালন্দা বারে বারে ভাল লাগে না।

শীলা আমাকে জিজ্ঞাসা করল: রাজগির ও নালন্দা আপনি দেখেছেন গোপালবাবু?

বললুম: দেখেছি।

তবে অন্য কোথাও চলুন।

বলে শীলা মিস্টার বোসের মুখের দিকে তাকাল।

মিস্টার বোস এগিয়ে গিয়েছিলেন বসবার ঘরের দিকে। চলতে চলতেই বললেন: বসে থাকবার কি উপায় আছে! কোথাও যেতেই হবে।

মুখ হাত ধুয়ে আমি যখন বসবার ঘরে ফিরে এলুম, তখনও কেউ ফিরে আসেন নি। একা ঘরে আমি বসলুম না, আমি বেরিয়ে গেলুম বাহিরেব বাগানে। সুন্দর সাজানো বাগান, চারিদিক ঘিরে নানা জাতের ফুলেব গাছ। কিন্তু ফুল বেশি দেখলুম না। ফুলেব সময় এ নয়।

সহসা আমার মিস্টার বোসেব দিকে নজর পড়ল। একটুখানি আড়ালে একটা মোড়ায় বসে ছোট ছোট চারাগাছ নিয়ে তিনি কিছু করছেন। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে বললেন: আসুন গোপালবাবু, আপনার অপেক্ষাই আমি করছিলুম।

আমি এগিয়ে এসে বললুম: গুণী লোক আপনি, পায়ের শব্দেই মানুষ চেনেন দেখছি!

মিস্টার বোস বললেন: আপনি উঁচু দরের শিল্পী। আপনি এসেছেন ফুলের সৌরভে, যে ফুল এখনও ফোটে নি, আর ফুটলেও যার কোন গন্ধ নেই।

অসংখ্য ছোট ছোট টবে ভদ্রলোক চন্দ্রমল্লিকার চারা ধরেছেন। প্রত্যেকটি টবের গায়ে রঙীন চকে নম্বর লেখা আছে। ভদ্রলোক একটি একটি করে টব তুলে পরীক্ষা করে নামিয়ে রাখছিলেন। একজন বুড়ো মালী পাশে বসে তাঁকে সাহায্য করছিল। ভদ্রলোকের কথার উত্তরে আমি হেসে বললুম: ফুলের সৌরভ আমি পাই নি, পেয়েছি একটা মনের সৌরভ।

চন্দ্রমল্লিকার চারা দেখতে দেখতে আমার এলাহাবাদের জ্ঞানশঙ্করবাবুর কথা মনে পড়ল। কত অসংখ্য জাতের চন্দ্রমল্লিকা দেখেছি তাঁর কাছে, কত বিচিত্র তাদের নাম। হিসেব করে দেখলুম যে চারা লাগাবার এই সময়, সময় মতোই কাটিং ধরা হয়েছে, আর কয়েকদিন পরে ফাইনাল পটিং করা হবে। বাঙলা দেশের চেয়ে শীত এ দিকে আগে পড়ে। কাজেই সেপ্টেম্বরেই ফাইনাল পটিং করা চলবে। অনেকগুলি চারাও যেন আমার চেনা মনে হল। একই জাতের চারা তিনি অনেক ধরেছেন।

মিস্টার বোস আমার কথার উত্তর দিলেন না, বললেন: কেমন দেখছেন?

বললুম: আপনি টার্নারের ভক্ত দেখছি!

ভদ্রলোকের দেহে যেন আগুনের ছ্যাকা লাগল। সহসা সোজা হয়ে বসে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি হাসলুম তাঁর ভঙ্গি দেখে।

একটা মুহূর্ত ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন: ক্রিসান্থিমাম আপনি পাতা দেখে চেনেন!

লজ্জিত ভাবে আমি বললুম: দু-একটা জাত চিনি। তাও অনেক সময় ভুল হয়ে যায়।

মিস্টার বোস বললেন: সব জাত চেনেন, এমন লোক দুনিয়ায় নেই।

তারপরেই ভদ্রলোক আমাকে আর এক ধারে টেনে নিয়ে গেলেন। বললেন: এই চারাগুলো দেখুন তো। কলকাতা থেকে এবারে আনিয়েছি। আপনার চেনা গাছ কিছু আছে?

আমার একটি গোল জাতের পাতা চেনা বলে মনে হল। বললুম: এটা কি গ্রীন সেন্‌সেসন?

ভদ্রলোক তাঁর নোট বই খুলে পটের নম্বরের সঙ্গে গাছের নাম

মিলিয়েই লাফিয়ে উঠলেন, বললেন : আপনার পায়ের ধুলো দিন গোপালবাবু, অনেক ভাগ্য করে আপনার দেখা পেয়েছি।

বললুম : আমাকে লজ্জা দেবেন না। ফুলের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার সামান্যই।

মিস্টার বোস বললেন : আপনি নিশ্চয়ই নিজের হাতে ফুল করেন!

বললুম : না। সে সুযোগ নেই, সময়ও নেই। কলকাতার অ্যাসেমব্লি হাউসে ক্রিসান্থিমাম শো দেখেছি, আর কিছু দিন আগে এলাহাবাদে দেখেছি একজনের বাড়িতে। এই পর্যন্তই আমার বিদ্যা।

ভদ্রলোক নতুন চারার নামগুলি আমাকে পড়ে শোনালেন—গ্রীন গডেস, সারপ্রাইজ ডি অর্সি, জে. সি. হ্যাপগুড, বেটি বার্নেস, মেলিন।

তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন : এ সব ফুল আপনি দেখেছেন?

আমি হাসলুম।

ভদ্রলোক বললেন, কেমন ফুল?

বললুম : ফুল সবই ভাল। তবে এর চেয়েও ভাল ফুল আজকাল চলছে।

পেনসিল—

বলে মিস্টার বোস মালীর দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : জে. এস. লয়েড বাতিল করে মার্ক উলম্যান করুন, লুইসা পকেট ফেলে দিয়ে আনুন ইমপ্রুভ্‌ড্‌ লুইসা, আলফ্রেড সিম্পসনের মতো অদ্ভুত ভাবে পাপড়ি ছড়াবে। আনুন মেনডন, পিটার মে। গ্রীন সেন্‌সেসন ভাল লাগলে বিধান্‌স্‌ বেস্ট আর যুবরাণী করুন। একেবারে নতুন ধরনের ফুল।

মালীর হাত থেকে পেনসিল নিয়ে নামগুলো মিস্টার বোস খসখস করে লিখে নিলেন। বললেন : এই সিজ্‌নেই আমি আনিয়ে নিচ্ছি।

ভদ্রলোক এবারে ঘুরে ঘুরে তাঁর বাগান দেখালেন। শুধু চন্দ্রমল্লিকা নয়, সব রকম ফুলের শখই আছে। নানা জাতের ম্যাগনোলিয়া রেখেছেন, গ্রাণ্ডিফ্লোরা পুমিলা ফস্কেটা মিউটাবিলিস। সিকিম থেকে ক্যামেলিয়া এনেছেন তিন রঙের—সাদা গোলাপী আর লাল। ছোট গাছ, ফুল এখনও ফোটে নি। টবে জিরেনিয়াম জার্বেরা আর বিগোনিয়া করেছেন অনেক রকমের। বললেন: পাহাড়ী বিগোনিয়া আর গ্লক্সিনিয়া কিছুতেই করতে পারছি না, গাছ আনালেই মরে যায়।

বললুম: গাছ নয়, বাল্ব আনুন দার্জিলিঙ বা সিকিম থেকে। কড়া শীতে নিশ্চয়ই ফুল ফুটবে।

এখন বাল্ব পাওয়া যাবে?

বোধ হয় না। পাহাড়ে এখন ফুল ফুটতে শুরু করেছে।

দেখেছেন আপনি?

বললুম: পাহাড়ে দেখি নি, দেখেছি কলকাতায়। আমার এক বন্ধু পুজোর সময় নৈনিতাল থেকে একটা গাছ এনেছিলেন ফুলশুদ্ধ। সে গোলাপ, না ক্যামেলিয়া, না বিগোনিয়া না বলে দিলে বোঝা মুশকিল।

ঠিক এই সময়ে শীলার দিদি এলেন আমাদের ডাকতে। বললেন: ওমা, তোমরা এইখানে! গোপালবাবুকে শীলা রাস্তায় খুঁজতে বেরিয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে মিস্টার বোস বললেন: রাস্তায় কেন!

ঘরের চেয়ে পথ নাকি ওঁর বেশি প্রিয়।

তবে ওঁকে পথেই বার করছি।

বলে হাসতে হাসতে মিস্টার বোস ঘরের দিকে চললেন।

১৪

মিস্টার বোস আমাদের ঘরে বসে থাকতে দিলেন না, এক রকম জোর করেই পথে বার করলেন। বললেন ঃ দুটো দিন সময় দেখতে দেখতেই কেটে যাবে, ঘরে বসে নষ্ট করলে চলবে কেন!

চায়ের টেবিলে বসেই তিনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন কলকাতার এক নার্সারিতে। যে নামগুলো আমি দিয়েছিলুম, সেই চারাগুলি চাই। তাঁর অনুরোধে আরও কিছু নতুন নাম দিয়েছিলুম—ভেরা উলম্যান পোতালা বিউটি সমঝানা কমল। পমপন ও অ্যানিমোন ভ্যারাইটিরও নাম দিয়েছিলুম। সেই সঙ্গে ভদ্রলোক একটা কাগজের টুকরোয় কিছু লিখে তাঁর মুনশীর হাতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ ফিরে এসেই চাই।

শীলাদের তৈরি হবার জন্য কিছু সময় দিয়ে ভদ্রলোক আমাকে আবার এনেছিলেন বাগানে। বলেছিলেন ঃ ক্রিসান্থিমামের কালচার সম্বন্ধে কিছু বলুন।

লজ্জিত ভাবে আমি বলেছিলুম ঃ আপনি আমাকে—

ঠিকই চিনেছি। মানুষ চিনতে আমাদের দেরি হয় না।

বলে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কতকটা বাধ্য হয়েই আমি যা জানি তা বললুম। চন্দ্রমল্লিকার ফুলের মতো গাছটিও মূল্যবান। সে গাছ যাতে বেয়াড়া ভাবে বেড়ে না ওঠে সেদিকে প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। গাছের জন্য কাঠির দরকার হবে না, কাঠি লাগবে বিরাট একটা ফুলকে সোজা রাখবার জন্য। ছোট গাছের শক্ত ডাঁটা নিচে থেকে উপর পর্যন্ত সতেজ সবুজ পাতায় ঢাকা থাকবে। তার জন্যেই সারা বছর সতর্ক থাকতে হয়।

শীতের শেষে নতুন মাদার তৈরির কথা থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ফাইনাল পটিং পর্যন্ত পরিচর্যার কথা তাঁকে আমি সংক্ষেপে বললুম। ভদ্রলোক অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সব শুনে নিয়ে বললেন : টুকে রাখব সব কথা, তা না হলে মনে থাকবে না।

কয়েকটি চারার পাতা হলদে দেখাচ্ছিল, বললুম : একটুখানি চুনের জল দেবেন এই গাছগুলোতে। আর সব গাছ প্রতিদিন স্নান করাবেন।

দু-একটি গাছের পাতায় পোকার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। বললুম : হপ্তায় একবার ফলিডল দেবেন স্প্রে করে, সব গাছেই দেবেন।

ভদ্রলোক বললেন : ফলিডল কি এখানে পাব?

ফলিডল না পেলে ডিলড্রিন-ইলড্রিন কিছু একটা পাবেন। আর তাও না পেলে গায়ে মাখা সাবানের কুচি জলে গুলে তাই দিয়েই স্নান করিয়ে দেবেন। শিশুর মতো সারাক্ষণ এদের যত্ন চাই।

শীলা আর অনিমেষ বেরবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু শীলার দিদি আসেন নি। মিস্টার বোস ব্যাপারটা বুঝতে পেরে-ছিলেন, বললেন : দিদি বুঝি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনে মেতেছেন!

শীলা বলল : কিছুতেই তাঁকে টেনে বার করতে পারলাম না।

মিস্টার বোস তাঁর গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন : কেউই পারে না। কেউ যদি কোন দিন পারে তো আমি তাঁর পায়ের ধুলো নেব।

শীলা উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠল : তাহলে বোধ হয় গোপাল-বাবুর পায়ের ধুলো আপনাকে নিতে হবে। চেষ্টা করলে উনি পারেন না এমন কাজ নেই।

এ কথার প্রতিবাদ করবার সময় আমি পেলুম না। তার আগেই গাড়ির দরজা খুলে মিস্টার বোস আমাকে সামনের সীটে তুলে দিলেন। বললেন : তার প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি।

অনিমেষকে এখন আর বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছে না। মিস্টার

বোসের মন্তব্যটুকু উপভোগ করল বলে মনে হল। মিস্টার বোস তাদের পিছনের সীটে তুলে দিয়ে নিজে গাড়ি চালাতে বসলেন। পাটনার প্রশস্ত রাজপথে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

আধুনিক পাটনার সম্বন্ধে আমার সত্যিই কোন কৌতূহল ছিল না। কিন্তু প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে শুনেই কৌতূহলী হয়েছি। ভারতের অতীত ছিল ঐশ্বর্যে ভরা। সেই ঐশ্বর্যের খণ্ড খণ্ড কাহিনী পড়েছি বিদেশী পর্যটকদের লেখায়। এ যুগের সভ্য জগৎ আমাদের অতীতকে অস্বীকার করতে চায়। আমাদের বর্তমান যদি গৌরবের হত, তাহলে এ সুযোগ তারা পেত না। মাটির উপরের দারিদ্র্য ঢাকবার জন্য আমরা এখন মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন বার করছি।

বিদেশীরা বলে যে ভারতে আর্যসভ্যতা এসেছিল পশ্চিম থেকে পূর্বে। সে হল খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগের কথা। আর্যরা খাইবার ও মালাকান্দ গিরিদ্বার পেরিয়ে গোমল ও কুরম নদীর উপত্যকা দিয়ে ভারতের গান্ধার ও সপ্তসিন্ধবে এসে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। পশ্চিমে সুলেমান পর্বতমালা উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ উত্তর পূর্বে হিমালয় আর দক্ষিণে সরস্বতী নদী। পুরুষপুর ও তক্ষশীলায় আর্যসভ্যতা দানা বেঁধেছে। আনুমানিক বারোশো খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আর্যরা সরস্বতী নদী পেরিয়ে ব্রহ্মাবর্তে পৌঁছলেন। নূতন ঘাঁটি হল কুরুক্ষেত্র ও থানেশ্বর। মধ্যদেশ জয় করতে আরও দু-তিনশো বছর সময় লাগল। কুরু শূরসেন কোশল দেশ। নূতন করে উপনিবেশ গড়ে উঠল ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর মথুরা শ্রাবস্তী কনৌজ অযোধ্যা কৌশাম্বী প্রয়াগ ও কাশীতে। চতুর্থ অবস্থা ধরা যেতে পারে আটশো থেকে তিনশো খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। বিদিশা ও উজ্জয়িনী নূতন আলোকে উজ্জ্বল হল। পূর্ব দেশে বিদেহ মগধ অঙ্গ ও বঙ্গ। প্রধান উপনিবেশ হল বৈশালী রাজগৃহ ও চম্পায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে আমাদের পুরাণ গ্রন্থে এই হিসাবের সমর্থন নেই। কলির কেটেছে মাত্র পাঁচ হাজার বছর, তার আগে দ্বাপর যুগ ছিল বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বছর। ত্রেতায় রামায়ণের কাল, ভারতীয় সভ্যতা তখন উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। তারও আগে সত্যযুগে সভ্যতার সম্পূর্ণ স্ফুরণ হয়েছিল। তবে কি কৃষ্ণ আর্য ছিলেন না, না রামচন্দ্র ছিলেন অনার্য রাজা! পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের বিরোধ এইখানে। তবে শাস্ত্রপ্রমাণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে সময় আমরা নির্ধারণ করেছি, ইতিহাসেও তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া চলে। পরীক্ষিতের জন্ম থেকে খ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ হল চোদ্দ শো তিরিশ বছর। পরীক্ষিতের জন্ম হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়। কাজেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল হল ১৪৩০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ, অর্থাৎ প্রায় চৌত্রিশ শো বছর আগে। এই কথা মেনে নিলে ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের বিরোধ অনেক পরিমাণে মিটে যায়। অন্তত মহাভারতের যুগে আর্যদের প্রাধান্য দেখা যায়, অনার্যদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের গল্পও মিলে যায়। প্রশ্ন থাকে সত্য ও ত্রেতা যুগ নিয়ে। এই সব যুগের পরিমাণ দীর্ঘ না হয়ে স্বল্প হলে কি রামায়ণের কালকেও ঐতিহাসিক বলে মেনে নেওয়া যায় না!

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতের কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় ও তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন ইন্দ্রপ্রস্থে, কিন্তু সম্রাট বলে সম্মান তাঁরা পান নি। নানা পুরাণে সমসাময়িক ভারতের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখি যে দেশ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কোশল বিদেহ কাশী প্রয়াগ কুরু পাঞ্চাল বিরাট মথুরা মগধ কনৌজ অবন্তী উজ্জয়িনী মালব পুণ্ড্রবর্ধন কামরূপ উৎকল কলিঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ। দক্ষিণ-ভারতেও ছিল অনেক রাজ্য।

ইতিহাসে আমরা দুটি পরাক্রান্ত রাজ্য দেখি। কোশল ও

মগধ। মগধ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম জানি না, তবে মহাভারতের যুগে বৃহদ্রথ ছিলেন মগধের রাজা। গিরিব্রজে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বিখ্যাত জরাসন্ধ তাঁর পুত্র, মধ্যম পাণ্ডব ভীম তাঁকে বধ করেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের মৃত্যু হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে। তারপর মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন সহদেব-নন্দন সোমাধি, মতান্তরে সোমাপি। জরাসন্ধ বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয় অরিঞ্জয়। তাঁরই মন্ত্রী ছিলেন স্ুনীক বা মুনিক। রাজাকে হত্যা করে এই মন্ত্রী নিজের পুত্র প্রদ্যোৎকে সিংহাসনে বসান। শিশুনাগ বোধ হয় এই রাজারই নাম। জরাসন্ধের পর আটাশজন রাজার পর শিশুনাগ বংশের দশজন রাজা রাজত্ব করেন। তারপর মহাপদ্ম নন্দ। ইনি আমাদের ঐতিহাসিক রাজা, মেগাস্থিনিসের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাঁর পরিচয় আছে।

শিশুনাগ বংশেই জন্ম হয়েছিল বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর। বিম্বিসারের নাম এক এক পুরাণে এক এক রকম। বিষ্ণুপুরাণে তিনি বিম্বিসার, বায়ুপুরাণে বিবিসার, অন্যত্র তিনি বিন্দুসার নামে পরিচিত। যে শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে, বিম্বিসার তার পঞ্চম রাজা। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী কোশল দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর জন্ম হয়েছিল অন্য রাণীর গর্ভে। বার্ধক্যে বিম্বিসার অজাতশত্রুর হাতে রাজ্যভার দিয়েছিলেন।

রাজা বিম্বিসারের আমলেই মগধের রাজধানী গিরিব্রজ থেকে রাজগৃহে স্থানান্তরিত হয়। মিথিলার বিদেহ ক্ষত্রিয়রা তখন বারে বারে মগধ আক্রমণ করত। তাদের আক্রমণ থেকে রাজধানী রক্ষার জন্যই বিম্বিসার রাজগৃহে যান। গঙ্গা ও হিরণ্যবাহু নদীর সঙ্গমে এই নগরকে তিনি দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত করেছিলেন। হিরণ্যবাহু শোন নদের প্রাচীন নাম। গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমে এখন রাজগৃহ নেই। যে রাজগিরকে আমরা রাজগৃহ মনে করি, সে গিরিব্রজেরই

গায়ে লাগা, গঙ্গা ও শোন থেকে তার দূরত্ব অনেক। একদা এই সঙ্গমের নিকটে ছিল পাটলি গ্রাম। বুদ্ধদেব যখন শেষবার রাজগৃহ থেকে বৈশালীতে যান, তখন তিনি অজাতশত্রুর দুই মন্ত্রীকে এই পাটলি গ্রামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণে ব্যস্ত থাকতে দেখেন। ব্রিজিবাসী উজ্জিহানদের আক্রমণ রোধেই এই দুর্গ নির্মিত হচ্ছিল। বুদ্ধদেব সব দেখে শুনে বলেছিলেন, এই গ্রাম একদিন সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হবে।

এই গল্প আছে বৌদ্ধগ্রন্থে। এর থেকেই মনে হয়, বর্তমান রাজগিরই প্রাচীন রাজগৃহ, আর অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ের আমলে পাটলি গ্রাম হয়েছিল পাটলিপুত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক রাজাই আজ ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গেছেন। কিন্তু বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। এঁরা বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন, এবং তাঁরই সংস্পর্শে এসে অমর হয়েছেন। বিম্বিসার শাক্ত ছিলেন এবং পরিণত বয়সে বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হন। বুদ্ধ যখন রাজগৃহের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন, তখন রাজা তাঁর কাছে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

পরম প্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাত্তে
অবচিষু চ মাগধরাজ বোধিসত্ত্বম্।
ভবহি মম সহায়ু সর্বরাজ্যং
অনুভব দাস্যে প্রভূতং ভুঙ্‌ক্ষ্ব কামান্॥

কিন্তু রাজা হয়ে তাঁর পুত্র অজাতশত্রু
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে।

ইতিহাস বলে, তিনি নিজের পিতা বিম্বিসারকেও হত্যা করেছিলেন, আর তাঁর মা কোশল দেবী স্বামীর শোকে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। এই সংবাদ যখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের কানে পৌঁছল, তিনি ক্ষেপে গেলেন। বোনের বিবাহে কাশী রাজ্যের

একখানি গ্রামে তিনি যৌতুক দিয়েছিলেন, প্রথমে সেইখানিই তিনি অধিকার করে নিলেন। তারপর যুদ্ধ বাধল। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পরে শান্তি স্থাপিত হয়। প্রসেনজিৎ অজাতশক্রর সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়ে সেই গ্রামখানি ফিরিয়ে দেন। গৌরব বাড়ে মগধের।

পরবর্তী কালে অজাতশক্রকে আমরা অন্য রূপে দেখি। কুশীনগরে বুদ্ধের নির্বাণের পর অজাতশক্রর দূত এসে বলছে : রাজা বলেছেন, ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়। আমিও তাঁর শরীরের এক অংশের অধিকারী। আমি তাঁর অস্থির এক অংশ পেলে তার উপর মহাস্তূপ নির্মাণ করব।

অজাতশক্রর পর এই বংশের চারজন রাজা পর পর রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় রাজা উদয় মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করলেন। আর শেষ দুজন রাজা নন্দীবর্ধন ও মহানন্দী মগধের সীমা আরও বাড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্যরক্ষা করতে পারেন নি। শূদ্ররাজা মহাপদ্ম নন্দ এসে মগধ জয় করেন। নন্দ ঐতিহাসিক রাজা, অথচ নানা পুরাণে তাঁর উল্লেখ আছে। নন্দবংশের আটজন রাজা পর পর রাজত্ব করেছিলেন এবং গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁদের শেষ রাজা মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সহসা মিস্টার বোস আমার অন্যমনস্কতা ভেঙে দিলেন, বললেন : কারও মুখে কথা নেই কেন ?

এই প্রশ্নটি করবার সময় বাঁ হাতে তাঁর চুরটটা সরাতে হয়েছিল ঠোঁট থেকে। সেটি তিনি চাইছিলেন না বলেই বোধ হয় নিজে চুপ করে ছিলেন।

পিছন থেকে শীলা বলে উঠল : গোপালবাবু নিশ্চয়ই ইতিহাসের কথা ভাবছিলেন।

মিস্টার বোস বললেন : ইন্টারেস্টেড ইন্ হিস্ট্রি !

আর্ট আর্কিটেক্চার অ্যানথ্রপলজি অ্যাণ্ড হোয়াট্ নট্।

বলে শীলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কেন জানি না আমার স্বাতির কথা মনে পড়ল। আমাকে নীরব থাকতে দেখলে সেও বলত যে আমি ইতিহাসের কথা ভাবছি। সত্যিই তাই। কোন নতুন জায়গায় এলে প্রথমেই আমার ইতিহাসের কথা মনে আসে, মনে আসে রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণের কথা। প্রাচীন কিছু দেখবার না থাকলে আমার কৌতূহলও হয় অন্তর্হিত। আমি তাই শীলার কথার কোন প্রতিবাদ করলুম না।

মিস্টার বোস বললেন : ঠিক আছে। আজ আমাদের পিকনিক হবে কুম্‌হ্রারে। সম্রাট অশোক যে প্রাসাদে বাস করতেন তারই সংলগ্ন বাগানে বসে আমরা শাক-চচ্চড়ি খাব।

এতক্ষণ পরে অনিমেষ প্রথম কথা কইল, বলল : সে আবার কোথায় ?

মিস্টার বোস বললেন : সে এই পাটনাতেই ব্রাদার, তার জন্যে দূরে যেতে হবে না।

শীলা বলল : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

পাটনা শহরে এলে লোকে যা দেখে তাই দেখতে। সেক্রেটারিয়েট গোলঘর গান্ধী ময়দান।

তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন : কিছু মনে করবেন না ভাই গোপালবাবু, আপনার অনুরাগের কথা যখন জেনেছি, তখন আপনার পছন্দমতো জায়গাতেও নিয়ে যাব।

বলে আবার বাঁ হাতের চুরটটা ঠোঁটে পুরলেন।

২৫

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পাটনা শহর পূর্ব-পশ্চিমে দশ মাইল বিস্তৃত। এই শহরকে এখন তিন ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। এই তিনটি ভাগ একের পরে এক গড়ে উঠেছে এবং না বলে দিলেও বোঝা যায় যে এরা এক সময়ে গড়ে ওঠে নি। ট্রেনে আসবার সময় প্রথমে আমরা পাটনা সিটি স্টেশনে থেমেছিলুম। এই অঞ্চল শের শাহর তৈরি। গুলজারবাগ নামে একটি স্টেশনে আমরা দাঁড়াই নি, সোজা এসে দাঁড়িয়েছিলুম পাটনা জংসন স্টেশনে। ব্রিটিশ আমলে এখানেই একটা নতুন শহর গড়ে উঠেছিল, তার নাম বাঁকিপুর। তারপর ফুলওয়ারি-শরিফ নামে আর একটা ছোট স্টেশনে সব ট্রেন দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় দানাপুরে। দানাপুরে মিলিটারি ক্যাণ্টনমেণ্ট আছে, আর আছে রেলের ডিভিশনাল অফিস। ভাল রাস্তা দিয়ে দানাপুর পাটনার সঙ্গে যুক্ত। আর এই পথের ধারেই বিহারের নূতন রাজধানী গড়ে উঠেছে। নূতন রাজধানী এলাকা আর বাঁকিপুরের মাঝখানে প্রশস্ত গান্ধী ময়দান এখন পাটনার জনপ্রিয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

মিস্টার বোসের বাড়ি কদমকুঁয়া অঞ্চলে। এটি একটি জনবহুল পুরনো পল্লী। অনেক পুরনো পরিবারের বাস এখানে। স্টেশনের অপর পারে গর্দানিবাগ নামে আর একটি পুরনো পল্লী আছে। সেদিকে আমরা গেলুম না। মিস্টার বোস স্টেশনের দিকে আসছিলেন, কিন্তু স্টেশনের দিকে না ফিরে সোজা এগিয়ে গেলেন নূতন রাজধানীর দিকে। স্টেশনের কাছাকাছি অঞ্চলটা ছোট বড় দোকানপাটে জমজমাট হয়ে উঠেছে। মিস্টার বোস আমাদের সব কিছু চিনিয়ে দিলেন। স্টেশন থেকে বেরিয়ে যে পথটা গান্ধী ময়দানের দিকে গেছে, তার নাম ফ্রেজার রোড। এই পথ

পেরোবার আগে বাঁ হাতে একটি সুদৃশ্য দোকান এলাকা আছে, অনেকে তাকে নভেলটি মার্কেট বলে। এই নামটি তত পরিচিত নয়, কিন্তু তার পরেই নিউ মার্কেটটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একেবারে স্টেশনের গা ঘেঁষে এই বাজার, প্রায় সব জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। এই বাজার ছাড়িয়ে আরও কিছু পশ্চিমে গেলে নূতন রাজধানী।

হার্ডিঞ্জ পার্ক নামে একটি বাগানের পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলুম। পুরনো সেক্রেটারিয়েট দেখলুম। এমন কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নয়, কোন বৈশিষ্ট্যও নেই। শুধু একটি ঘণ্টাঘর বেয়াড়া ভাবে মাথা উঁচিয়ে আছে। উত্তর ভারতের অনেক শহরের চকে এই রকমের ঘণ্টাঘর দেখেছি। সরকারী অফিসেও ঘড়ি দেখেছি, কিন্তু ঠিক এ রকমটি কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। নূতন সেক্রেটারিয়েট এখান থেকে কিছু দূরে। অনেক বড় বাড়ি, অনেকটা এলাকা জুড়ে সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান। এ সবই যে হাল আমলে তৈরি, তাতে আমার সন্দেহ হল না।

রাজভবন হাইকোর্ট অ্যাসেমব্লি ও কাউন্সিল হাউসও দেখলুম। পাটনার যাদুঘরও এই অঞ্চলে। একটি বড় ও সুন্দর বাড়ির ভিতরে এই যাদুঘর। আমরা দূর থেকেই এই বাড়িটি দেখলুম। মিস্টার বোস আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ দেখবেন ভিতরটা ?

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমিও একটা প্রশ্ন করলুম ঃ না দেখলে কি হারাব অনেক কিছু ?

মিস্টার বোস বললেন ঃ আমিও ভিতরে যাই নি, তবে শুনেছি যে ঐতিহাসিক অনেক জিনিস আছে—মৌর্য যুগের স্মৃতিচিহ্ন, কিছু মুদ্রা ও ব্রোঞ্জের মূর্তি, তিব্বতী ব্যানার, ফার্সী পুঁথি ও ভারতীয় চিত্রকলার কিছু নমুনা। দেখবেন ?

বলে মিস্টার বোস গাড়ি থামাচ্ছিলেন। আমি বললুম ঃ দেখতে চাইলেও এখন বোধ হয় খোলা পাওয়া যাবে না।

মিস্টার বোস তাঁর হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন : ঠিক বলেছেন।

পিছন থেকে শীলা প্রশ্ন করল : এই বাড়ির বাইরেটার সম্বন্ধে কিছু বলবেন না ?

মিস্টার বোস বললেন : এই রাস্তার নাম বুদ্ধমার্গ আর বাড়ির নাম পাটনা মিউজিয়াম। এর বেশি আমি বলতে পারব না।

সহসা অনিমেষ বলে উঠল : তুই বল্ না!

খুশী হয়ে শীলা বলল : পাটনায় এক একটি বাড়ির স্টাইলই তো জানতে ইচ্ছা করে।

আমি বললুম : আমি তো আর্কিটেক্ট নই।

অবিলম্বে শীলা বলল : আপনি কিছুই নন, কিন্তু সবই বলতে পারেন।

এ পরিহাস না প্রশংসা তা বুঝতে পারলুম না। তবু বললুম : এ মোগল স্থাপত্য নয়, রাজপুত শৈলীও একে বলা চলে না। দুয়ে মিলে এক নতুন শৈলী এ দেশে প্রচলিত হয়েছে। একে আজকাল মোগল-রাজপুত স্টাইল অব আর্কিটেকচার বলা হয়।

এইখান থেকে আমরা বাঁকিপুরের দিকে যেতুম। কিন্তু তার আগে শীলা বলে উঠল : গোপালবাবুকে মার্টার্স মেমোরিয়াল দেখালেন না জামাইবাবু ?

মিস্টার বোস বললেন : সে কি, পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সামনে দেখেন নি সেই স্ট্যাচু ?

বলেই আবার সেই দিকে চললেন।

সত্যিই একটি দেখবার মতো মেমোরিয়াল। উনিশ শো বিয়াল্লিশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সাতজন অহিংস সেনা তাদের প্রাণ দিয়েছিল, সেই শহীদদের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। নির্ভীক চিত্তে পতাকা হাতে চলেছে প্রথম জন, তার পিছনে আরও ছজন সেনা। কেউ দাঁড়িয়ে আছে বুক ফুলিয়ে, কেউ লুটিয়ে পড়েছে

গুলি খেয়ে। এ কালের উপযোগী একটি মেমোরিয়াল দেখে সত্যিই আমার ভাল লাগল।

মিস্টার বোস জিজ্ঞাসা করলেন: শিল্পীর নাম বলতে পারেন?

না।

আমাদের দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

নূতন রাজধানীর কথা উঠল এর পরে। মিস্টার বোস বললেন: ভুল করেও ভাববেন না যে এই নূতন রাজধানী আমরা গড়েছি। এও ইংরেজের কীর্তি। বাঙলা থেকে বিহারকে বিচ্ছিন্ন করার কাহিনী মনে আছে তো! উনিশ শো পাঁচের সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন!

সে তো আমাদের চোখের জলের কাহিনী। প্রাণ দিয়ে আমরা সেই নিষ্ঠুর অভিযান ঠেকাতে চেয়েছিলুম। কিন্তু পারি নি। ১৯১২ সনে বিহার ও উড়িষ্যা আলাদা হয়ে গিয়েছিল বাঙলা থেকে। বিহার কেঁদেছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু বুকের রক্ত আর চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল বাঙলার মাটি।

মিস্টার বোস বললেন: ১৯১২ সনেই এই নূতন রাজধানীর পত্তন হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে প্রয়োজন মতো।

এবারে যে আমরা গোলঘরের দিকে যাচ্ছি তা দূর থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম। সেই বিরাট আকারের গোলঘরটি খানিকটা দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলুম। এটিকে মৌচাকের আকারের বলা হয়, কিন্তু তাতে এই বস্তুটি ঠিক বোঝা যায় না। বরং একে একটি বৌদ্ধস্তূপের সঙ্গে তুলনা করলে বোধ হয় ভাল হয়। সাঁচীর স্তূপের সঙ্গে ছবিতে আমাদের পরিচয় আছে। এও একটি কারুকার্যবর্জিত গোলাকার বিরাট স্তূপ। সদর রাস্তা ছেড়ে আমরা গোলঘরের ধারে এসে দাঁড়ালুম।

এই রকমের একটা অদ্ভুত ধরনের বিরাট জিনিস দেখে প্রথমেই

এর ইতিহাস জানতে কৌতূহল হয়—কবে কে কা জন্যে এটি তৈরি করেছিলেন! এটি নির্মাণ করতে নিশ্চয়ই বহু টাকা ব্যয় হয়েছে। এখন এই স্তূপের মাথায় উঠে পাটনা শহর দেখা হয়, আর ভিতরে আছে শস্যের ভাণ্ডার। রেলিঙ দেওয়া ঘোরানো সিঁড়ি আছে এই স্তূপের মসৃণ দেহে। সেই সিঁড়ি দিয়ে অনেকে ওঠানামা কবছে।

গাড়ি থেকে নেমে আমি যখন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলুম, তখন গাড়ির ভিতরে বসেই মিস্টার বোস বললেন: এরও একটা ইতিহাস আছে গোপালবাবু, সেটা শুনে রাখতে পারেন। ১৭৮৬ সনে ক্যাপ্টেন জন গার্স্টিন ধান গম রাখবার জন্যে এই গোলা ঘরটি তৈরি করেছিলেন। উঁচু প্রায় একশো ফুট, উপরে উঠলে সমস্ত পাটনা শহরটা এক নজরে দেখতে পাবেন।

শীলা অনিমেষের হাত ধরে টেনেছিল, বলেছিল: নামো না, ওপরে একবার উঠি।

অনিমেষ কিন্তু বসে রইল, বলল: তোমরা ওঠ।

মিস্টার বোসও নামলেন না।

শীলা বলল: আসুন গোপালবাবু, আমরা উঠি। ওঁবা ভারি কুঁড়ে।

বলে তরতর করে শীলা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। একবার পিছন ফিরে বলল: তাড়াতাড়ি চলে আসুন, সকালের রোদ এখনও মিষ্টি আছে।

আমি কোন উত্তর দিলুম না, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলুম তার পিছনে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠতে উঠতে আমার অনেক দিনের পুরনো কথা মনে পড়ল। একদিন অন্ধকার রাতে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে আমি শীলাদের মাইথনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। অসহায় ভাবে অনিমেষ আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, আর শীলা ছিল নেপথ্যে। তার আগে অনিমেষের উৎসাহের অন্ত ছিল না, দুদিন ধরে সে আমাকে বিহারের সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলটা ঘুরিয়ে

দেখিয়েছিল। সেই অনিমেষকে আজ আর চেনা যাচ্ছে না, শীলাকেও না। অনিমেষ হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেছে, এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না। শীলাও হঠাৎ তার পুরনো সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলেছে, এও অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু কিছু একটা যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পিছন ফিরে আমি অনিমেষকে দেখবার চেষ্টা করলুম। সে কি অভিমান ভরে গাড়িতে বসে রইল! উপরে শীলাকেও দেখতে পেলুম না। তার মনে কি আজ কোন অনুতাপ দেখা দিয়েছে!

উপর থেকে শীলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম: এ কি, উঠতে পারছেন না নাকি! হাত ধরে টেনে তুলব?

আমি বললুম: টেনে কাউকে তোলা যায় না, ঠেলে নামানো যায়।

শীলা হেসে উঠল, বলল: তবে ঠেলেই আপনাকে ফেলে দিই!

একটু আগে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল যে উপর থেকে স্বাতি আমাকে ডাকছে। তাই আমি হেঁয়ালি করে উত্তর দিয়েছিলুম। স্বাতি হলে অন্যরকম জবাব দিত, হয়তো বলত, আর কি নামবার জায়গা আছে! স্বপ্নেও সে আমাকে নিচে নামতে দেবে না!

উপরে পৌঁছে দেখলুম, স্বাতি নয়, শীলা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাই জবাব দিলুম: আত্মরক্ষার জন্যে তাহলে—

বাধা দিয়ে শীলা বলল: নির্ভয়ে এবারে চারি দিকে চেয়ে দেখুন।

সত্যিই এ এক অদ্ভুত অপরূপ দৃশ্য। পূর্ব দিকে খানিকটা তফাতে এক উদার উন্মুক্ত ময়দান, প্রশস্ত পথ এটি বেষ্টন করে আছে। অন্য দিকে অদূরে স্ফীতবক্ষ গঙ্গা ধীর মন্থর গতিতে বয়ে যাচ্ছে। এই গঙ্গার ধারে ধারে কত সুদৃশ্য সৌধ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ময়দানের এক কোণা থেকে একটি পথ পূর্বদিকে চলে গেছে বহু

দূরে, তার দু ধারে ঘরবাড়ি দোকানপাটের যেন শেষ নেই। বুঝতে কষ্ট হল না যে ঐ অঞ্চলের নাম বাঁকিপুর, আর পথের শেষে পাওয়া যাবে শের শাহর পাটনা শহর।

শীলা বলল : পাটনায় বুঝি আপনি প্রথম এলেন ?

আমি বললুম : হ্যাঁ।

শীলা বলল : তাইতেই আপনার ভাল লাগছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : আপনার ভাল লাগে না ?

মুহূর্তে শীলা নিজেকে সামলে নিল, বলল : খুব ভাল লাগে।

একটু থেমে বলল : তাইতেই তো বেড়াতে এলাম।

আমার মনে হল যে শীলা অন্য কিছু ভাবছিল, আর যা ভাবছিল তা আমাকে বলল না। কিছুক্ষণ নীরবে থাকবার পরে নিঃশব্দে দুজনে নেমে এলুম। কিন্তু মাটিতে পা দেবার পরে শীলার আর এক রূপ দেখলুম। নাচের ভঙ্গিতে গাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল : বুঝলেন জামাইবাবু, খুব ভাল লেগেছে গোপালবাবুর। আসুন, উঠে পড়ুন শীগগির, আরও অনেক সুন্দর জায়গা দেখতে বাকি আছে।

বলে আমাকে মিস্টার বোসের পাশে তুলে দিয়ে নিজে বসল অনিমেষের পাশে।

গান্ধী ময়দানের পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলুম। ময়দানের এক ধারে কিছু অফিস ও আবাসগৃহ, অন্য ধারে অনেক বড় বড় বাড়ি, সিনেমা হোটেল দোকানপাট। তারপরেই বাঁকিপুরের প্রধান সড়ক অশোক রাজপথ। রাস্তার ডান দিকে নানা রকমের দোকানপাট, পাটনার বড়বাজার, নাম মুরাদপুর। আর বাঁ দিকের বড় বড় অট্টালিকা এক একটি মস্ত প্রতিষ্ঠান—লাইব্রেরি কলেজ হাসপাতাল প্রভৃতি। মিস্টার বোস আমাকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম শোনালেন, কিন্তু কোন্‌টা আগে আর কোন্‌টা পরে তা মনে রাখতে পারলুম না। একবার দেখে কারও মনে রাখা সম্ভব নয়।

লাইব্রেরি দেখলুম দুটো। সচ্চিদানন্দ সিংহ লাইব্রেরি ও খুদাবক্স খান ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরি। ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরি ইসলাম শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র, আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনেক মূল্যবান পুঁথি এখানে আছে। মোগল-বাদশাহদের হাতের লেখাও আছে। আর আছে কিছু রাজপুত ও মোগল শিল্প-কলার নমুনা।

বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন দেখে এখানে আশ্চর্য হতে হয়। একত্র এত স্কুল কলেজ আমি কোথাও দেখিনি। পথের ধারে দু মাইল এর বিস্তৃতি। মগধ মহিলা কলেজ বি-এন কলেজ সেণ্ট জোসেফ্‌স কনভেণ্ট ও গির্জা পাটনা কলেজ সায়েন্স কলেজ মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাঝে সিভিল আদালত রোড ট্রান্সপোর্টের অফিসও আছে। একটার পর একটা বাড়ি দেখিয়ে মিস্টার বোস আমাকে নামগুলো বলে গেলেন, কিন্তু আমি এদের নাম মনে রাখতে পারলুম না আরও একটা কারণে। মাঝখানে একটি ছেদ পড়েছিল। সহসা গাড়ির গতি কমিয়ে মিস্টার বোস বলেছিলেনঃ স্টীমার স্টেশন দেখেছেন ?

আমি বললুমঃ না।

তবে চলুন, মহেন্দ্র ঘাট স্টীমার স্টেশন আপনাকে দেখিয়ে আনি।

বলেই বাঁ হাতের একটা রাস্তা ধরেছিলেন।

আমি অনুমান করতে পেরেছিলুম যে গঙ্গার ঘাট খুব কাছেই হবে। যে সব প্রতিষ্ঠানের সামনে দিয়ে এলুম, তার পিছনেই হয়তো গঙ্গার প্রবাহ। দেখতে দেখতেই আমরা একটা প্রশস্ত জায়গায় এসে পৌঁছলুম। এবারে মিস্টার বোসই প্রথমে দরজা খুলে নেমে পড়লেন।

নামুন গোপালবাবু।

বলে শীলা অনিমেষের পরে নামল।

গঙ্গার ধারে একটি নূতন নির্মিত সুন্দর সৌধ। যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান টিকিট ঘর চা জল খাবারের দোকান। অশোক রাজপথের মোড় থেকে এই স্টেশন পর্যন্ত দোকানের শ্রেণী অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু যাত্রীদের বিশ্রামগৃহের নিচে দিয়ে একটুখানি এগোলেই চোখের সামনে পৃথিবীর অন্য রূপ উদ্ঘাটিত হবে। ঘাটের নিচে দিয়েই ভরা গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে। বর্ষাশেষের বৃষ্টি হয়েছে বন্ধ, কিন্তু জলের শেষ নেই। কূলে কূলে নদী বয়ে যাচ্ছে, ফুলে আছে মাঝখানে। ওপারে ঘন নীল আকাশের নিচে শ্যামল গাছের রেখা আকাশ ও জলের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।

আমি যখন মুগ্ধ হৃদয়ে এই মনোরম দৃশ্য দেখছিলুম তখন পাশে থেকে শীলা হঠাৎ বলে উঠল : খুব ভাল লাগছে না এই জায়গাটি !

নিঃশব্দে আমি তার কথা মেনে নিলুম।

মিস্টার বোস বললেন : গান্ধীঘাটের গঙ্গা তাহলে আরও ভাল লাগবে।

আমি হেসে বললুম : গঙ্গা তো ঘাটের নয়, গঙ্গারই ঘাট। একই গঙ্গার অনেক ঘাট।

মিস্টার বোস বললেন : এক এক ঘাটে তার এক এক রূপ।

শীলা বলল : এবারে তাহলে গান্ধীঘাটেই চলুন।

আমি বললুম : কিন্তু তার আগে মহেন্দ্র ঘাট নাম কেন হল সেই কথাটি জানা দরকার।

শীলা অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল। অনিমেষ বলল : নামের কি আবার ইতিহাস আছে ?

সব নামের না থাকলেও অনেক নামের আছে। যে পথ ধরে আমরা আসছিলুম তার নাম তো অশোক রাজপথ। একদা অশোকের রাজধানী ছিল এই পাটনায়। তখন শহরের নাম ছিল পাটলিপুত্র। মহেন্দ্র ছিলেন সম্রাট অশোকের পুত্র।

মিস্টার বোস বললেন : ঠিক বলেছেন। সেই মহেন্দ্রের নামেই

বোধ হয় মহেন্দ্র ঘাট হয়েছে। সামনে একটি মহল্লার নামও মহেন্দ্র। এদিকে বলে মহেন্দ্রু।

শীলা আশ্চর্য হয়ে বলল: সত্যি নাকি!

মিস্টার বোস বললেন: গান্ধী ময়দান নামেরও একটা ইতিহাস আছে। ওই ময়দানে আগে গোরা পল্টনের ছাউনি পড়ত, আর ঘোড়দৌড় হত মাঠে। তখন ওই মাঠের কী নাম ছিল জানি নে। কিন্তু ১৯৪৭ সনে গান্ধীজী যখন পাটনায় ছিলেন, তখন ওই মাঠে প্রার্থনা-সভা হত।

গঙ্গার ধার থেকে ফিরে এসে আমরা গাড়িতে বসলুম। আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়ে আমরা বাঁ দিকের আর একটা পথ ধরে গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছলুম। সামনে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গেট দেখেছিলুম, আমরা পাশে একটা জায়গায় এসে নামলুম। তারপর হেঁটে গেলুম গান্ধীঘাটে।

ছোট একটি বাগান। তেমন সুন্দর কোন ফুল পাতার গাছ নেই। কিন্তু গঙ্গার দৃশ্য সত্যিই সুন্দর। মহেন্দ্র ঘাটের চেয়েও সুন্দর মনে হল এই স্থানটি। পিছনে যে বিরাট সৌধটি দেখা যায়, সেইটিই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও গঙ্গার ধারে। কিন্তু পরিবেশ এমন সুন্দর কিনা আমার জানা নেই।

মিস্টার বোস বললেন: আর একটি নদী দেখুন সামনে। গণ্ডক এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। আর—

বলে পূর্ব দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর বলে উঠলেন: ওই দেখুন, একটা স্টীমার আসছে। ওই স্টীমার গঙ্গা পার হয়ে গণ্ডকের স্রোত ঠেলে এগিয়ে যাবে।

একটি বাঁধানো ঘাট গঙ্গার জল পর্যন্ত নেমে গেছে। জলের কাছে আমি এগিয়ে গেলুম। অনেক দূর দিয়ে নৌকো যাচ্ছিল একখানা, তার অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া। মনে হল, সত্যিই আমি এমন তরণী বাওয়া কখনও দেখি নি।

২৬

গান্ধা ঘাটে যাতায়াতের পথ একটি। একই পথে আমরা সদর রাস্তায় ফিরে এলুম। তারপরে অগ্রসর হলুম পাটনা সিটির দিকে। প্রশস্ত পথ এক সময় সঙ্কীর্ণ হল, ঘর বাড়ির চেহারা গেল পালটে। আমরা যে দু'তিন শতাব্দীর পুরনো একটা শহরে পৌঁছে গেলুম তা বুঝতে কষ্ট হল না। আমি এই কথা প্রকাশ করতেই শীলা আপত্তি করল, বলল: এ কথা আপনি জানেন বলেই বলছেন। তা না হলে শহর দেখে তা বোঝবার উপায় নেই।

কথাটা মিথ্যা নয়। পথ অপ্রশস্ত হয়েছে অল্পই, আর বাড়িগুলো একটার ঘাড়ে আর একটা উঠেছে। দু ধারে গলিঘুঁজিও দেখতে পাচ্ছি। সামান্য এই লক্ষণ থেকে শহরের প্রাচীনতা অনুমান করা উচিত নয়। আমাকে নীরব দেখে শীলা খুশী হয়ে বলল: মেনে নিয়েছেন তো আমার কথা! মানতেই হবে।

না মানলেও চলে।

বলে মিস্টার বোস এক জায়গায় গাড়ি থামালেন। গাড়ি রাখলেন রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে। তারপর নেমে পড়লেন।

আমি রাস্তার দু ধারে চেয়ে দর্শনীয় কিছু দেখতে পেলুম না। তবু নেমে পড়লুম। শীলা ও অনিমেষও নামল।

মিস্টার বোস বললেন: কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

আমি বললুম: ছোট একটা মসজিদ বলে মনে হচ্ছে।

সাবাস!

বলে মিস্টার বোস আমাদের গলির মুখে এনে একটা বন্ধ দরজা দেখালেন। বাইরে থেকে দরজায় একটা শিকল টানা। ডাকাডাকি করে একজন লোক এনে সেই শিকল খোলালেন। সরু সরু

কয়েকটা ধাপ উপরে উঠে আমরা একটা ছোট প্রাঙ্গণে পৌঁছলুম। মিস্টার বোস বললেনঃ এরই নাম পাথর কি মসজিদ। জাহাঙ্গীর বাদশাহর পুত্র পরবেজ শাহ যখন বিহারের সুলতান, তখন এই মসজিদটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন।

এত ছোট মসজিদ এর আগে আমি দেখি নি। এক সঙ্গে এক শো লোকও নমাজ পড়তে পারবে না। জীর্ণ দশা, তবু পরিত্যক্ত বলে মনে হল না। লোকজনের যাতায়াত যে আছে তা বুঝতে পারা যায়।

শীলা বললঃ এর নাম পাথর কি মসজিদ হল কেন! পাথর তো কোথাও দেখছি না!

আমি বললুমঃ দূর থেকে পাথরের বলেই আমার মনে হয়েছে।

মিস্টার বোস বললেনঃ নিশ্চয়ই পাথরের তৈরি, তা না হলে পাথর কি মসজিদ নাম হত না।

মসজিদ থেকে নেমে আসবার সময় দরজার শিকল আমরা তুলে দিলুম।

খানিকটা এগোবার পরেই আমি বললুমঃ মসজিদ দেখালেন, মন্দির দেখালেন না কেন?

মন্দির!

বলে মিস্টার বোস ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেনঃ কাছেই কোথাও পাটনেশ্বরীর মন্দির আছে। পাটনায় এলে এই মন্দির নাকি সবাইকে দেখতে হয়।

শীলা বললঃ কই, আমরা তো দেখিনি আগে!

মিস্টার বোস বললেনঃ কী ব্রাদার, পাটনেশ্বরী আগে দেখা হয় নি!

অনিমেষ সংক্ষেপে বললঃ না।

মিস্টার বোস গাড়ি থামিয়ে মন্দিরে যাবার পথটা জেনে নিলেন একজন পথিকের কাছে। তারপরে ডান হাতের একটা পথ ধরে

খানিকটা এগিয়েই আগের রাস্তার সমান্তরাল আর একটা পথ ধরলেন। আরও দু একজনকে জিজ্ঞাসা করে একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামালেন। এই সরু রাস্তা দিয়ে সাইকেল রিক্‌শ চলাচল করে দেখলুম। কিন্তু মিস্টার বোস গাড়িটা বন্ধ করে নেমে পড়লেন। আমরাও নেমে পড়লুম।

বেশি দূব আমাদের হাঁটতে হল না। ডান দিকে একটুখানি হেলেই আমরা মন্দিবের দরজায় পৌঁছলুম।

সামনেই ফুল বেলপাতা মিষ্টান্নের দোকান। যাত্রীরা যাতায়াত করছে। আমরাও ভিতরে চলে গেলুম।

ছোট একটুখানি প্রাঙ্গণ ডিঙিয়ে মন্দিরের চাতাল। নিচে জুতো খুলে আমরা উপরে উঠলুম। প্রথমেই একটি বিরাট হোমকুণ্ড, ধোঁয়া উঠছে সেই কুণ্ড থেকে। সারাক্ষণ এই কুণ্ডে আগুন জ্বলছে। যাত্রীরা এখানে পূজো দিয়ে যাচ্ছে।

মূল মন্দিবের ভিতবে তিনটি কালো পাথবের মূর্তি। মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী ও পাটনেশ্বরী। ব্রাহ্মণেরা যাত্রীদের পূজো করিয়ে দিচ্ছেন। একটুখানি তফাতে শিবের মন্দির, তার ভিতরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। হনুমানের মূর্তিও আছে মন্দিরের বাহিরে।

পাটনেশ্বরীব মন্দির ঠিক মন্দিরের মতো নয়। সাধারণ একটি গৃহের ভিতরে দেবতার মূর্তি আছে প্রতিষ্ঠিত। দেখলুম যে যাত্রীদের কাছ থেকে মন্দির নির্মাণের জন্য চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। একটা বাক্স রাখা আছে চাঁদার জন্য।

সোমনাথের কথা আমার মনে পড়ল। সেখানেও এমনি বাক্স দেখেছি নূতন মন্দিরের ভিতরে। নিচের অংশের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছিল, বাকি ছিল উপরের অংশের। তারই জন্য চাঁদা উঠছিল তখনও। সেখানে আমি চাঁদা দিয়ে এসেছি, কিন্তু এখানে দিলুম না। কেন দিলুম না তা জানি না। বোধ হয় মনের ভিতর সে আবেগ এল না যা এসেছিল সোমনাথে।

মন্দিরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে এক যুবক গান শুনছিল। তাকিয়ে দেখলুম যে তার পাশে একটি ট্রানজিস্‌টার রেডিওতে চলচ্চিত্রের গান বাজছে। নিকটে দাঁড়িয়ে আরও দু-একজন লোক এই গান শুনছে। আমরা বেরিয়ে এলুম।

অনিমেষের নির্লিপ্ত ভাব আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলুম। কোন কথায় তার উৎসাহ নেই, কোন কাজেও না। যন্ত্র-চালিতের মতো সে উঠছে আর নামছে, কোন প্রশ্ন না করলে নিজে থেকে কোন কথায় যোগ দিচ্ছে না। অনিমেষ কি বদলে গেল!

মিস্টার বোসও যে ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন তা বুঝতে পারলুম তাঁর প্রশ্ন শুনে। গাড়ি চালাতে চালাতেই জিজ্ঞাসা করলেন: ব্রাদারের মুড এবারে কিছু অন্য রকম দেখছি!

আমি পিছন ফিরে দেখলুম যে শীলা পরম কৌতূহলে তাকিয়েছে অনিমেষের দিকে। অনিমেষ একটু অস্বস্তি বোধ করল, বলল: ও আপনার দেখার ভুল।

মিস্টার বোস বললেন: ট্রেনে কুপে কম্পার্টমেণ্ট পেয়েছিলে, না চার বার্থের গাড়ি?

অনিমেষ বলল: তার সঙ্গে মুডের সম্পর্ক কী?

ক্রিমিনাল কোর্টের উকিল ব্রাদার, সম্পর্ক আছে কিনা তা পরে বুঝবে।

অনিমেষ অনিচ্ছায় বলল: চার বার্থের কম্পার্টমেণ্ট।

মিস্টার বোস বললেন: ঝগড়াটা তাহলে বাড়ি থেকে বেরবার আগেই হয়েছে।

শীলা বলে উঠল: ঝগড়া হয় নি জামাইবাবু, আজ সকাল বেলায় অমনি গোম্‌ড়া মুখ নিয়ে উঠেছে।

সহাস্যে মিস্টার বোস বললেন: আজ রাতেই তাহলে ঠিক হয়ে যাবে বলছ?

আমি বললুম ঃ ছেলেবেলায় ও খুব অভিমানী ছিল। কোন কথায় দুঃখ পেলে ও অনেক দিন তা মনে রাখে।

ওদের দুজনকে দেখবার জন্মে আমি পিছন ফিরে তাকিয়েছিলুম। আশ্চর্য হলুম শীলাকে দেখে, বেদনায় তার চোখ ছলছল করছে, আর কঠিন ভাবে বসে আছে অনিমেষ। মিস্টার বোস এ সব দেখতে পান নি। তিনি আবার বড় রাস্তায় ফিরে এসেছিলেন। এইবারে একটা গেট দিয়ে একটা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন। তারপরে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন।

আমি বললুম ঃ নামতে হবে নাকি এখানে?

মিস্টার বোস বললেন ঃ পাদ্রি কি হাভেলি দেখবেন না! টুরিস্টদের এও একটি দ্রষ্টব্য স্থান। রবিবার সকালে টুরিস্ট অফিসে দু টাকার টিকিট কাটলে সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই সব আপনাকে দেখতে হত। ফ্রেজার রোডের উপরে টুরিস্ট অফিসটাও আপনাকে দেখিয়ে দেব।

আমি বললুম ঃ ঐতিহাসিক বিবরণটাও তাহলে বলুন।

মিস্টার বোস বললেন ঃ পাটনায় এইটিই সব চেয়ে পুরনো রোমান ক্যাথলিক চার্চ। আর কয়েক বছর পরে দুশো বছর বয়স হবে।

গির্জার দরজা এখন বন্ধ। বাঁ হাতে একটা ছোট হাসপাতাল, এই প্রতিষ্ঠানই পরিচালনা করছেন। দেখবার মতো আর কিছু এখানে নেই।

এখান থেকে আমরা সোজা চলে গেলুম হরমন্দিরে। গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান। রাস্তার ধারে মোটর রেখে খুব সংকীর্ণ গলি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। সাইকেল রিক্‌শ কিন্তু নির্ভয়ে চলাচল করে।

মিস্টার বোস ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এইখান থেকেই আমরা বাড়ি ফিরব।

সহাস্যে আমি বললুম : টুরিস্ট অফিসের ইটিনেরারিতে আর কোন দ্রষ্টব্য স্থান নেই ?

মিস্টার বোস ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপরেই বললেন : ঠিক বলেছেন, বাদ পড়েছে একটা। তার নাম কিলা হাউস। এক সময় শের শাহর দুর্গ ছিল। ইংরেজরা সেটা মেরামত করিয়েছিল। এখন একটা যাদুঘরের মতো করেছে। চীনা ছবি, মোগল আমলের রূপোর ফিলিগ্রি কাজ এই রকম কিছু জিনিস আছে। সবাইকে ঢুকতে দেয় না, কোন একটা অফিস থেকে বোধ হয় অনুমতি নিতে হয়।

শীলা বলল : যাদুঘর দেখার মতো উৎসাহ আমার নেই।

হাঁটতে হাঁটতেই মিস্টার বোস বললেন : দাঁড়ান দাঁড়ান, আরও সব জিনিসের কথা মনে পড়ছে।

আমি দাঁড়িয়ে গেলুম।

মিস্টার বোস বললেন : দাঁড়ালেন কেন, চলতে চলতেই শুনুন।

আমি বললুম : আপনি যে দাঁড়াতে বললেন।

আমার কথায় হেসে উঠল অনিমেষ, বলল : তোর এই অভ্যেসটা আজও গেল না।

অনিমেষের হাসি দেখে সব চেয়ে খুশী হল শীলা। নিজেও সে হেসে উঠল। গম্ভীর ভাবে আমি বললুম : আর কী কী আমাদের দেখা হল না ?

মিস্টার বোস বললেন : কেউ তাকে হাইবৎ জঙ্গের কবর বলে, কেও বলে নবাব শাহিদকা মকবারা। একেবারে পাটনা সিটি স্টেশনের ধারেই এই সাদা ও কালো মার্বল পাথরের পরিত্যক্ত কবর। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর বাবা জৈনুদ্দিন হাইবৎ জঙ্গের স্মৃতিতে তৈরি করেছিলেন।

আর কিছু ?

মিস্টার বোস বললেন : আর একটা মসজিদ আমি আপনাকে দেখাতে পারব না।

কেন ?

নিজে চিনি না বলে। এ অঞ্চলের সব চেয়ে পুরনো মসজিদ। নাম শাহি মসজিদ। চার শো বছরেরও বেশি পুরনো সেই মসজিদ শের শাহ তৈরি করেছিলেন। ওবেলায় দুটো মসজিদ দেখিয়ে আমি আপনাকে বলব, চিনে নিন আসলটি।

মিস্টার বোসের কথায় শীলা হাসছিল।

ভদ্রলোক বললেন: হাসি নয় ছোট গিন্নী, রীতি মতো প্রত্নতাত্ত্বিকের দরকার। রেল লাইনের ওধারে কুমঢ়ারে যখন যাব, তখন একটা মসজিদ দেখব তার গেটের সামনে, আর একটা একটু-খানি এগিয়ে। দুটোই প্রাচীন। তার কোন্‌টা শাহি মসজিদ তা টুরিস্ট অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের জানতে হবে।

ভদ্রলোকের কথার ধরনে আমিও হাসলুম। বললুম: গুলজার-বাগের বাগ দেখাবেন না ?

এ কথায় মিস্টার বোস হেসে উঠলেন। বললেন: তাহলে আপনাকে ফুলওয়ারি-শরিফেও ফুল দেখতে যেতে হবে। ফুলবাগ কোথাও নেই। পাটনায় ফুল দেখতে লোকে স্টেশনের কাছে হার্ডিঞ্জ পার্কে যায়, আর তা না হলে সেক্রেটারিয়েটের বাগানে।

তারপরেই বললেন: তবে নেশা করতে হলে গুলজারবাগের একটা কারখানায় যাবেন। গঙ্গার ধারে খুব ভাল আফিং তৈরি হয়। পুরাকালে চীনে চালান যেত।

আমি বললুম: যেতেই হবে সেখানে। আফিং যে নেশার রাজা, ওই নেশাতে জীবনের বিষ অমৃত হয়ে যায়। মনে নেই গল্পটা! আফিংখোরকে কামড়ে বিষাক্ত সাপ নিজেই মরেছিল!

কথায় কথায় আমরা হরমন্দিরের দরজাতেই পৌঁছে গিয়েছিলুম।

হরমন্দিরকে ইংরেজীতে লেখা হয় হরিমন্দির, কিন্তু হরিমন্দির কেউ বলে না। সবাই হরমন্দিরই বলে। সর্বসাধারণের কাছে এই স্থান গুরদোয়ারা নামে পরিচিত, গুরুদ্বার কেউ বলে না। এ সবই উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য। সংস্কৃত কথা সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারণ করলে' উত্তর ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে পার্থক্য কমে আসবে, অর্থবোধের সমস্যা যাবে সরল হয়ে। এই সমস্যা দূর করবার জন্য সারা ভারতে রোমান হরফ প্রচলনের কথা অনেকে ভাবছেন কিনা জানি না।

হরমন্দিরের দ্বারে প্রহরী আছে কৃপাণ হাতে। ছোট দরজা, মনে হবে না যে কোন বিরাট প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ঢুকলুম। প্রাঙ্গণে পৌঁছে সমস্ত অনুমান এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যাবে, এই প্রতিষ্ঠানের বিশালতায় আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। গলির সঙ্গে সমান্তরাল একটি দোতলা অট্টালিকা অনেকটা স্থান জুড়ে আছে, তার দু দিকে দুটি গম্বুজ। অট্টালিকার মাঝখানের অংশ কিছু বেশি উঁচু, তার উপরের গম্বুজটিও বড়। কিন্তু এখন আর এই গুরুদ্বারের দিকে দর্শকেরা ভাল করে তাকায় না, এখন সকলের দৃষ্টি হরমন্দিরের দিকে। ভিতরে প্রবেশ করেই এই অপরূপ মন্দিরটি চোখে পড়ে। বিরাট একটি প্রাঙ্গণের মাঝখানে এই নূতন মন্দিরটি সত্যিই সুন্দর।

খানিকক্ষণের জন্য আমরা থমকে দাঁড়ালুম। যে দিক থেকে আমরা এসেছি, সে দিকে কোন প্রবেশের পথ নেই, পথ উলটো দিকে। মানে প্রাঙ্গণের অন্য ধার থেকে এই মন্দিরে ঢুকতে হবে। এ দিকে এই সৌধ চারতলা, তার উপরে একটি মন্দিরের উপরে

গম্বুজ। মাঝখানে দোতলা, কিন্তু চারকোণায় এটি তিন তলা। প্রত্যেকটি কোণায় একটি গম্বুজবিশিষ্ট মন্দিরাকৃতি প্রকোষ্ঠ। যে মন্দিরের উপরে গম্বুজ, তার ছাদ সমতল নয়, সেদিকে তাকালে বিষ্ণুপুরের মন্দিরের কথা মনে পড়ে।

শীলা বলে উঠল: গোপালবাবু বুঝি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন!

অনিমেষ বলল: হরমন্দিরের ছবি ওর মনে আঁকা হয়ে গেছে। আজকাল স্কেচ করিস না?

উত্তর না দিয়ে আমি হাসলুম।

মিস্টার বোস বললেন: আপনি শিল্পী নাকি!

আমি বললুম: ছেলেবেলায় স্কুলে ড্রয়িং খারাপ করতুম না বলে অনিমেষ আজও তামাশা করে।

অনিমেষ গম্ভীর ভাবে বলল: আমি ভয় পাই যে এক দিন হয়তো ও কলম ছেড়ে তুলি ধরবে।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি হনহন করে এগিয়ে গেলুম। মিস্টার বোস বলে উঠলেন: ওধার দিয়ে নয়, এই ধার দিয়ে আসুন।

বলে বাঁধানো চত্বরে না উঠে সমস্ত প্রাঙ্গণটা ঘুরে আমরা সামনের দিকে এগোলুম। প্রাঙ্গণ বাঁধানোর কাজ এখনও শেষ হয় নি। মনে হল যে আশেপাশের অনেকখানি জমি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে ও অদূর ভবিষ্যতে এই পরিবেশটি মনোরম আকার ধারণ করবে।

মন্দিরে প্রবেশপথের পাশে জুতো রাখবার ব্যবস্থা আছে। টিকিট পাওয়া যায়, পাহারার লোক আছে, কিন্তু পয়সা দিতে হয় না।

মিস্টার বোসের দেখাদেখি আমি মাথায় রুমাল জড়িয়ে নিলুম, শীলাও তার আঁচলখানা মাথায় তুলল। কিন্তু অনিমেষ বলল: ও রকম কোন নির্দেশ তো দেখছি না।

মিস্টার বোস বললেন ঃ আমরা যে ভক্তি নিয়ে এসেছি, তাই জানানো হল।

অনিমেষও তার মাথায় রুমাল জড়াচ্ছিল, বলল ঃ বুঝেছি।

পরে আমরা জেনেছিলুম যে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ আছে। সকল দেশের সকল জাতির যেমন প্রবেশাধিকার আছে, তেমনি কতকগুলি নিয়ম সকলকেই পালন করতে হয়। বাহিরে জুতো খুলে পা ধুয়ে নিতে হয়, টুপি পাগড়ী বা রুমালে ঢাকতে হয় মাথা। আর প্রত্যেক যাত্রীকে সামান্য অর্থ বা ফুল দিয়ে প্রণামী প্রসাদ বা আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হয়। পা আমরা ধুই নি, কোন প্রণামী দিই নি, কিন্তু প্রসাদ নিয়েছিলুম হাত পেতে। একটি বড় পাত্রে কিছু এলাচ দানা ছিল, একজন ভক্ত শিখ তার থেকে এক এক মুঠো তুলে সকলের হাতেই একটু একটু দিচ্ছিলেন। নিয়ম কানুন আমাদের জানা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই তা পালন করতুম।

প্রথমেই আমরা একটি সুবৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করেছিলুম। তারই শেষপ্রান্তে যাত্রীসাধারণের দর্শনীয় স্থান। কতকগুলি ঐতিহাসিক বস্তু এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব, ছবি সাহেব ও পান্‌গুরা সাহেব। শিখধর্মের মূল গ্রন্থ হল গ্রন্থ সাহেব, এখানে যে গ্রন্থ সাহেব আছে তাতে শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহের দস্তখত আছে বলে তার নাম শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব, সংক্ষেপে বড়ে সাহেব। ছবি সাহেব হল গুরুগোবিন্দ সিংহের একমাত্র অঙ্কিত চিত্র। আর পানগুরা সাহেব হল একটি ছোট দোলনা, তার চারটি পায়া সোনার পাতে মোড়া। শিশু গোবিন্দ সিং এই দোলনায় ঘুমোতেন।

আরও কতকগুলি জিনিস সামনে সাজানো আছে। চারিটি লোহার তীর, আর লোহারই চাকরি খাণ্ডা বাঘনখ খঞ্জর একটি করে, আর দুটি লোহার চাকের। এই জিনিসগুলি কী এবং কী কাজে লাগত তা জানি নে। তবে বালক গোবিন্দ সিংহ এ সব নিয়ে

হয়তো খেলা করতেন। মাটির গুলি আর লোহার তীর নিয়ে যে খেলা করতেন সে গল্প শুনলুম এখানে।

আরও অনেক জিনিস আছে। গুরুগোবিন্দ সিংহের একটি কাঠের কঙ্গা ও এক জোড়া হাতির দাঁতের খড়ম, তাঁর পিতা গুরু তেগবাহাদুরেরও এক জোড়া চন্দনকাঠের খড়ম, আর কবীর সাহেবের তিনটি কাঠের চরকা। হুকুমনামা নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থও দূর থেকে দেখলুম, তাতে গুরু তেগবাহাদুর ও গুরুগোবিন্দ সিংহের ছবি, হাতের লেখা ও হুকুমনামা রক্ষিত হয়েছে। একটি জিনিসের নাম শুনলুম সায়েফ, মানে শব্দ। এও গুরুগোবিন্দ সিংহের স্মৃতিচিহ্ন।

এইখানেই আমরা প্রসাদ পেলুম। আর গুরুর স্মৃতিতে প্রণাম করে এগিয়ে গেলুম বাঁ ধাবে। এই দিকে সেই বিখ্যাত কূপ রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। এই কূপের সম্বন্ধেই একটি অলৌকিক কাহিনী এখানে শুনলুম।

এই কুপের নাম মাতা গুরুজীর কূপ। গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়েছে যে গৃহে তারই বারান্দায় এই কুয়ো ছিল। পানীয় জলের আর কোন কুয়ো এই অঞ্চলে ছিল না বলে প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা এখানে মাটির কলসী কাঁখে জল নিতে আসত। বালক গুরু পাথরের মতো শক্ত গুলির মাটি ছুঁড়ে সেই সব মাটির কলসী ভেঙে দিতেন। তারা নালিশ করত গুরুর মায়ের কাছে। গুরুর মা তাদের লোহার কলসী কিনে দিলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হল না। গুরু লোহার তীর দিয়ে সেই সব কলসী ফুটো করে দিলেন। এই মাটির গুলি আর লোহার তীর আমরা গুরুর স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে দেখেছি।

উপায়ান্তর না দেখে গুরুর মা প্রার্থনা করলেন যে কুয়োর জল যেন নোনতা হয়ে যায়। তাহলে আর জল নিতে কেউ আসবে না, তাঁকেও আর নালিশ শুনতে হবে না প্রতিবেশিনীদের কাছে। হলও

তাই। রাতারাতি সেই কুয়োর জল লবণাক্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাতেও কি শান্তি আছে! প্রতিবেশিনীরা গুরুর মায়ের কাছে এসে বলল, কুয়োর জল আবার মিষ্টি করে দাও। গুরুর মা বললেন, জল মিষ্টি হবে ধীরে ধীরে, যখন সবাই এ জায়গাকে ভালবেসে দলে দলে এখানে আসবে।

যে ভদ্রলোক এ গল্পটি আমাদের শোনালেন, পরম শ্রদ্ধায় তিনি বললেন : কুয়োর জল এখন আর একটুও নোনতা নয়।

সত্যি নাকি!

বলে শীলা কুয়োর দিকে তাকাল।

অন্ধকার কূপ, জল কত নিচে তা দেখা যায় না। তবে দড়ি কলসী আছে। ভদ্রলোক ভিতর থেকে খানিকটা জল এনে আমাদের হাতে ঢেলে দিলেন। আমরা সেই জল পান করে কোন নোনতা স্বাদ পেলুম না।

আর একজন শিখ ভদ্রলোক বললেন : গুরুর মা তাঁর প্রতিবেশিনীদের বলেছিলেন যে ভারত স্বাধীন হলে এই কুয়োর জল মিষ্টি হবে। হয়েছেও তাই। ভারত স্বাধীন হবার কয়েক দিন আগেও জল বিস্বাদ ছিল।

এর পরে আমরা দোতলায় উঠে গেলুম। সাদা ও কালো পাথরের অপর্যাপ্ত ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এই সৌধটি খুব পুরনো নয়, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান অনেক পুরনো হয়েছে। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার রাত একটা কুড়ি মিনিটের সময় জন্ম হয়েছিল গুরু গোবিন্দ সিংহের। এইখানে, পাটনা সিটি রেল স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে এই হরিমন্দির গলির একটি পুরনো গৃহে। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল কুচা ফারুক খান। আজ এই স্থান শিখদের চার তখতের দ্বিতীয় তখৎ, নাম শ্রীতখৎ হরিমন্দিরজী পাটনা সাহেব। অন্য তিনটি তখৎ হল শ্রীআকল তখৎ অমৃতসর, শ্রীতখৎ কেশগড় সাহেব আনন্দপুর ও শ্রীতখৎ হজুর সাহেব নান্দের। দুটি পাঞ্জাবে, অন্যটি মহারাষ্ট্রে। পাটনার হরিমন্দির শিখদের শ্রেষ্ঠ তীর্থের অন্যতম।

শিখ ধর্মের আদি গুরু নানক পাটনায় কয়েক মাস কাটিয়েছিলেন। সালস রায় জহুরি নামে এক ব্যক্তি গুরু নানকের ধর্ম গ্রহণ করে প্রচারকার্যের জন্য নিজের হাভেলি নামে গৃহকে ধর্মশালায় পরিণত করেছিলেন। সেই হাভেলিই এখন হরিমন্দিরে পরিণত হয়েছে।

নবম গুরু তেগবাহাদুর যখন রাজা রাম সিংহের সঙ্গে আসামের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি মুঙ্গের থেকে তাঁর পাটনার অনুচরদের একখানি পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি হরিমন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পরিবারকে কোন প্রশস্ত গৃহে রাখবার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এই হরিমন্দিরের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আগুন লেগে এই

মন্দিরের অনেক ক্ষতি হয়। পাঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহ তার সংস্কার করে দেন; কিন্তু নূতন মন্দির তিনি দেখে যেতে পারেন নি। ১৯৩৪ সনের বিখ্যাত বিহার ভূমিকম্পে এই মন্দিরেরও কিছু অংশ ভেঙে পড়ে। কুড়ি বৎসর পরে বর্তমান মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় এবং ভারত স্বাধীন হবার দশ বৎসর পরে শিখ সম্প্রদায়ের চেষ্টায় এটি সম্পূর্ণ হয়। রাস্তার ধারের ধর্মশালাটি কিন্তু পুরাতন। ধর্মশালার নাম সঙ্গৎ, আর লঙ্গর হল যাত্রীসাধারণের বিনামূল্যে আহারের স্থান। এও একটি মস্তবড় দোতলা বাড়ি, প্রশস্ত তার অঙ্গন। হরিমন্দিরের বারান্দা থেকে আমরা লঙ্গর দেখতে পেলুম।

দোতলার একটি ঘরে কয়েকজন ভক্তকে দেখলুম গ্রন্থ সাহেব পাঠে রত আছেন। ধূপধুনার গন্ধে চারি দিকে আমোদিত, শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ সাধন-ভজনের পরম উপযোগী। ভক্তরা গালিচার উপরে পা মুড়ে বসেছেন। তাঁদের সামনে তখতের উপরে নানা আকারের গ্রন্থ খোলা আছে। আমরা তাঁদের কোন বাধা সৃষ্টি না করে আর এক তলা উপরে উঠে গেলুম। সেখান থেকে পাটনার পুরনো শহরের অনেকখানি দেখা যায়, অদূরে গঙ্গার প্রবাহও দেখতে পেলুম। এর পরেও আর এক তলা উঠবার সিঁড়ি আছে কিন্তু সেই সিঁড়ির মুখ বন্ধ। দরজা খুলে না দিলে সেখানে ওঠা যায় না। আমরা তাই নিচে নেমে এলুম।

সামনে একজন শিখ ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে মিস্টার বোস বললেন: এখানে আর কী দেখবার আছে?

প্রশ্নটা তিনি হিন্দীতে করেছিলেন, উত্তর পেলেন হিন্দীতে। সে ভদ্রলোক বললেন: আজ তো কোন উৎসব অনুষ্ঠানের দিন নয়, কাজেই আজ শুধু ঘুরে ঘুরে দেখা। ফেরার সময় আর কয়েকটা গুরুদ্বার দেখে ফিরতে পারেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: পাটনায় আরও গুরুদ্বার আছে?

সহাস্যে ভদ্রলোক বললেন : আছে বইকি।

তারপরে সেই সব গুরুদ্বারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের বললেন।

১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে নবম গুরু তেগবাহাদুর তীর্থদর্শনে বেরিয়েছিলেন। আনন্দপুর সাহেব থেকে দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন আগ্রা প্রয়াগ গয়া দেখে পাটনায় এসেছিলেন। যেখানে তিনি প্রথম উঠেছিলেন সেই জায়গাতেই এখন গুরুদ্বার গায়ঘাট। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে গুরু নানকের ভক্তরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে সালস রায়ের এই হাভেলিতে নিয়ে আসেন।

সেই বছরই দশেরার পর গুরু তাঁর পরিবার এই হাভেলিতে বেখে আসাম পর্যটনে যান। মুঙ্গের ভাগলপুর সাহেবগঞ্জ মুর্শিদাবাদ মালদহ ঢাকা ধুবড়ি হয়ে তিনি গৌহাটি গিয়েছিলেন। আসামেই তিনি গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মের সংবাদ পেয়ে উৎসব করেছিলেন। তারপরে পাটনায় ফিরে এসে একটা শুকনো বাগানে বাস করতে লাগলেন। দেখতে দেখতেই সেই বাগান সবুজ সতেজ হয়ে উঠল। হরিমন্দির থেকে মাইল দুই দূরে সেই বাগানটি ছিল একজন নবাবের। তিনি এই সংবাদ পেয়ে আশ্চর্য হলেন। সপরিবারে গুরুকে দেখতে এসে বাগানটি তাঁকে দান করে গেলেন। সেদিন থেকে সেই বাগানের নাম হয়েছে গুরুকা বাগ।

গুরুদ্বার গোবিন্দ ঘাট গোবিন্দ সিংহের নামে। এখানে তিনি শিবদত্ত পণ্ডিত নামে এক ভক্তের মনে শান্তি দান করেছিলেন। গুরুদ্বার ময়নি সঙ্গতে গুরু শৈশবে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করতেন। মহারাজা ময়নি ও তাঁর বয়নী এঁদের ভালবাসতেন, আর সবাইকে ছোলাসেদ্ধ খেতে দিতেন। হরিমন্দিরের খুব কাছে এই সঙ্গতে এখনও যাত্রীদের ছোলাসেদ্ধ খেতে দেওয়া হয়।

তারপরে দানাপুরের গুরুদ্বার হাণ্ডি সাহেব। গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর দলবল নিয়ে পাঞ্জাবের আনন্দপুরে যাচ্ছিলেন। প্রথম

রাত কাটালেন দানাপুরে। সেখানে এক দরিদ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মাটির একটি ছোট হাঁড়িতে খিচুড়ি রেঁধে গুরুকে খেতে দিয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল যে ওই একটুখানি খিচুড়িতে সকলের পেট ভরুক। মনে মনে সে তাই প্রার্থনা করেছিল আর গুরুর কৃপায় সেই স্ত্রীলোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। সেই জায়গাতেই নির্মিত হয়েছে গুরুদ্বার হাণ্ডি সাহেব ও সেই মাটির হাঁড়িটি রাখা হয়েছে সযত্নে।

হরিমন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মিস্টার বোস আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: যাবেন নাকি এই সব জায়গায়?

অনিমেষ প্রবল ভাবে প্রতিবাদ করল, বলল: আর কোথাও যাব না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে শীলা বলল: আর দেরি করলে দিদি খুব রাগ করবে।

মিস্টার বোস সকৌতুকে বললেন: দিদিকে তোমরাও ভয় পাও নাকি!

ফেরার পথে আমার তেগবাহাদুরের কথা মনে পড়ল। তিনি সাহসী ছিলেন। মায়ের কাছে পিতার একখানি তরবারি পেয়েই অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। একজন মুসলমান অনুচরের সঙ্গে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে শিখদের শক্তিবৃদ্ধি করেন। বাদশাহ তাঁর এই ধৃষ্টতা সহ্য করেন নি। দিল্লীতে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের সৈন্যেরা যখন তাঁকে দিল্লীতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি তাঁর কিশোর পুত্র গোবিন্দ সিংহকে ডেকে বলেছিলেন, এই নাও তোমার পিতামহর তরোয়াল। আমি আর ফিরব না, কিন্তু আমার দেহ যেন কুকুরে না খায়। পনের বছরের কিশোর তাঁর পিতার আদেশ পালন করেছিলেন। তেগবাহাদুরের ছিন্ন মস্তক আনন্দপুরে সমাধিস্থ করা হয়েছে। অনেকে বলেন যে কারাগারে অত্যাচার করে যখন তাঁকে বধ করা হয়, তখন তাঁর মাথা

একজন বিশ্বস্ত শিখের কোলে গিয়ে পড়ে। সে সেই মাথা নিয়ে আনন্দপুরে ছুটে আসে। চারিদিক অন্ধকার করে এক প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল, ধূলোর ভিতর কেউ তাকে অনুসরণ করতে পারে নি।

ঔরঙ্গজেব তেগবাহাদুরকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করাবার জন্য অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন। দৃপ্তকণ্ঠে গুরু বলেছিলেন, মক্কার ধর্ম-প্রচারক পৃথিবীতে এক ধর্ম প্রবর্তনা করতে পারেন নি, তুমি তা কী করে পারবে! বাদশাহ হুকুম দিয়েছিলেন, যতক্ষণ ও ইসলামধর্ম না মানে, ততক্ষণ অত্যাচার চালিয়ে যাও। মৃত্যুকেই তেগবাহাদুর মেনে নিয়েছিলেন।

তাঁর একটি ভবিষ্যদ্বাণী গুরুমুখী কাহিনীতে অক্ষয় হয়ে আছে। ঔরঙ্গজেব নাকি বলেছিলেন যে গুরু তাঁর বাসগৃহের ছাদ থেকে হারেমের দিকে তাকিয়েছিলেন। গুরু বলেছিলেন, না, তোমার হারেমের দিকে নয়, তোমার বেগমদের দিকেও আমি তাকাই নি। আমি দেখছিলুম সাগরপারের সেই বিদেশীদের যারা তোমার হারেমের পর্দা ছিঁড়ে সাম্রাজ্যটাই ধ্বংস করতে আসছে। শিখ লেখকরা নাকি লিখেছিলেন যে ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজ সৈন্য এই জিগীর তুলেই দিল্লীর মোগলদের আক্রমণ করেছিল। গুরু তেগবাহাদুরের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি।

তেগবাহাদুরের জীবন নিয়ে আরও অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে। পিতা হরগোবিন্দ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তেগবাহাদুরকে বঞ্চিত করে পৌত্র হররায়কে গুরু করেন। পুত্রবধূ এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন যে তেগবাহাদুরও এক দিন গুরু হবেন ও তাঁর পুত্র হবে আরও বরণীয়। সত্যিই তাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহ সারা ভারতের বরণীয় হয়েছেন।

গোবিন্দ সিংহই শিখদের শেষ গুরু। জন্মের অধিকারে তিনি গুরুর গদি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু জীবনে শান্তি পান নি। এক

দিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাম রায়, অন্য দিকে অনেক শত্রু। গোবিন্দ সিংহ যমুনার তীরে পাহাড়ের উপরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এই স্বেচ্ছানির্বাসনে তাঁর অনেক উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল। নির্জনে লেখাপড়া করলেন, মৃগয়া করে তাঁর লক্ষ্য স্থির হল এবং তাঁর সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করলেন। তিনি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং বাহান্নজন কবিকে দিয়ে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলির অনুবাদ করিয়েছিলেন। শোনা যায় যে তিনি বিজয়ের বাসনায় দুর্গোৎসবও করেছিলেন। এর জন্যে তিনি নিন্দার ভাগী হয়েছেন।

গুরু বিবাহ করেছেন দুবার, তাঁর পুত্রের সংখ্যা চার। প্রায় বিশ বৎসর তিনি পাহাড়ে ও বনে একটি শক্তিমান সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টাতেই অতিবাহিত করেছিলেন। ভারতবর্ষে তখন ঔরঙ্গজেব বাদশাহর দুর্দান্ত শাসন। গোবিন্দ সিংহের সঙ্গে পাহাড়ী রাজাদের যে বিবাদ হচ্ছিল তার উপরে বাদশাহ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছিলেন।

গোবিন্দ সিংহ গুরুর গদি তুলে দিলেন। বললেন, তাঁর মৃত্যুর পরে যেন সবাই আদি গ্রন্থকেই গুরু বলে মানে। গুরুর চরণামৃত খাবার প্রথা তুলে দিয়ে জাতিভেদ তুলে দেবার জন্য এক পাত্রে আহারের নির্দেশ দিলেন। সমস্ত শিখ জাতিকে তিনি একটি ভ্রাতৃসঙ্ঘে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আর সিংহের মতো বিক্রমশালী বোঝাবার জন্য তিনি সিংহ উপাধি দিলেন। তাঁর নিজের নামও গোবিন্দ রায় থেকে গোবিন্দ সিংহ হল। পাঁচ তাঁর প্রিয় সংখ্যা। শিখদের তিনি পাঁচটি জিনিস ধারণের উপদেশ দিলেন—কেশ কঙ্গা কৃপাণ কচ্ছ এবং কারা। মাথার চুল কেউ কাটবে না, চুলে একখানা চিরুনি রাখবে, কোমরে কৃপাণ, পরনে কচ্ছ বা জাঙ্গিয়া, আর হাতে কারা বা লোহার বালা।

গুরু গোবিন্দ সিংহ যে তাঁর শিখ অনুচরদের শক্তির প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন, দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তা সুনজরে দেখছিলেন

না। শেষ পর্যন্ত তিনি আনন্দপুরের দুর্গ অবরোধ করলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ অনেক দিন যুদ্ধ করেছিলেন। তার পর আত্মরক্ষার জন্য দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গেলেন। যুদ্ধে তাঁর দুই পুত্র নিহত হয়েছিল। আর দুটি পুত্রকে নিয়ে তাঁর মা সিরহিন্দে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গুরু গিয়েছিলেন কিরাতপুরে।

গুরুর এই দুটি শিশুপুত্রের মৃত্যুর কাহিনী বড় মর্মান্তিক। আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ তাঁদের ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে সিরহিন্দের মুসলমান শাসনকর্তাকে সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি সেই শিশু দুটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তারপর তাদের জীবন্ত সমাধি দিলেন।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছিল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে, আর গুরু গোবিন্দ সিংহ তার পরের বছর এক পাঠান আততায়ীর হাতে নিহত হন। ঔরঙ্গজেবের পরে বাহাদুর শাহ বাদশাহ হয়ে গুরুর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং বাহাদুর শাহর কাছে ক্ষমতা লাভ করে তিনি দক্ষিণে অভিযানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অতীতে গুরু হরগোবিন্দ গুল খাঁ নামে এক পাঠানের পিতামহকে হত্যা করেছিলেন বলে গুল খাঁ গুরু গোবিন্দ সিংহকে হত্যা করে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিল।

অনেকে বলে যে একটি জনসভায় বক্তৃতা দেবার সময় একজন মুসলমান গুরুকে ছোরা মারে। তিনি নাকি ইসলাম ধর্মে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে খালসার গল্পের কথাও আমার মনে পড়ল। খালসা মানে পবিত্র।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ গুরু গোবিন্দ সিংহ এই কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁর পাঁচজন বিশ্বস্ত অনুচরকে তিনি সেদিন খালসা নামে অভিহিত করেন।

সমস্ত শিখকে তিনি আনন্দপুরে একত্র হবার জন্য নিমন্ত্রণ

করেছিলেন। দূর দূরান্ত থেকে ষাট হাজার শিখ ওই পাহাড়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল। গুরু তাঁর একজন অতি বিশ্বাসী অনুচরকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্ধকার রাতে সে একটা জায়গা তাঁবু দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। প্রভাতে এক জনসভা বসল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুরু সেই সভায় এলেন। উপস্থিত শিখদের দিকে তাকিয়ে গুরু হেঁকে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে আমার জন্য প্রাণ দিতে পার ?

সবাই স্তম্ভিত হল।

গুরু আবার-হেঁকে বললেন, কে প্রাণ দিতে পার বল ?

ভয়ে সবাই বিবর্ণ হল, সবাই রইল নিরুত্তর।

গুরু আরও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ যথার্থ শিখ নেই যে তার মাথা আমাকে উপহার দিয়ে তার বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে পারে ?

আছে একজন। লাহোরের শিখ দয়া সিংহ উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, আমি আমার মাথা দেব।

গুরু বললেন, সাবাস। এস আমার সঙ্গে।

বলে সেই তাঁবু দিয়ে ঘেরা জায়গার মধ্যে তাকে নিয়ে গেলেন এবং খানিকক্ষণ পরেই বেরিয়ে এলেন খোলা তলোয়ার হাতে। সেই তলোয়ার থেকে তাজা রক্ত ঝরছে টপটপ করে। সবাই চমকে উঠল, আর্তনাদ করে উঠল কেউ কেউ। কিন্তু গুরু শান্ত হলেন না, বললেন, তোমাদের মধ্যে আর কেউ আছে ?

কারও মুখে উত্তর নেই।

আর কেউ দিতে পার না তোমাদের মাথা ?

সভায় গুঞ্জন উঠল, এ কী করছেন গুরু !

গুরু ভর্ৎসনা করলেন, ধিক তোমাদের। একটা মাথা কেউ দিতে পার না !

পারি।

বলে এগিয়ে এল দিল্লীর ধর্মদাস।

গুরুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি তাকে তাঁবুর ভিতর নিয়ে গেলেন। তারপর আবার বেরিয়ে এলেন বাইরে। আবার তাঁর তলোয়ার থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। গুরুর অগ্নিমূর্তি দেখে এবারে সবাই ভয় পেল। কেউ পালাল, আর কেউ গুরুর মায়ের কাছে গেল নালিশ জানাতে। তলোয়ার তুলে গুরু বললেন, আর তিনটি মাথা চাই।

আরও! মাথা নিচু করে সবাই বসে রইল।

একবার দুবার তিনবার ডাকলেন গুরু। এবারেও এগিয়ে এল একজন। ক্রমে ক্রমে বিদরের সাহেবচাঁদ এল, আর জগন্নাথের হিম্মৎ সিং।

সবাই ভেবেছিল যে গুরুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু তা নয়। গুরু ওই তাঁবুর ভিতর পাঁচটি ছাগল বেঁধে রেখেছিলেন। এক একবার এক একটি লোক সেখানে নিয়ে গিয়ে এক একটি ছাগল কেটে বেরিয়ে আসছিলেন। পাঁচটি ছাগল কাটবার পর সেই পাঁচটি লোককে সাজিয়ে গুজিয়ে সবার সামনে বার করলেন। তারপর তাদের দীক্ষা দিলেন খালসা ধর্মে।

গুরু গোবিন্দ সিংহই শিখদের একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করে গেছেন। শিখেরা আজও তাই তাঁর জন্মভূমি পাটনা সাহেবকে সম্মান করে গুরুর মতো।

২৯

বাড়ি পৌঁছেই মিস্টার বোস বললেন : দেরি করলে চলবে না, পিকনিকের জন্যে এখনই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

তারপরে মুনশীকে কাছে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : পেয়েছেন ?

ভদ্রলোক বিনীত ভাবে বললেন : পেয়েছি।

মিস্টার বোস আর দেরি করলেন না, বারান্দার পাশে একটা ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন।

শীলা বলল : নিশ্চয়ই কোন মক্কেলের খবর পেয়েছেন। আসুন গোপালবাবু, আমরা ততক্ষণ বসবার ঘরে বসি।

আমি বললুম : দিদি কী করছেন দেখা দরকার। আমাদের জন্যে তাঁকে এত কষ্ট করতে দেওয়া চলে না।

শীলার দিদি যে আমাদের ফেরার কথা জানতে পেরে বাহিরে বেরিয়ে এসেছিলেন, আমি তা দেখতে পাই নি। হেসে বললেন : কষ্ট কিসের ভাই, এতেই তো আমাদের আনন্দ।

কিন্তু আপনাদের এই রকমের আনন্দ দিয়ে যে আমরা আনন্দ পাই নে দিদি, আমরা আপনাকেও আমাদের সঙ্গে চাই।

তা কি আর সম্ভব !

শীলা বলল : চল দিদি, আমি তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিচ্ছি।

এ কথার উত্তর না দিয়ে শীলার দিদি আমাকে বললেন : আমার একটা কথা শুনবেন ভাই ?

বলুন।

গরম গরম খাবার বাড়িতেই খেয়ে নিন, তারপর বেড়ানো যাবে।

আমি তাঁকে খুশী করবার জন্যে বললুম ঃ সে তো খুব ভাল প্রস্তাব দিদি। খাওয়াটাও ভাল হবে, বেড়িয়েও আনন্দ হবে বেশি।

শীলার দিদি সত্যিই খুব খুশী হলেন, বললেন ঃ এই তো লক্ষ্মীছেলের মতো কথা। আমি সেই ব্যবস্থাই করছি।

বলে তিনি চলে যাচ্ছিলেন।

শীলা বলল ঃ জামাইবাবু যে পিকনিকের কথা বলেছিলেন!

শীলার দিদি বললেন ঃ রাখ তোমার জামাইবাবুর কথা। সাংসারিক কোন বুদ্ধি কি তাঁর আছে নাকি!

বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

খাবার টেবিলে বসে মিস্টার বোস বললেন ঃ রাজগির নালন্দা আপনি দেখেছেন গোপালবাবু?

বললুম ঃ দেখেছি।

গয়া বুদ্ধগয়া?

মাথা নেড়ে বললুম ঃ না।

তাহলে চলুন, কাল আমরা গয়া আর বুদ্ধগয়া দেখে আসি।

অনিমেষ আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ সে কি!

গম্ভীর ভাবে মিস্টার বোস বললেন ঃ তুমি ওর বন্ধু হয়েও বন্ধুর কাজ করছ না।

এ কথা শুনে আমিও আশ্চর্য হলুম।

মিস্টার বোস বললেন ঃ কলকাতা থেকে বেরিয়ে গোপালবাবু সোজা বেনারস যাচ্ছিলেন। এখানে না নামালে উনি বিহারের কথা কিছুই লিখতেন না। দক্ষিণ ভারতের বেলায় উনি সোজা মাদ্রাজে গিয়ে নামলেন, তাই ওঁর লেখায় অন্ধ্রের কথা কিছু পাওয়া গেল না।

আমার চেয়েও শীলার দিদি বেশি আশ্চর্য হলেন, বললেন ঃ ওঁর লেখা তুমি পড়েছ নাকি?

মিস্টার বোস উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলেন।

আমি বললুম : এইটুকু সময়ে অনেকখানি পড়ে ফেলেছেন তো!

শীলার দিদি এবারে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : সকাল বেলাতেই মুনশীজীকে দিয়ে একখানা বই কিনে আনিয়েছেন, ঘরে বসে এতক্ষণ সেই বইখানাই পড়ছিলেন।

মিস্টার বোস হাসতে হাসতে বললেন : মন্দ লাগছিল না।

খেয়েদেয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে আমরা কুম্‌ঢাহ্‌র দেখতে বেরলুম। এই নামটি আমাদের পরিচিত নয়, এখানে এসেই এই অদ্ভুত নামটি প্রথম শুনলুম। এখানকার লোকে উচ্চারণ করে কুম্‌ঢার, বানান পড়ে দেখলুম কুম্‌রাহ্‌র। ইংরেজী অক্ষর 'এইচ'-এর পরে একটা 'এ' আছে। তার জন্যেই হ-কে প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। কুম্‌রাহ্‌র-এর মাটি খুঁড়ে সম্রাট অশোকের প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। সেইজন্যেই টুরিস্টদের কাছে এই স্থানটি অবশ্য দর্শনীয় হয়ে উঠেছে।

পাটনা স্টেশনের কাছাকাছি একটি রোড-ওভারব্রিজ আছে। ওপারে গেলে রেলপথের সমান্তরাল রাস্তা পাটনা সিটির দিকে গেছে। কুম্‌রাহ্‌র এই রাস্তার ধারেই অবস্থিত। কিন্তু আমরা এই পথে গেলুম না। মিস্টার বোস আমাকে নিজের পাশে বসিয়েছিলেন, বললেন : আপনাকে রাজেন্দ্রনগরের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। পশ্চিমের মতো পূবদিকেও পাটনা শহর বাড়ছে বিহার সরকার অনেক অর্থব্যয় করছেন।

রাজেন্দ্রনগরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় মনে হল যেন সত্যিই একটি নূতন শহর গড়ে উঠছে। সুন্দর ঘরবাড়ি, প্রশস্ত পথঘাট, বাজারও বসেছে নতুন ধরনের। এই সব দেখতে দেখতেই আমরা এগিয়ে গেলুম এবং এক জায়গায় এসে আমাদের খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হল। সামনে রেলের লাইন, গেট বন্ধ, লরি ও রিক্‌শ

দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলি। ট্রেনের প্রতীক্ষা। ট্রেন না গেলে গেট খুলবে না॥

গাছের ছায়ায় ছোট একটি দোকানে জমাট আড্ডা বসেছে। রিক্‌শওয়ালারাও রিক্‌শ থেকে নেমে সেখানে গিয়ে জুটেছে। গেট কখন খুলবে তার জন্যে কারও ব্যাকুলতা নেই। কিন্তু গাড়ির ভিতরে বসে শীলার দিদি বললেন: এইজন্যেই এ পথে আসতে নেই।

মিস্টার বোস বললেন: ও পথে রিক্‌শওয়ালাদের কষ্টের কথা ভাব। রিক্‌শ থেকে নেমে বেচারাদের টানতে হয়। রোড-ওভারব্রিজের মাঝখান পর্যন্ত রিক্‌শ টেনে তুলেও আরাম নেই, নামে এমন হু হু করে যে রিক্‌শয় বসে থাকলে দুর্গানাম জপ করতে হয়।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন নয়, অনেকক্ষণ ধরে একখানা মালগাড়ি সামনে দিয়ে গেল। তারপর গেট খোলা হল। এপারের এই অনাদৃত পথ ওপারের রাজপথের সঙ্গে মিলেছে। আমরা বাঁদিকে ফিরে পূর্ব মুখে চললুম।

মিস্টার বোস বললেন: প্রাচীন পাটলিপুত্র ছিল এই অঞ্চলেই কিন্তু এর বর্তমান নাম রাজেন্দ্রনগর। অথচ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ যে সদাকৎ আশ্রমে বাস করতেন, সেই পাড়ার নাম রাখা হয়েছে পাটলিপুত্র।

শীলা বলল: ভারি মজার ব্যাপার তো।

কিছু দূর এগোবার পরে মনে হল যে ডান হাতে একটা দেওয়াল দেখতে পাচ্ছি। পথের ধারে ধারে এই দেওয়াল চলেছে। পাহাড়ী পথের প্রাচীরের মতো নিচু নয়, আবার জেলখানার দেওয়ালের মতো দৃষ্টি অবরোধকারীও নয়। এ দেওয়াল ঠিক বাড়ির পাঁচিলের মতো, সে শুধু উচ্চতায়। তা না হলে এমন মজবুত প্রাচীর সচরাচর দেখা যায় না। মাঝে মাঝে এই প্রাচীরের মধ্যে ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। পিছনের দিকে হয়তো সিঁড়িও আছে। সব চেয়ে আশ্চর্য

লাগছিল এই দেখে যে প্রাচীরের শেষ দেখা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মিস্টার বোসকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি বললেন ঃ ট্রেনে চেপে গয়া যাবার পথে পাটনার পরে একটা স্টেশনের নাম পুনপুন। পুনপুন নামে একটি নদী এই জায়গার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। এক সময় এই নদীর আস্ফালন খুব বেশি ছিল, প্রায়ই তার জলোচ্ছ্বাস এই অঞ্চলটা ভাসিয়ে দিত, রাস্তা যেত বানের জলে ডুবে। সেদিন এই পথটাকে রক্ষা করবার জন্যেই এই বাঁধ দেওয়া হয়েছিল।

এখন বুঝি এই বাঁধের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ?

মিস্টার বোস বললেন ঃ তা তো বুঝতেই পারছেন। মাঝে মাঝে যে ফাঁক দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে দরজা ছিল, প্রয়োজন হলেই সে সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে জল আটকানো হত।

বেশি দূরে আমাদের যেতে হল না। গুলজারবাগ স্টেশনের কাছে পৌঁছবার আগেই রাস্তার ধার ঘেঁষে মিস্টার বোস গাড়ি থামালেন। তাঁকে নামতে দেখে আমরাও নেমে পড়লুম।

চারি দিকে তাকিয়ে শীলা বলে উঠল ঃ কোথাও কিছু দেখছি না তো!

মিস্টার বোস রাস্তা পার হয়ে একটা ফটকের ভিতরে ঢুকছিলেন, বললেন ঃ একটুখানি কষ্ট করতে হবে।

এই ফটক পেরিয়েই সেই বিরাট এলাকা জুড়ে অশোক রুইন্‌স্‌, সম্রাট অশোকের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আমি দেখেছি। মাটি খুঁড়ে অনেক কিছু বার করা হয়েছে। মাটির উপরেও আছে অনেক কিছু। এক নজরেই চোখের সামনে একটা গৌরবময় অতীতের চিত্র ধরা দেয়, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় খানিকক্ষণ, তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নতুন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হয়। কিন্তু এখানে তেমন নয়। এখানে কোন ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন চোখের সামনে দেখা গেল না। একটা বিরাট এলাকা জুড়ে

সাজানো বাগান। বড় বড় গাছ ছায়া বিস্তার করে সর্বত্র একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাঁধানো পথ ধরে আমরা খানিকটা এগিয়ে গেলুম।

একটা ছোট ঘরের বারান্দায় টেবিল চেয়ার নিয়ে একজন লোক বসে আছে। তারই কাছ থেকে টিকিট নিতে হল। দর্শনী দিয়ে এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু দেখতে হয়।

এই ঘরেরই বারান্দায় খানকতক ছবি টাঙানো আছে। বিহারের নানা জায়গার ছবি। ভিতরেও কিছু দেখবার আছে—কাচের শো-কেসে রক্ষিত কিছু প্রাচীন তৈজসপত্র, আর কতকগুলি আলোক-চিত্র। একদা যখন এই এলাকার মাটি খোঁড়া হয়েছিল, তখন অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছিল। একটা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। পাথর কাঠ আর নিত্য ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র। অনেক কিছুই আবার মাটি চাপা পড়ে গেছে। যা পড়ে নি লোকে এখন তাই দেখতে আসে। কোন গাইড এখানে নেই। এই এলাকার ভিতরে বাগানের একেবারে পশ্চিম দিকে একটি অফিস আছে। কী একটা ছুটির দিন বলে তা বন্ধ ছিল। কাজেই যা দেখবার তা আমাদের নিজেদেরই দেখতে হবে।

মিস্টার বোস বললেন: এস এস, আমিই সব দেখিয়ে দিতে পারব।

বলে প্রথমেই তিনি আমাদের পূর্ব দিকের সীমানায় টেনে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতেই বললেন: বেশি দিন আগের কথা নয়, ১৯৩০ সনে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই স্থানের সংবাদ পেয়েছিলেন। কে কী ভাবে জেনেছিলেন জানি নে, খোঁড়াখুঁড়ি করে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন পাটলিপুত্র। আশিটি স্তম্ভের একটি ঘর ও তার কাঠের পাটাতনের কিছু নমুনা পেয়েই প্রচার করলেন যে পুরাকালের পাটলিপুত্রের উপরেই এই কুমড়ার গ্রাম, কয়েক শো বছর ধরে ভারতের রাজধানী ছিল এইখানে। বাকিটুকু গোপালবাবু বলবেন।

বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

তখন আমরা যথাস্থানে পৌঁছে গেছি। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে আমাদের পথ যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানেই একটি শুকনো পুকুরের মতো বিস্তীর্ণ এলাকা। তার ভিতরে সারি সারি স্তম্ভ। একটাও এখন গোটা নেই। দু একটা উঁচু আছে, আর বাকি সবই নিচু, একটাকে পায়ের উপরে তুলে একটা বেদীর উপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার গায়ে আমরা হাত বুলিয়ে দেখলুম, বালি পাথরের মসৃণ থাম। অশোকের স্তম্ভ বলতে আমরা যে গোলাকার মসৃণ স্তম্ভের কথা ভাবি, ঠিক সেই রকমই। কোন কাঠের পাটাতন আমরা দেখতে পেলুম না। এই কাঠ দেখেছিলুম অন্যত্র। যেখানে টিকিট কাটতে হয়, সেই ঘরের কাছেই রাখা আছে। রঙ তার কালো, কাঠ না পাথর তা বোঝবার জন্য সময় লাগে।

শীলা বলে উঠল: আসুন না গোপালবাবু, নিচে নেমে একটু কাছে থেকে দেখে আসি।

বলে কারও অপেক্ষা না করেই নেমে গেল।

আমি অনিমেষের দিকে তাকালুম। তারপরে নেমে গেলুম শীলাকে অনুসরণ করে। নরম সবুজ ঘাসে সব কিছু আচ্ছন্ন, তারই মাঝে মাঝে পাথরের স্তম্ভের খানিকটা অংশ উপরে জেগে আছে। আর দূরে কয়েকটি তাল গাছ প্রহরীর মতো নিঃশব্দে আছে মাথা উঁচু করে। আমাকে দেখতে পেয়ে শীলা বলে উঠল: কী আশ্চর্য দেখুন। এত বড় সাম্রাজ্যের এই পরিণতি!

আমি বললুম: দুনিয়ার এই তো নিয়ম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শীলা বলল: এরই জন্যে এত!

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। শীলা বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল সব চেয়ে বড় থামটার দিকে। কাছে গিয়ে সেই পাথরের উপরে হাত বুলোল। তারপরে আমার দিকে চেয়ে বলল: সম্রাট

অশোককে ছুঁয়ে দেখলাম। ইতিহাসের পাতায় তাঁকে মৃত দেখেছিলাম।

ফিরে আসবার সময় শীলা হেসে উঠল, বলল: আপনার খুব আশ্চর্য লাগছে না!

রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে অনিমেষ আমাদের দেখছিল। মিস্টার বোস খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখছিলেন, আর শীলার দিদি মাথায় আঁচল দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা গাছের ছায়ায়। দুপুরের রোদ তাঁর ভাল লাগছিল না। আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে শীলা বলল: বড় নির্বিকার ভাবে আপনি এ সব দেখেন!

এ মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ আমি করলুম না। ধীরে ধীরে উঠে এলুম উপরে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে মিস্টার বোস বললেন: এই দিকে একবার আসবেন গোপালবাবু, আপনার খোরাক পাবেন।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি বোর্ড দেখতে পেলুম। কালোর উপরে সাদা হরফে এই ধ্বংসাবশেষের পরিচয় লেখা আছে। প্রাচীন পাটলিপুত্রের একাংশ হল এই কুম্‌রাহ্‌র। এখানকার মাটি খুঁড়ে পাঁচটি যুগের ধারাবাহিকতা দেখা গেছে। খ্রীষ্টের জন্মের ছশো বছর আগে থেকে ছশো বছর পর পর্যন্ত চারটি যুগের ধারা অব্যাহত ছিল। পঞ্চম যুগের আরম্ভ ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। যে ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা গেছে, তা খ্রীষ্টের জন্মের তিন চার শো বছর পূর্বে নির্মিত মৌর্য সম্রাটদের একটি স্তম্ভময় গৃহ। বালি পাথরের মসৃণ স্তম্ভ ও কাঠের পাটাতনের নমুনা রক্ষা করা হয়েছে।

আমার পড়া শেষ হতেই মিস্টার বোস বললেন: টুকে রাখবেন?

আমি হেসে বললুম: আশা করি মনে থাকবে।

এর পরে আমরা দক্ষিণের দিকে এগিয়ে গেলুম। সেদিকে পিকনিকের জায়গা। ছোট বড় অনেকগুলি দল চারি দিকে এলো-মেলো ভাবে ছড়িয়ে বসেছে। অনেকে রেঁধে বেড়ে খেয়েছে, আবার অনেকে বাড়ি থেকে আনা খাবার চাদরের উপরে বসে খেয়েছে। বড় বড় টিফিন ক্যারিয়ার ও জলের পাত্র দেখতে পাচ্ছি। তাদের বিরক্ত করতে আমরা গেলুম না।

এক জায়গায় 'লেক' কথাটি লেখা দেখে হ্রদ দেখতে এগিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু জলের বদলে বড় বড় ঘাস দেখে ফিরে এলুম। নানা জাতের পাতার গাছ আছে পথের ধারে ধারে, সময় হলে হয়তো ফুলও ফুটবে নানা রঙের। সমস্ত এলাকাটা ঘুরে আবার আমরা ফটকের কাছে ফিরে এলুম।

শীলা বলল : এই-ই সব!

মিস্টার বোস বললেন : আরও কিছু দেখবার শখ আছে বুঝি!

দেখবার কিছু থাকলে দেখব বইকি!

মিস্টার বোস বললেন : আছে দেখবার, কিন্তু তার হদিস আমি জানি নে। উত্তর-পশ্চিমে খুব কাছে যে জায়গা, নাম ভিখ্‌না পাহারি। সম্রাট অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্রের জন্য আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন সেই স্থানে।

মিস্টার বোস আমাদের একটি কুপের কথাও বললেন। একদা সেই কুপ নাকি সুড়ঙ্গপথে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই স্থানটিও নিকটে।

বাহিরে এসে পথের উত্তরে একটা ছোট মসজিদ দেখতে পেলুম। চার পাশে অনেকগুলো মিনার। আর মাথার উপরে একাধিক গম্বুজ। ছোটবড় নানা আকারের খেজুর গাছ দেওয়াল ঘেঁষে উপরে উঠেছে। এই মসজিদটির কাছেই আমরা গাড়ি থেকে নেমেছিলুম, কিন্তু তখন ভাল করে দেখি নি। এইবারে জিজ্ঞাসা করলুম : এরই নাম কি শাহী মসজিদ?

মিস্টার বোস বললেন ঃ খানিকটা এগিয়ে আরও একটা ভাঙা মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। এর কোন্‌টা শাহী মসজিদ তা বলতে পারব না। তবে শাহী মসজিদ যে শের শাহর তৈরি তা জানি, তার বয়স হয়েছে চারশো বছরের বেশি।

আমরা গাড়িতে উঠলুম। মিস্টার বোস গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। খানিকটা এগিয়ে এসে বললেন ঃ মসজিদের কটা গম্বুজ আর মিনার দেখলেন বলুন তো!

আমি বললুম ঃ গুনি নি।

মিস্টার বোস বললেন ঃ শুনেছি যে শাহী মসজিদের একটি গম্বুজ ও চারটি মিনার।

তাহলে এটা শাহী মসজিদ নয়। এর গম্বুজ আর মিনার দুই-ই বেশি।

শীলার সঙ্গে তার দিদি আস্তে আস্তে কথা কইছিলেন, আর অনিমেষ চুপ করে বসে ছিল। আমিও সামনের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে রইলুম।

শীলার একটা কথা আমার মনে পড়ল। পাথরের একটা থামের উপরে হাত বুলিয়ে সে বলেছিল, সম্রাট অশোককে ছুঁয়ে দেখলাম।

আমার মনে হল যে কোন দেশের কোন মানুষ তাঁকে আজও ছুঁতে পারে নি। পৃথিবীর শৈশব থেকে এ পর্যন্ত যত সম্রাট জন্মেছেন নানা দেশে, তাঁদেরও কেউ কোন দিন অশোককে স্পর্শ করতে পারেন নি। রক্তাক্ত কৃপাণ ফেলে দিয়ে তিনি রাজ্যশাসন করেছেন প্রেম দিয়ে, অহিংসার বাণী ছিল তাঁর রাজদণ্ড। সেই দণ্ডে তিনি অখণ্ড ভারতকে বিশ্বের মহত্তম সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত বিরাট সাম্রাজ্য তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার, অশোকবর্ধন বিন্দুসারের পুত্র। খ্রীষ্টের জন্মের দুশো তিয়াত্তর বৎসর পূর্বে তিনি পাটলিপুত্রের

সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কলিঙ্গ বিজয় তাঁর প্রথম অভিযান। বিনাযুদ্ধে কলিঙ্গবাসী তাদের রাজ্য ছেড়ে দেয় নি। বুকে বর্ম বেঁধে দলে দলে বীর ছেলেরা এসেছিল বাধা দিতে। তাদের তাজা রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। অশোক এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তারপরে রাজধানীতে ফিরে দীক্ষা নিয়েছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে। বুদ্ধ তখন গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর ধর্ম শুধু ভারতের একাংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। অশোক বৌদ্ধ হয়ে ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। দেশের সর্বত্র পর্বতগাত্রে প্রস্তরস্তম্ভে তিনি বুদ্ধের বাণী লিখে দিলেন সাধারণ মানুষের জন্যে। ধর্মপ্রচার সমিতি গঠন করে দেশে দেশে প্রতিনিধি পাঠালেন, নিজের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে পাঠালেন সিংহলে, বিভিন্ন বৌদ্ধ মতের সমন্বয়ের জন্য পাটলিপুত্রে এক মহাসভার অধিবেশন করলেন। প্রজাদের নৈতিক জীবনের মানোন্নতি তাঁর নিজের জীবনের ব্রত হল। তিনি ধর্মমহামাত্য নামে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করলেন, তাঁর ভোজনাগারে পশু পক্ষী হত্যা নিষিদ্ধ হল, রাজ্যে অনর্থক প্রাণী হত্যা তিনি রহিত করলেন। জনহিতকর কার্যের জন্য তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করতে লাগলেন। সফল হয়েছিলেন সম্রাট অশোক। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তাঁর জীবনের আদর্শকেই সম্মান করেছিল। পরধর্মে হস্তক্ষেপের অপবাদ অশোকের নেই। নিজের জীবন দিয়ে তিনি ধর্মানুসরণের পথ দেখিয়েছিলেন। এই ভিক্ষু সম্রাটের জীবনাবসানে দেশের সমস্ত প্রজা অশ্রুবিসর্জন করেছিল। বিশ্বের ইতিহাসে এমন একজন সম্রাটের উদাহরণ আর একটিও নেই। মহিমায় কেউ তাঁকে আজও স্পর্শ করতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে আমার মেগাস্থিনিসের কথা মনে পড়ল। ভারতের ইতিহাসে মেগাস্থিনিস একটি অবশ্য স্মরণীয় নাম। অনেকে মনে করেন যে গ্রীস দেশের সেই দূত এ দেশে এসেছিলেন বলেই ভারতে

ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। সে যুগের ঘটনাবলীর লিখিত বিবরণ আমরা তাঁর ইণ্ডিকা গ্রন্থে প্রথম পেয়েছি। অশোক রাজা হবার পূর্বেই তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। যীশু জন্মেছিলেন আরও সোয়া তিন শো বছর পরে।

ভারতের অতুল ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা বিদেশীদের অজানা ছিল না। মাঝে মাঝেই তারা ভারতে আসবার চেষ্টা করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসেছিলেন পারস্যের বাদশাহ দারায়ুস। পাঞ্জাবের কতকাংশ তিনি অধিকার করেছিলেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল। ,৩২৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মাসিডোনিয়ার বীর আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারত আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ফিলিপ জয় করেছিলেন গ্রীস, আর আলেকজাণ্ডারের বুকে ছিল পৃথিবী জয়ের পরিকল্পনা। কিন্তু তাঁর সেনাদলের প্রবল প্রতিবাদে বিপাশার পূর্বে আর অগ্রসর হতে পারলেন না। শুধু পাঞ্জাব তিনি জয় করেছিলেন, কিন্তু ভোগ করতে পারেন নি। ভারতে তিনি দু বছর ছিলেন এবং দেশে ফেরার পথে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই গ্রীক অভিযানের বিরুদ্ধে যিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর নাম চন্দ্রগুপ্ত। লোকে বলে যে মগধের নন্দবংশে তাঁর জন্ম, কিন্তু রাজার কুনজরে পড়ে পাঞ্জাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েই তিনি গ্রীকদের তাড়িয়ে পাঞ্জাব অধিকার করলেন, তারপর নন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে বসলেন। আলেকজাণ্ডারের এক সেনাপতি সেলিউকস এসেছিলেন পাঞ্জাব পুনরুদ্ধার করতে, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের হাতে তাঁর বিষম পরাজয় হয়। সেলিউকস কাবুল কান্দাহার ও হিরাট প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। শোনা যায় যে সেলিউকস তাঁর কন্যাকেও চন্দ্রগুপ্তের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। এর পরেই এই গ্রীক রাজা মেগাস্থিনিসকে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্তের

সভায়। পাটলিপুত্রে ইনি বহু দিন বাস করেছিলেন, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে দেখেছিলেন ঘনিষ্ঠ ভাবে। ভারতীয়দের আচার ব্যবহার ধর্মনিষ্ঠা রাজা ও রাজ্যের অনেক কথা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ইণ্ডিকা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আজও এই গ্রন্থ ভারত সম্বন্ধীয় একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হচ্ছে। একজন বিদেশী তো বলেছেন যে এ রকমের মূল্যবান আর একখানি গ্রন্থ আজও পর্যন্ত লিখিত হয় নি।

গাড়িতে সবাই আমরা নিঃশব্দে বসে ছিলুম। যে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে আমরা এসেছিলুম তা খোলা ছিল। কিন্তু মিস্টার বোস সে দিকে ঘুরলেন না। বললেন: চলুন, এবারে আপনাকে অন্য দিক দিয়ে নিয়ে যাই।

বলে সোজা রাস্তাতেই এগিয়ে গেলেন।

এই পথের ডান ধারে রেলপথ, আর বাঁ ধারেও একটা নূতন পল্লী গড়ে উঠছে। দূরে অনেক নূতন বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

প্রাচীন পাটলিপুত্র হয়তো এ অঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল, হয়তো আরও বিস্তৃত ছিল নগরের পরিধি। যে শোন নদী আজ অনেক দূর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে অনেক মাইল পশ্চিমে, সেই শোন নদী একদা পাটলিপুত্রের সীমানায় প্রবাহিত হত। শোন ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলেই এই নগর ছিল অবস্থিত। রাজা অজাতশত্রু একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন প্রাচীন পাটলি গ্রামে। বুদ্ধ তখন জীবিত, তিনি এই স্থানের সমৃদ্ধির কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। অজাতশত্রুর মৃত্যুর পরে শৈশুনাগ বংশের দ্বিতীয় রাজা উদয় রাজগৃহ থেকে রাজধানী অপসারিত করে এইপাটলিপুত্রে এনেছিলেন। এইখানেই গড়ে উঠেছিল নূতন রাজধানী। উদয়ের পর নন্দীবর্ধন ও মহানন্দী নানাদেশ জয় করে মগধের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছিলেন। এই বংশের দশজন রাজা রাজত্ব করবার পর মহাপদ্ম নন্দ নামে এক শূদ্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। ঐতিহাসিক

যুগে এই নন্দই আর্যাবর্তের প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করে। মহারাজ নন্দের আটজন পুত্র ছিল, তাঁরা এক সঙ্গে না পর পর রাজত্ব করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। তাঁদের রাজত্বকালে আলেকজাণ্ডার আক্রমণ করেছিলেন ভারতবর্ষ। আর তার দু-তিন বছর পরে চন্দ্রগুপ্ত অধিকার করেছিলেন মগধের সিংহাসন।

গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস এসেছিলেন চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায়। পাটলিপুত্র তখন আর নূতন নগর নয়, তার বয়স হয়েছে দেড়শো বছরেরও বেশি। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই নগরের পত্তন হয়েছিল। কিন্তু মেগাস্থিনিসের বিবরণে তার সমৃদ্ধির কথা পড়লে আশ্চর্য হতে হয়।

এ যুগের পাটনার মতো সেকালের পাটলিপুত্রও প্রায় চতুষ্কোণ আকারের ছিল। সমগ্র নগরটি ছিল প্রাচীরে বেষ্টিত, আর শোন নদেব জল প্রবাহিত হত প্রশস্ত পরিখায়। মাটি ও কাঠের নির্মিত প্রাচীরের উপর দিয়ে নাকি রথ চলাচলের পথ ছিল। চৌষট্টি প্রবেশ পথ ও পাঁচ শোর বেশি চূড়া ছিল চারি দিকের প্রাচীরে। রাজপ্রাসাদ নির্মাণেও বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল মূল্যবান কাঠ। এ কথা বিশ্বাস করা হত যে এমন অতুলনীয় প্রাসাদ সে যুগের বিশ্বে আর কোন রাজার ছিল না। মিশর ও ব্যাবিলনের প্রাসাদও পাটলিপুত্রের প্রাসাদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। নানা জাতের সুদৃশ্য বৃক্ষলতার বিরাট এক বাগানের মধ্যে ছিল রাজপ্রাসাদ। বহু পশু পাখি সেখানে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াত। কতকগুলি সুন্দর ফোয়ারা ছিল। অন্ধকার রাতে যখন নানা রঙের বাতি জ্বালানো হত, তখন সব কিছু স্বপ্ন রাজ্যের বলে সকলের মনে হত। এই নগরে এমন অনেক অপরূপ অট্টালিকা ছিল যে প্রায় ছশো বছর পরেও চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন এসে বলেছিলেন যে সে সব সৌধ মানুষের তৈরি বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের অনেক কথা মেগাস্থিনিস লিখে রেখে গেছেন।

আজকের মতো জীবনযন্ত্রণা ছিল না সে যুগে। বাঁচবার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হত না। অভাব ও দুর্ভিক্ষের কথা তারা শোনে নি। বহুমূল্য বসনভূষণ তারা ভালবাসত। কিন্তু জীবনযাত্রা ছিল সরল, নৈতিক জীবনে ছিল না মালিন্য। সৎ সত্যবাদী ধার্মিক বলে তারা সম্মানিত ছিল। দেশে চুরি ডাকাতির কথা শোনা যেত না। অসামাজিক কাজের জন্য রাজদণ্ড ছিল নিষ্ঠুর, হাত পাও নাকি ছেদন করে দেওয়া হত। মদ্যপান দেশে প্রচলিত ছিল না, যজ্ঞকালে বাধা না থাকলেও অন্য সময়ে তা নিন্দনীয় ছিল। দেশে যেমন দাসপ্রথা ছিল না, তেমনি সাধারণ মানুষের স্বাধীনতায় রাজা হস্তক্ষেপ করতেন না।

মেগাস্থিনিস এ দেশের মানুষের সাতটি শ্রেণী দেখেছিলেন। কৃষক ও পশুপালক দেখেছেন গ্রামাঞ্চলে, রাজধানীতে দেখেছেন মন্ত্রী ও অমাত্য, সৈনিক দেখেছেন, আর দেখেছেন শিল্পী ও দার্শনিক। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণকে তিনি দার্শনিক বলেছেন। মন্ত্রী কয়েকজন না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই তাদের একটা শ্রেণী বলতেন না। অবশ্য চাণক্যের মতো মন্ত্রী বিশ্বে একজনই ছিলেন এবং তিনি ছিলেন চন্দ্রগুপ্তেরই মন্ত্রী। অন্য নাম তাঁর কৌটিল্য। অর্থশাস্ত্র নামে তিনি যে গ্রন্থ লখেছিলেন, আজও তা রাজনীতির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হচ্ছে। কিছু দিন পূর্বে দক্ষিণ ভারতে একখানি সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ পাওয়া গেছে। অনেকে তা চাণক্যেরই অর্থশাস্ত্র মনে করেন। অনেকে আবার পরবর্তীকালের রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও রাজ্যশাসনের উৎকর্ষের কথা দেখে বিস্মিত হই। যুদ্ধ পরিচালনা সন্ধি কূটনীতি গুপ্তচর নিয়োগ রাজস্ব আদায় প্রভৃতি রাজকার্যের বশদ বিবরণ আজও কার্যকরা বলে মনে হয়।

রাজকার্যে উপদেশ দেবার জন্য রাজার মন্ত্রিসভা ছিল এবং

গুরুতর ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আর একটি পরিষৎ ছিল। সবাইকে এক সঙ্গে ডেকে রাজা পরামর্শ নিতেন। মন্ত্রীদের অনেক ক্ষমতা ছিল এবং রাজার স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। জনসাধারণের মতামতকে যে রাজা সম্মান করতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রজার বিরাগভাজন হবার সাহস রাজার ছিল না। তাতে শুধু সিংহাসন হারানো নয়, প্রাণ হারানোর সম্ভাবনাও থাকত। রাজা নিজেকেও একজন প্রজার কল্যাণকামী কর্মচারী বলে মনে করতেন। এ কালের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সে কালের রাজার খুব বেশি পার্থক্য ছিল না।

মেগাস্থিনিসের লেখায় আমরা পাটলিপুত্রের পৌরসভার পরিচয়ও পাই। তিরিশজন সদস্যের সেই পৌরসভা ছটি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। এক একটি সমিতির পাঁচজন করে সদস্য, আর তাদের কাজও সুনির্দিষ্ট ছিল। একটি সমিতি জন্মমৃত্যু ও লোক-সংখ্যার হিসাব রাখত, একটি সমিতি তত্ত্বাবধান করত বিদেশী আগন্তুকদের। একটি সমিতি শিল্পী ও কারিগরদের দেখত। আর একটি সমিতি দেখত ব্যবসায় ও বাণিজ্য। শিল্পপতিদের দেখবার জন্যেও একটি সমিতি ছিল, এবং আর একটি সমিতির উপরে বিক্রয় শুল্ক আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। তারা ক্রয়মূল্যের দশমাংশ আদায় করত।

পাটলিপুত্রের রাজপথ ছিল প্রশস্ত এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত সেই রাজপথ বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের সর্বত্র স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। শস্যক্ষেত্রে জল-সেচের ব্যবস্থাও ছিল সন্তোষজনক। উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ ছিল রাজস্ব।

মেগাস্থিনিসের বিবরণে আমরা সামরিক বিভাগ পরিচালনার কথাও পাই। এই বিভাগেও তিরিশ জন সদস্য ও তাঁদের ছটি সমিতি। প্রথম পাঁচটি সমিতির উপরে ভার ছিল সেনাদলের রণতরী পদাতিক অশ্বারোহী রথ ও হস্তিবাহিনীর পরিচালনার। ষষ্ঠ

সমিতি এই সেনাদলের জন্য রসদ ও যানবাহন সরবরাহের কাজে ব্যাপৃত থাকত। চন্দ্রগুপ্তের সেনাদলে প্রায় সাত লক্ষ সৈন্য ছিল। তার মধ্যে পদাতিকের সংখ্যা ছ লক্ষ, ন হাজার হাতী ও ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী। রথের সংখ্যাও কম ছিল না।

সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হয় এই কথা জেনে যে রাজ্যের সমস্ত খবর নিজে রাখতেন। শুধু প্রজাদের খবর নয়, রাজকর্মচারীদের খবরও রাজা রাখতেন। এই সব খবর তিনি গুপ্তচর বিভাগ থেকে পেতেন। শোনা যায় যে পাটলিপুত্রের হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলিও সরকারী আয়ত্তে ছিল এবং এই সব স্থান থেকেও গুপ্তচরেরা সংবাদ সংগ্রহ করত। শিক্ষিত পেশাদার মহিলাদের কাছ থেকেও অনেক খবর পাওয়া যেত।

এর চেয়েও আশ্চর্যের খবর হল যে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন ত্যাগ করে জৈন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন ও শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন মহিসুর রাজ্যের শ্রবণবেলগোলা নামক স্থানে। জৈন ধর্মানুসারে অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

৩০

সন্ধ্যা হবার অনেক আগেই আমরা বাড়িতে ফিরে এলুম। গাড়ি থেকে নেমেই শীলার দিদি ব্যস্ত হয়ে ছুটলেন। শীলা বলল: কোথায় ছুটছ দিদি?

শীলার দিদি বললেন: আমার কি আর সুস্থ হয়ে বসবার জো আছে! বাবাজী কি করছে দেখি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: বাবাজী!

শীলার দিদি বললেন: ভারি মেজাজ আমাদের বাবাজীর। হাতের কাছে সব কিছু এগিয়ে না দিলে ঘরের কোথাও মুখ গুঁজে বসে থাকবে।

আমি বললুম: তাঁকে আমরা সঙ্গে নিয়ে গেলুম না কেন?

অনিমেষ আশ্চর্য হয়ে বলল: বাবাজীকে সঙ্গে নিবি কেন?

আমাদের কথা শুনে মিস্টার বোস হেসে উঠলেন উচ্চ স্বরে, বললেন: বাংলা দেশের লোক সবাই এই ভুল করে। তোমার গল্পটা বল না গোপালবাবুকে।

শীলার দিদি এবার হাসতে হাসতে ফিরে এলেন, বললেন: ও, আপনিও দেখছি আমার মতোই ভুল করেছেন।

বলে একটা গল্প শোনালেন। নতুন বউ হয়ে তিনি যখন এ দেশে এসেছিলেন, তখন রাঁধুনি বামুনকে ডেকেছিলেন ঠাকুর বলে। সে কোন উত্তর দেয় নি, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই দেখা গেল যে বাক্স বিছানা নিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। শাশুড়ী চেঁচিয়ে বললেন, এ কি, এ কি, কোথায় যাচ্ছ তুমি! হাঁড়ির মতো মুখ করে সে বলল, এ বাড়িতে আর চাকরি করব না। কেন? অপমান করেছে নতুন বউ। শাশুড়ী আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি, বউমা আবার কখন

অপমান করলেন! কেন, আমি কি ঠাকুর! জাতে আমি বামুন নই! শাশুড়ী হেসে বললেন, ওমা, এই কথা! আমাদের বাঙলা দেশে যে রাঁধুনি বামুনকে ঠাকুর বলে। তারপরে নতুন বউটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ও বউমা, ওকে আর কখনও ঠাকুর ব'লো না, এ দেশে নাপিতকে ঠাকুর বলে, আর রাঁধুনি বামুনকে বলে বাবাজী।

শীলার দিদি হেসে বললেন: সেই থেকে আর কখনও ঠাকুর বলি নি, বাবাজী বলা অভ্যেস হয়ে গেছে।

আমি উপভোগ করলুম এই গল্পটি, বললুম: তাইতেই বোধ হয় বাঙলা দেশের শ্বশুর শাশুড়ী জামাইকে আর বাবাজী বলেন না প্রাচীনরা বলেন বাবাজীবন আর নবীনরা শুধু বাবা বলেন। বাবাজী বলতে এখন আমরা সাধুসন্ত বুঝি।

হাসতে হাসতে শীলার দিদি রান্নাঘরের দিকেই এগিয়ে গেলেন। আর মিস্টার বোস শীলাকে বললেন: এস, আমরা কালকের প্রোগ্রামটা তৈরি করে ফেলি।

সেই ভাল।

বলে শীলা বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

বসবার ঘরে বসে মিস্টার বোস বললেন: আমার আর একটি দিন মাত্র ছুটি! এই দিনটিও আনন্দে কাটাতে হবে, কী বল ব্রাদার!

বলে তিনি অনিমেষের দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর শীলা দিল, বলল: নিশ্চয়ই। গোপালবাবু কিছু সাজেস্ট করুন।

আমি বললুম: আমাকে মুক্তি দিন, ভোর বেলায় আমি ট্রেনে উঠব।

মিস্টার বোস বললেন: আমি রাজী নই, তোমার কী মত?

বলে তিনি শীলার দিকে তাকালেন।

শীলা বলল: আমিও রাজী নই।

মিস্টার বোস সোফার হাতলে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে

বললেন ঃ কাস্টিং ভোট আমার, কাজেই ব্রাদার, তুমি তোমার বন্ধুর দিকে গেলেও হেরে যাবে। এইবারে ঠিক করুন, কোথায় যাওয়া যায়। নালন্দা দেখেছেন বলেছিলেন, বুদ্ধগয়া তো দেখেন নি ?

শীলা বলে উঠল ঃ তবে আমরা বুদ্ধগয়া দেখতেই যাব।

কিন্তু মিস্টার বোসকে বড় বিমর্ষ দেখা গেল। তাই দেখে শীলা বলল ঃ কেন, জামাইবাবুর পছন্দ হল না বুঝি !

মিস্টার বোস চিন্তিত ভাবে বললেন ঃ প্রস্তাবটা পছন্দমতো হয়েছে, কিন্তু যাতায়াতের একটু অসুবিধা। মানে, মোটরে অনেক ঘুরে যেতে হয়, পুনপুন নদীর ওপরে এখনও পুল হয় নি।

শীলা বলল ঃ তবে ট্রেনেই চলুন।

সে আইডিয়া মন্দ নয়।

বলে উঠে গিয়ে মিস্টার বোস একখানা টাইম টেবল নিয়ে এলেন।

সময় দেখে ঠিক হল যে আমরা সকাল সাড়ে ছটায় রওনা হয়ে রাত আটটায় ফিরে আসব। মোটরে যাবার অসুবিধার কথা আমি জেনে নিলুম। পাটনা থেকে বক্তিয়ারপুর হয়ে বিহার-শরিফের উপর দিয়ে নওয়াডার ধার দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে আমাদের যেতে হবে। ট্রেনে উঠলে আড়াই ঘণ্টাতেই পৌঁছনো যায়। কাজেই ট্রেনে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু অসুবিধাও আছে। গয়া স্টেশন থেকে বুদ্ধগয়া মাইল সাতেক দূরে।

আমি বললুম ঃ দিদি আমাদের সঙ্গে যাবেন তো ?

মিস্টার বোস গম্ভীর ভাবে বললেন ঃ আমাদের সৌভাগ্যে যাবেন না। কিন্তু গোপালবাবুর ভাগ্যের কথা জানি নে।

আমি বললুম ঃ যদি অনুমতি দেন তো চেষ্টা করে দেখি।

বেয়ারার হাতে চায়ের ট্রে দিয়ে শীলার দিদি ঘরে আসছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই মিস্টার বোস বললেন ঃ সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি।

শীলার দিদি বললেন: কিসের অনুমতি ?

বললুম: ভাবছি কাল সকাল বেলায় গয়া হয়ে কাশী চলে যাব।

শীলার দিদি বললেন: কালই চলে যাবেন।

বলে মিস্টার বোসের দিকে তাকালেন।

মিস্টার বোস বললেন: উনি আর একটি দিনও এখানে থাকবেন না বলছেন।

আমি বললুম: কিন্তু দিদি যদি রাজী হন, তাহলে আর একটি দিন আমি আপনাদের সঙ্গে কাটাতে পারি।

শীলার দিদি বললেন: বেশ তো।

মিস্টার বোস বলে উঠলেন: কথা দিলে তো, তাহলে কাল ভোরের ট্রেনে গয়া যেতে হবে। আমাদের পিকনিক কাল বুদ্ধগয়ায়।

বললুম: ভুল হল। সকালে আমরা বিষ্ণুপাদ মন্দির দেখব, তারপরে স্টেশনের রেস্টরেণ্টে খেয়েদেয়ে বুদ্ধগয়ায় যাব। প্রথমে ধর্মকর্ম, তার পরে পিকনিক।

শীলার দিদি বললেন: সত্যিই, বিষ্ণুপাদ মন্দির আমি অনেক দিন দেখি নি।

মিস্টার বোস চেঁচিয়ে উঠলেন: পরীক্ষায় পাস হয়ে গেলেন গোপালবাবু, কী পুরস্কার চাই বলুন।

আমিও খুশী হয়ে বললুম: বিহারের মানুষের কথা বলুন।

মিস্টার বোস চায়ের পেয়ালা হাতে পেয়েছিলেন, বললেন: নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু—

বলে এক চুমুক চা মুখে নিলেন, তারপরে বললেন: মানুষের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা ঠিক নয়, কারণ তাতে প্রাদেশিকতার নোংরামি এসে পড়বে। আসামে যেমন, বিহারেও কতকটা তেমনি। বিহার একদা বৃহত্তর বঙ্গের অংশ ছিল, এ কথাটা না বলাই আজকাল ভাল।

আমি বললুম: বুঝেছি। তার চেয়ে সামাজিক রীতিনীতির কথা কিছু বলুন।

মিস্টার বোস বললেন: সেও থাক্। তার চেয়ে এ দেশের সব চেয়ে বড় উৎসবের কথা বলি? তার নাম ছট্। দীপান্বিতার পরের ষষ্ঠীতে সূর্যের পূজো। পূজো ঠিক নয়, একে ব্রত বলা উচিত। এমন কঠিন ও সমারোহের ব্রত ভারতের আর কোথাও আছে বলে জানি না। তিন দিন ধরে এই ব্রত পালন করতে হয়, শেষ দিন রাজ্যের সমস্ত অফিস আদালত ছুটি। এবারে আসুন না কালীপূজোর পরে।

শীলার দিদি বললেন: ভাইফোঁটার দিন আসুন না ভাই।

ভাইফোঁটায়!

আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। ভাইফোঁটায় নিমন্ত্রণ আমাকে কেউ কখনও করে নি, আমার কথা সেদিন কারও মনে পড়ে না। অথচ বাঙলা দেশে সেও একটা উৎসবের দিন। সেও ব্রত। বাঙলা দেশের সমস্ত ভাইবোন সেদিন মিলিত হয়, বয়সের কথা কারও মনে পড়ে না। বৃদ্ধা বোনও সেদিন অতি বৃদ্ধ ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে বলে—

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।

মিস্টার বোস কিন্তু অন্য কথা বললেন: ভাইফোঁটাতেই আসুন, সেদিন আপনাকে একটা নতুন পূজো দেখাব—চিত্রগুপ্তের পূজো।

চিত্রগুপ্তের পূজোর কথা আমি শুনি নি।

শুনবেন কোথা থেকে! এ দেশে থাকুন কিছু দিন, তবেই জানবেন এ দেশের হালচালের কথা।

এর পরে মিস্টার বোস আমাদের এই দুই পূজোর কথা শোনালেন।

চিত্রগুপ্ত যমরাজের পেশকার, কিন্তু পরে তিনি মানী লোক

হয়েছিলেন। যমরাজ তাঁর সঙ্গে নিজের তগিনী যমীর বিবাহ দিয়েছিলেন। যম ও যমীর কাহিনী আমাদের বেদে আছে, যমীর কামনার কথা ও যমের সংযমের পরিচয়, কিন্তু চিত্রগুপ্তের সঙ্গে যমীর বিবাহের কথা নেই। পুরাণে যমের ভগিনীর নাম যমুনা। এঁদের পিতা সূর্য। সূর্যের শাপেই যম প্রজা সংযমন করছেন, আর যমুনা প্রবাহিত হয়েছেন নদী রূপে। কিন্তু পুরাণেও যমুনার বিবাহের কথা আমি পাই নি।

মিস্টার বোস বললেন ঃ চিত্রগুপ্তের সঙ্গে যমীর বিবাহের কথা আমি এ দিকের লোকের মুখে শুনেছি। যমীর কামনা পূরণে অসমর্থ ধর্মরাজ তাঁর সহযোগী চিত্রগুপ্তের সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন। যমদ্বিতীয়ায় চিত্রগুপ্তের জন্ম দিন, সেই দিন তাঁর পূজা হয়।

মিস্টার বোস একটু থেমে বললেন ঃ বোধ হয় জানেন না যে বিহার ও উত্তর প্রদেশের কায়স্থরা নিজেদের চিত্রগুপ্তের বংশধর বলে দাবি করেন। মাথুর সাক্সেনা শ্রীবাস্তব আস্থানা আম্বাস্তা কুলশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বারোটি শাখা এই বংশের। সংক্ষেপে আমরা এই পূজোকে লালাদের দোয়াত পূজো বলি। চিত্রগুপ্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পেশকার বলে লালারা সেদিন দোয়াত পূজো করবে, নিজের হাতে একটি কথাও লিখবে না। গোঁড়া যারা, তারা অফিস কাছারি থেকে ছুটি নেবে এই দিন, কিন্তু কিছুতেই কাগজে কালি দিয়ে কলমের আঁচড় কাটবে না।

ভারি আশ্চর্য তো।

বলে শীলা হেসে উঠল, বলল ঃ এ ঠিক আমাদের সরস্বতী পূজোর মতো। অনধ্যায়, তাই কিছুতেই বইএর দিকে তাকাব না। কোন লেখা চোখে পড়ে গেলেও চোখ বুজে ভাবব যে কিছুই দেখতে পাই নি।

মিস্টার বোস বললেন ঃ ছট্ পূজো কোন সম্প্রদায়ের পূজো নয়,

এর আবেদন কতকটা সার্বজনীন। এ দেশের সাধারণ মানুষ মানৎ করে নানা কারণে, বলে যে ফল পেলে এক বা একাধিক বছর ছট্ পুজো করবে। কেউ বা শুধু ধর্ম পালনের জন্যেই করে দু-এক বছর, কেউ সারা জীবন এই ব্রত পালন করে। শুধু বিহারে নয়, উত্তর প্রদেশের কিছু অঞ্চলেও এই পুজো প্রচলিত আছে।

চা খেতে খেতেই গল্প হচ্ছিল। শীলাব দিদি বললেন: এক দিনের ব্রত নয় বলেই এত কঠিন। বোধ হয় চতুর্থীর দিন থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় ষষ্ঠীতে। তৃতীয়ার রাত থেকেই নিয়ম পালন, চতুর্থীতে সারা দিন উপোস করে সন্ধ্যায় জল খায়, পঞ্চমীতে নিরম্বু উপবাস। সূর্যাস্তের সময় নদীর তীরে কিংবা পুকুর পাড়ে গিয়ে সূর্যের উপাসনা করবে, আর পরের দিন সূর্যোদয়ের সময় সূর্যকে অর্ঘ্য দিয়ে ব্রত শেষ।

মিস্টার বোস বললেন: গঙ্গার ধারে আপনাকে নিয়ে যাব। নৌকোয় কবে এই দৃশ্য দেখবেন। কাতারে কাতারে মেয়ে পুরুষ যখন সূর্যকে অর্ঘ্য দেয়, সে দৃশ্য একবার দেখলে জীবনে কখনও ভুলবেন না।

দু চোখ বিস্ফারিত করে শীলা বলল: সত্যি!

মিস্টার বোস বললেন: নানারকম বাদ্য পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ কলরব কোলাহলের মধ্যে পুরুষ ও মেয়েরা জলে নেমে সূর্যকে অর্ঘ্য দেয়। কোন বৈদিক পুজো নেই, কোন পৌরাণিক কাহিনী শুনি নি, শুধু সংস্কারের ভিত্তিতেই এত বড় একটা উৎসব অপরিসীম শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত হয়।

এক সময় শীলার দিদি তাঁর স্বামীকে বললেন: তোমার সেই গল্পটা এইবারে বল।

মিস্টার বোস বললেন: কোন্ গল্পটা?

সেই যে সেদিন বলছিলে, মারামারি করে এক দল লোক এসেছিল মামলা করতে।

মিস্টার বোস উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ গল্পের কপিরাইট কিন্তু আমার, ব্যবহার করলে রয়ালটি দিতে হবে।

গল্প শোনার আগ্রহে শীলা বলে উঠল ঃ রয়ালটি আমি দেব জামাইবাবু।

মিস্টার বোস এবারে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে গল্পটি বললেন।

মারামারি করে চারজন লোক এসেছিল আদালতে, চারজনেই চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে। আমার ভাগ্যেও এক মক্কেল জুটে গেল। সে বললে, যত টাকা লাগে লাগুক, সবাইকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু কিসের জন্যে শিক্ষা, সেই কথাটি বার করতে আমি হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলুম। সে এক অসম্ভব ব্যাপার। আমার মুনশী ওদের তিনটেকে ধরে না আনলে ব্যাপারটাই আমি বুঝতে পারতুম না।

শীলার দিদি সহাস্যে বললেন ঃ ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন হবে, এই নিয়েই লাঠালাঠি।

মিস্টার বোস বললেন ঃ অত তাড়াতাড়ি বলো না।

শীলা বলল ঃ আপনি ধীরে ধীরেই বলুন।

মিস্টার বোস বললেন ঃ যে তিনজন আমার কাছে এসেছিল, তাদের নাম লাল্লন সিং, রামজনম যাদব ও চুন্নু ঝা। যে এল না, তার নাম ঝাপ্পস ভুঁইয়া। সে কারও কথাই বোঝে না, বুঝতেও চায় না। সেই নাকি সরাসরি লাঠি চালিয়েছিল, আর বাকি তিন-জন লাঠি ধরেছিল আত্মরক্ষার জন্য।

শীলার দিদি সহাস্যে বললেন ঃ ওদের তর্কাতর্কি ওদের ভাষাতেই বল।

তাহলে রয়ালটি আরও বেড়ে যাবে।

শীলা বলল ঃ দেব দেব, পুরো রয়ালটি দেব আপনাকে।

মিস্টার বোস এবারে সোফার উপরে সোজা হয়ে বসলেন,

তারপরে শীলার দিকে তাকিয়ে বললেন : শোন তাহলে। আমার মক্কেলের নাম হল লাল্লন সিং, বাড়ি তার আরা জেলায়, ভাষা ভোজপুরী। সে তার নিজের ভাষায় বলেছিল, ভোজপুরী ভাষা পন্‌রহ্‌ জিলামে বোলল জালা। এক্‌রামে চার জিলা বিহারক, আউর ইগার জিলা উত্তর প্রদেশক সামিল বা। ভোজপুরী বোলেওয়ালা যেৎনা আদ্‌মি হিন্দুস্থানমে বান, ওৎনা কোনো এগো ভাষাক বোলেওয়ালা নেহি খঁ। বাঙ্গালক দেশ কুল চার জিলাক বাঁচল্‌বা, ত বিহারক দেখ্‌না কুল সত্‌রহ্‌ জিলা এগো সুবা বনল বা। আউর এক্‌রামেসে ভোজপুরী বোলেওয়ালা চারো বড়কা জিলা আরা ছাপরা পালামু আ মোতিহারি হঠা দেহলা পর বিহার কা আধা ন রহ যাই।

আমি আশ্চর্য হলুম এই দেখে যে মিস্টার বোস স্বচ্ছন্দে এই ভাষা বলে গেলেন, আর তাঁর কথার ধরন দেখে শীলা হেসে আকুল হল। মিস্টার বোস আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : মানে বুঝতে পেরেছেন তো ?

বললুম : কিছু পেরেছি। ভোজপুরী ভাষাভাষী জেলা চারটিকে বাদ দিলে বিহারের আধখানাই চলে যাবে।

মিস্টার বোস সানন্দে বলে উঠলেন : ঠিক বুঝেছেন। তাহলে শুনুন রামজনম যাদবের কথা। বাড়ি তার খাস পাটনা জেলায়। ভাষা মগধী। লাল্লন সিংএর কথার প্রতিবাদ করে সে বলেছিল, কী বোলহব ! হাম্মর মগধ সবকরমে পুরাণ রাজ হব। আপনেক মেজুকি লেখা নাল ঠোঁকওয়াইৎ হি। মগধরাজ আর মাগধী ভাষা কে না জানইৎ হব। আগর বিহার ক সুবামে কোন বদলাবদলি হোই, তো মগধ রাজ ছোড়কে দুসর রাজ না হো শকহি।

এবারে অনিমেষ বলল : একটা কথা বুঝতে পারলাম না।

মিস্টার বোস বললেন : না বোঝাই স্বাভাবিক। মেজুকি লেখা নাল ঠোঁকওয়াইৎ হি মানে ব্যাঙও ঘোড়ার মতো নিজের পায়ে নাল ঠুকিয়েছিল।

আমি বললুম: বুঝেছি। সবাই ভাবে, আমি কম কিসে। মগধই হল ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য, কাজেই এ রাজ্যের নাম বদল করতে হলে মগধ রাজ্যই বলা উচিত।

মিস্টার বোস বললেন: একেবারে ঠিক। তারপরে শুনুন চুন্ন ঝার কথা। তার বাড়ি হল—

বলে শীলার দিকে তাকালেন।

শীলা বলল: বুঝেছি, মিথিলায় তার বাড়ি।

সকৌতুকে মিস্টার বোস বললেন: মনের আনন্দে সে খইনি টিপছিল। নিতান্ত নিরাসক্ত ভাবে বাঁ হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, আঁহাকে আগে খইনি খাউ। জোন্ বহস্ আপ্নেকে বজইছি, সে সব নির্মূল ছে। তিরহুত রাজ মিথিলা দেশ আর মৈথিলী ভাখা সবচে ভারতবর্ষমা প্রাচীন ছে। সৎযুগ ত্রেতা দ্বাপর সব সময় মৈথিল দেশ প্রসিদ্ধ্ ছিকো। মিথিলাক ভাষা ভূষা পাঁজী সব নেয়ারা ছিকো। বিবাহ্ পদ্ধতি সংস্কার কর্ম্ আউর সমাজ জাতি সে আল্গই ছে। মহারাজ দশরথকে রথ দশদিশামে জাত হলই, কিন্তু মিথিলা উন্‌কে রাজসে বাহরে ছিকো। ফিরঙ্গিয়াকে রাজমে হামর মিথিলা দেশকে বিহারমে মিলায়ে ফেলই। সে অন্যায় ভইল ছো। ভাষাকে আধার বার ভারতবর্ষমে কোনও স্বতন্ত্র সুবা বন্ শকইছে, যেকরা সব্‌মে আগু মিথিলা প্রান্ত্ বন্‌বল্ উচিৎ হোৎ।

শীলার দিদি মুখ টিপে হাসছিলেন, কিন্তু শীলা হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল: ঠিকই তো। অত বড়, রাজা দশরথ, তিনিও মিথিলা জয় করেন নি। মিথিলার ভাষাভূষা পাঁজী প্রভৃতি এখনও সব আলাদা। ফিরিঙ্গিরাই অন্যায় ভাবে এই দেশটাকে বিহারের সঙ্গে জুড়েছে। মিথিলা প্রান্তের দাবি তারা তুলতে পারে বইকি।

মিস্টার বোস বললেন: শোন তাহলে ঝাপ্পস্ ভুঁইয়ার কথা। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী লোক। কোথায় সে ছিল কেউ দেখে নি,

দেখল যখন মাথায় লাঠি পড়ল কয়েক ঘা। সে তার আদিবাসী ভাষায় কী বলেছিল কেউই বোঝে নি, বুঝেছি আমরা উকিলেরা।

আমি কৌতূহল নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

তিনি বললেন : বলেছিল, এই দেশের আদিবাসী আমরা, চেরো কোরো মুণ্ডা ওঁরাও ও ভুঁইঞা। একদিন এদেশে এসে তোমরা আমাদের জঙ্গলে তাড়িয়েছিলে, এখন স্বাধীন দেশেও তোমরা আমাদের দাবি মানবে না! ছোটনাগপুর হাজারিবাগ রাঁচী পুরুলিয়ার আদিবাসী আমরা ঝাড়খণ্ড রাজ্য চাই।

মিস্টার বোসের কথায় সবাই আমরা হেসে উঠেছিলুম। ভারতবর্ষে এখন এই রকমই হয়েছে, সবাই চাইছে নিজেদের একটি সুবা। ধনধান্যে গোটা দেশটাকে সমৃদ্ধ করতে কি কেউ আজ চাইছে না!

৩১

ভোর বেলায় গয়া যাবার ব্যবস্থা পাকা করে মিস্টার বোস আবার বসবার ঘরে ফিরে এলেন। এতক্ষণ আমি অনিমেষকে লক্ষ্য করছিলুম, আর গল্প শুনছিলুম শীলার সঙ্গে তার দিদির। তিনি বলছিলেন : মাঝে মাঝে তোমরা এলে বেশ ভাল লাগে। ছেলেমেয়েরা তো কাছে কেউ থাকে না, সময় আমার কাটতেই চায় না।

অনিমেষ কোন কথায় যোগ দেয় নি। একখানা সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ করে নিবিষ্ট মনে তারই পাতা ওলটাচ্ছিল। আগে সে এ রকম ছিল না, মানুষ কাছে থাকলে অন্য দিকে মন দিতে সে পারত না। কিছু দিন আগে যে লোকটা আমাকে নিয়ে অমন মেতে উঠেছিল, সে আজ বদলে গেল কেমন করে আমি তাই ভাবছিলুম। ঠিক এমনি সময় মিস্টার বোস ফিরে এলেন। বললেন : বুঝলে ব্রাদার, শুধু একটা পুল নয়, পাটনায় এখন দুটো পুলের দরকার।

এই আকস্মিক মন্তব্যে আশ্চর্য হয়ে আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

মিস্টার বোস আমার দিকে চেয়ে বললেন : ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না বুঝি!

মাথা নেড়ে আমি বললুম : না।

মিস্টার বোস বললেন : পাটনার দক্ষিণে পুনপুন নদী, উত্তরে গঙ্গা। এই দুটো নদীর উপরে পুল নেই। পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে শোন নদীর উপরে পুল আছে, রেল রোড এক সঙ্গে। তেমনি পূর্বে মোকামার কাছে গঙ্গার পুল, রেলের পুলের উপর দিয়ে মোটর

চালিয়ে চলে যান। কিন্তু পাটনার ওপারে শোনপুরে যেতে হলেই স্টীমারে চাপতে হবে।

আমি বললুম : শোনপুরে কী করতে যাব!

মিস্টার বোস বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : চিত্রগুপ্তের পুজো আর ছট্‌ পুজো দেখতে যদি পাটনায় আসেন তো হরিহর ছত্রের মেলা না দেখে ফিরবেন! কার্তিকের পূর্ণিমা থেকে এই মেলা এক মাস চলবে। নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত। বিশ্বের বৃহত্তম কিনা জানি না, তবে এশিয়ার বৃহত্তম মেলা বলে খ্যাতি আছে। এত রকমের পশু আর কোন মেলায় আসে বলে শুনি নি।

হরিহর ছত্রের মেলার নাম আমি শুনেছি, কিন্তু সে যে পাটনার কাছে তা জানতুম না। এই কথা শুনে মিস্টার বোস বললেন : গান্ধীঘাটে দাঁড়িয়ে গণ্ডক নদীর সঙ্গম দেখেছেন তো! শোন নদী গঙ্গায় এসে পড়েছে অল্প কিছু পশ্চিমে। স্টীমারে উঠে গঙ্গা পেরোন মহেন্দ্রঘাট থেকে পালেজা ঘাট, তারপরে ট্রেনে মাইল চারেক গেলেই শোনপুর। সেখানেই হরিহরনাথ দেবের মন্দির, আর দেবতার নামেই হরিহর ক্ষেত্রের মেলা। সাহেবরা বলত শোনপুর ফেয়ার। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিরাট মেলাটি একবার না দেখলে মেলার সম্বন্ধে ধারণা আপনার সম্পূর্ণ হবে না। দুর্ভিক্ষের বছরেও কত হাতি ঘোড়া আসে জানেন? পাঁচ সাতশো হাতি আর দশ বিশ হাজার গরু মোষ; একজোড়া ভাল বলদ বিক্রি হয় বারো চোদ্দশো টাকায়। তার ওপর সরকারী প্রদর্শনী। মন্দিরেও এমন ভিড় হয় যে খবরের কাগজে আহতদের সংখ্যা বেরোয় রোজ।

বাড়ির পুরনো চাকর চায়ের পেয়ালা প্লেট গুছিয়ে তুলছিল। মিস্টার বোসের কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল। শীলার দিদি তার ভাব দেখে বললেন : এইবারে চরিতর কিছু বলবে।

নাম তার রামচরিত্র, সবাই চরিতর বলে। বয়স হয়েছে অনেক,

পুরনো হয়েছে এই বাড়িতে, তাই তার স্বাধীনতা সকলের কাছে স্বীকৃত হয়েছে। মিস্টার বোস বললেন: ওর কাছেই সঠিক খবর পাওয়া যাবে।

চরিতর খুশী হয়ে বলল: এখন হয়তো দশ বিশ হাজার জানোয়ার আসে, আগে আসত দশ বিশ লাখ। দশ হাজার হাতি আর বিশ হাজার ঘোড়া আমি নিজের চোখে দেখেছি। তুনিয়ার সব রকমের পশু পাখি বিক্রি হত এই মেলায়। বাঘ সিংহের বাচ্চাও কেনাবেচা হত। এক জোড়া বলদের দাম বারো চোদ্দশো। তু তিন হাজার টাকা জোড়ার বলদ আমার চোখের সামনে বিক্রি হয়েছে। সে বলদ ঘোড়ার মতো দৌড়ত।

রামচরিতর কাছে আমরা আরও অনেক খবর পেলুম। সেকালে এই মেলা শুধু দেহাতি লোকের জন্য ছিল না। বড় বড় রাজা-মহারাজা জমিদারেরাও আসতেন লোকজন নিয়ে, বড় বড় তাঁবু পড়ত তাঁদের। নাচগান মুজরো হত নামজাদা বাইজীদের। কত আনন্দ উৎসব, কত কেনাবেচা, এমন জিনিস নেই যা এই মেলায় আসত না। দেশের শ্রেষ্ঠ জিনিস কিনতে হলে এই মেলাতেই আসতে হত। তু মাসের আগে হরিহর ছত্রের মেলা কখনও ভাঙত না। গঙ্গা ও গণ্ডকের সঙ্গম থেকে শোন গঙ্গার সঙ্গম পর্যন্ত একটা বিস্তীর্ণ ত্রিভুজাকৃতি এলাকা জুড়ে এই মেলা বসত। শোনপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তাই পৃথিবীর বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম।

নদী দিয়ে এলাকা ঠিক বোঝানো যায় না। গণ্ডক দক্ষিণবাহী নদী, কাজেই একটি ত্রিভুজের সৃষ্টি ঠিকই করে। কিন্তু শোন উত্তরবাহী, উল্টো দিক থেকে এসে গঙ্গায় পড়েছে। কাজেই শোন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত বললে ত্রিভুজের একটি বাহুর পরিমাণ বোঝা যায়। মনে হয় যে মেলার একটা ধার আট-দশ মাইলের কম হবে না।

একটি পুরনো বাঙলা ভ্রমণ কাহিনীতে আমি হরিহর ক্ষেত্রের

কথা পড়েছিলাম। হরিহর ক্ষেত্র মাহাত্ম্য এখানে লিঙ্গ পুরাণের অংশ নামে প্রচারিত। পুরাকালে এখানে ছিল পুলহাশ্রম। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দুর্বাসা মুনি হাহা ও হুহু নামে গন্ধর্বকে গান করতে বলেছিলেন। মুনির কথা না শোনার জন্য তাঁরা অভিশপ্ত হয়ে গজ ও কচ্ছপ হয়ে এই পুলহাশ্রমে বাস করছিলেন। একদিন গজ এসেছিলেন জল পান করতে, আর কচ্ছপ তাঁকে টেনে জলে নামিয়েছিলেন। জলে ডুববার সময় গজের মুখ থেকে বেরিয়েছিল হরিহর নাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ও শিব এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। সেই থেকে এই স্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তামার শিব লিঙ্গ, তাঁর সম্মুখে বিষ্ণু মূর্তি।

মেলার কথাও তিনি লিখেছেন। এক একটা শ্রেণী ভাল করে দেখতে হলে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। 'শত শত বিচিত্র ভাল কুনকী গুণ্ডা ও পাট্‌ঠা নিগড়বদ্ধ হইয়া প্রশান্ত ভাবে ক্রেতার অপেক্ষা করিতেছে। নেপাল ও আসাম হইতে এখানে হস্তী আসে। আসিবা-মাত্র আরব বণিকগণ ক্রয় করিয়া লয় এবং মেলায় বিক্রয় করে। এবার কিছু আসে নাই, তথাপি অন্যূন এক সহস্র হস্তী আসিয়াছে। ঘোটক চারি সহস্র হইবেক। বলীবর্দের বাজার সম্পুর্ণ দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না ; তাহারও সংখ্যা বোধ হয় চারি সহস্র হইবেক। সময়াভাবে মেষ গর্দভ ও কুকুরের হাট দেখা হইল না। নানা জাতীয় পক্ষীর বাজার দেখা হইল। এক সুচ্ছায় উপবনে নর্তকীরা বায়নার প্রতীক্ষা করিতেছে।'

এই গ্রন্থে পাটনার কথাও আছে। পাটনায় লেখক পাটন দেবীর মন্দির দর্শন করেছিলেন। পূজারী তাঁকে বলেছিল এই স্থান বাহান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে সতীর পাট বা বস্ত্র পড়েছিল বলে দেবীর নাম পাটনা দেবী, শহরের নামও হয়েছে দেবীর নামে।

এর পরে বৈশালীর কথা উঠল। মিস্টার বোস বললেন : কিন্তু

গঙ্গার উপরে পুলের কথা এর জন্যে বলি নি। পুল থাকলে আপনাকে একটা প্রাচীন জায়গা দেখিয়ে আনতে পারতুম।

কোন্ জায়গা?

রাজগৃহের মতো প্রাচীন, নাম তার বৈশালী।

বৈশালী যে একটি অতি প্রাচীন. নাম তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের একটা গৌরবময় অধ্যায়ের কথা এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিছু দিন আগে একখানা পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়ে বৈশালীর খানিকটা পরিচয় সংগ্রহ করেছিলুম। বিশ্বামিত্র মুনি যখন রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে জনকপুরে যাচ্ছেন, তখন এই সমৃদ্ধ বৈশালী নগরী দেখিয়ে মুনি বলেছিলেন যে সত্যযুগে সমুদ্র মন্থনের আগে দেবাসুরের সম্মেলন হয়েছিল এই শহরে। দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যে তাঁর রাজধানীর জন্য এই জনপদটিই পছন্দ করেছিলেন। পুরাণে আছে যে রাজা বিশাল এইখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করে নিজের নামে বিশালপুরী বা বৈশালী নাম রাখেন। বিশাল ছিলেন ইক্ষ্বাকুর পুত্র ও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রপৌত্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্টির গোড়া থেকেই বৈশালী নগরীর প্রাধান্য ছিল।

ইতিহাসের যুগে বৈশালী ছিল লিচ্ছবি রাজাদের রাজধানী। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের জন্ম এই নগরে। বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন তিনবার। নগরের উপকণ্ঠে ছিল অম্বাপালির আম্র-কানন। এই নগর দেখতে এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়ান ও হিউএন চাঙ। তাঁরা অম্বাপালির বিহার দেখে ফিরে গেছেন।

কানিংহাম সাহেব স্মিথ সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে মজঃফরপুর শহরের তেইশ মাইল দূরে বাসার নামে একটা গ্রামই প্রাচীন বৈশালী। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়ে এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। এখন নাকি ভাল রাস্তা হয়েছে, বৈশালী পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে। যাত্রীরা এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে নিয়মিত যাতায়াত করে।

মিস্টার বোসকে আমি বললুম : দ্রষ্টব্য বস্তুর কথা কিছু বলবেন না ?

ভদ্রলোক হেসে উঠে বললেন : এইবারে ঠিক বলেছেন।

কেন !

আমি কি ছাই দেখেছি কিছু !

শীলা বলল : তবে আপনিই বলুন।

বলে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : না দেখা জিনিস বলতে গেলেই ভুল হয়।

মিস্টার বোস বললেন : কিছু তো ঠিক হবে।

বললুম : একটা উঁচু ঢিবির মতো জায়গার নাম রাজা বিশালকা গড়। সেখানে অনেক মাটির সীল পাওয়া গেছে। মাইল দুই দূরে কলহুয়াতে অশোকের যে স্তম্ভ আছে, এই গড় থেকে সেখানে যাবার একটা রাস্তার অংশ খুঁড়ে বার করা হয়েছে। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এই রকমের স্তম্ভ পাওয়া গেছে—মসৃণ চকচকে বালিপাথরের কুড়ি-বাইশ ফুট উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটি সিংহের মূর্তি। পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন যে সম্রাট অশোক যখন পাটলিপুত্র থেকে লুম্বিনী গিয়েছিলেন তখন এই স্তম্ভগুলি তাঁর যাত্রাপথে পোঁতা হয়েছিল। রামপুরুয়া লউরিয়া-আরেরাজ লউরিয়া-নন্দনগড় ও কলহুয়ায় এখনও এই স্তম্ভগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

শীলা বলে উঠল : এই সব অদ্ভুত নাম আপনি মনে রাখলেন কী করে !

হেসে বললুম : মনে রাখব ভাবলেই মনে রাখা যায়। মন কখনও বেইমানি করে না।

মিস্টার বোস জিজ্ঞাসা করলেন : আর কিছু দেখবার নেই ?

বললুম : বৈশালীতে এখন অনেক কিছু দেখবার আছে শুনেছি। একটি যাদুঘরও হয়েছে। নালন্দায় যেমন পালি ও বুদ্ধলজি শিক্ষার নবনালন্দা বিহার, বৈশালীতে তেমনি প্রাকৃত ও জৈনলজি শিক্ষার

জৈন প্রাকৃত রিসার্চ ইনস্টিটিউট। বর্ধমান মহাবীরের জন্মদিনে বৈশালী সংঘ বৈশালী মহোৎসব করেন।

মিস্টার বোস বললেন: আপনার কথা শুনে জায়গাটা একবার দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে।

আমি বললুম: অন্ততঃ নালন্দা যাঁদের ভাল লাগে, তাঁদের তো বৈশালী দেখা নিতান্তই উচিত। বৈশালী নালন্দার চেয়ে অনেক প্রাচীন, রাজগৃহের চেয়েও। ভারতে এর চেয়ে প্রাচীন নগর আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই।

মিস্টার বোস বললেন: বৈশালী কি নগর-বধূ নামে একখানি হিন্দী উপন্যাস এ দেশে খুবই জনপ্রিয়। আপনি পড়েছেন কি?

আমি পড়ি নি, কিন্তু নাম শুনেছি।

বৈশালী সম্বন্ধে একটা কৌতূহল আমার এখনও আছে। জৈন ধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের জন্মস্থান এই বৈশালী। মহাবীর বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। কতকটা একই সময়ে তাঁরা নিজেদের ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বয়সে কে বড় ছিলেন আর কে ছোট তা নিয়ে কৌতূহল নয়, নিজেদের জীবদ্দশায় কে বেশি সম্মান পেয়েছিলেন তাই নিয়েই কৌতূহল। একদা এই বৈশালীতে প্লেগের ভয়াবহ আবির্ভাব হয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছিল এই রোগ নিবারণের সমস্ত চেষ্টা, বাতাস ব্যাকুল হয়েছিল জনসাধারণের কান্নায়। বৈশালীর মন্ত্রণাসভা তখন বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে এই নগরে আনবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ তখন প্রতিবেশী রাজ্য মগধের অধিবাসী, গঙ্গার পরপারে রাজগৃহে তিনি বাস করছিলেন। বৈশালীর রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং গিয়েছিলেন বুদ্ধকে আনবার জন্য। করুণাময় বুদ্ধ এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন নি, বিপদের মধ্যে তিনি চলে এসেছিলেন। লিচ্ছবিরা তাঁকে তাদের রাজ্যের সীমানায় পরম সমারোহে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। এই সমারোহ দেখে বুদ্ধ তাঁর অনুচরদের বলেছিলেন, বৈশালীর লিচ্ছবিদের দেখ, দেখ তাদের

হাতী সোনার ছাতা উজ্জ্বল পোশাক ও সাজানো রথগুলি। দেবতাদের সম্মেলন যারা দেখতে পায় না, তারা এই লিচ্ছবিদের দেখুক। দেবতাদের চেয়ে লিচ্ছবিরা নিকৃষ্ট নয়। বুদ্ধ তার পরে লিচ্ছবিদের দেশে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবেই রোগ শোক অন্তর্হিত হয়েছিল।

বুদ্ধের জন্মও লিচ্ছবি বংশে, কিন্তু বৈশালীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি জন্মেছিলেন নেপালের তরাই অঞ্চলে—লুম্বিনী বনে। বৈশালীর লিচ্ছবিরা বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে আনল, আনল না বর্ধমান মহাবীরকে। মহাবীর কি তখন জীবিত ছিলেন না, না বুদ্ধ তাদের বেশী প্রিয় ছিলেন! শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথাও হয়তো জড়িত আছে। আমি যত দূর জানি তাতে খ্রীষ্টের জন্মের চারশো সাতাশি বৎসর পূর্বে কুশীনগরে বুদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হয়, আর মহাবীর তার পরেও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে পাটনা জেলার পাবা গ্রামে। এখন আমরা এই স্থানকে পাওয়াপুরী বলি।

বৈশালীতে এসে বুদ্ধ আম্রপালীর উদ্যানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তাঁকে দর্শন করবার জন্য লিচ্ছবিরা দলে দলে আসত। একদিন তিনি তাঁদের বললেন যে এবারে তিনি কুশীনগরে যাবেন, সেখানেই তাঁর নির্বাণ লাভ হবে তিন মাস পরে। যেদিন তিনি কুশীনগর যাত্রা করলেন, সেদিন লিচ্ছবিরাও তাঁর সঙ্গে চলল, কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব না।

বুদ্ধ তাদের অনেক বোঝালেন, বললেন, এ ক্ষণস্থায়ী দেহ সকলকেই একদিন ত্যাগ করতে হবে, তার জন্যে দুঃখ কেন! তোমরা ফিরে যাও।

কিন্তু তারা এ কথা মানল না। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এক নদীর তীরে এসে সবাই পৌঁছল। গভীর নদী, সবার পক্ষে এই নদী অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বুদ্ধ তাঁর জীবনের

শেষ সম্বল ভিক্ষাপাত্রটি তাদের হাতে দিয়ে সবাইকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দিলেন। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তারা ফিরে গেল।

বৈশালীতে ফিরে এই লিচ্ছবিরা এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিল, তার ভিতরে স্থাপন করেছিল বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি। তারপরে বুদ্ধের নির্বাণের পরেও কুশীনগর থেকে তারা তাঁর দেহাবশেষের একাংশ এনেছিল সংগ্রহ করে, তার উপরে নির্মাণ করেছিল একটি বিরাট স্তূপ। বৈশালীতে এখন এ সব আছে কিনা জানি নে।

সহসা আমি শীলার প্রশ্ন শুনতে পেলুম : অমন অন্যমনস্ক ভাবে কী ভাবছেন গোপালবাবু?

আমি!

বলে তার মুখের দিকে তাকালুম।

সহাস্যে শীলা বলল : আমি আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি।

সত্য কথা আমি গোপন করলুম না, বললুম : বৈশালীর লিচ্ছবিদের কথা ভাবছি।

মিস্টার বোস বললেন : তাদের সম্বন্ধে কিছু বলুন না।

বললুম : ইতিহাসের কচকচি কি ভাল লাগবে!

অত্যন্ত তৎপর ভাবে শীলা বলল : লাগবে।

বললুম : মনুসংহিতায় আমরা এই জাতির উল্লেখ দেখি, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় থেকে সবর্ণা স্ত্রীতে নিচ্ছবি বা লিচ্ছবি জাতির উৎপত্তি। লিচ্ছবিরাজ জয়দেবের একখানা শিলালিপি নেপালে পাওয়া গেছে, তা থেকে জানতে পারি যে লিচ্ছবির জন্ম হয়েছে সূর্যবংশের দশরথের অধস্তন অষ্টম পুরুষে। কিন্তু পালি গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। কাশীরাজের মহিষী পূজাবলী সন্তানের বদলে একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেছিলেন। ধাত্রী সেটি গঙ্গার জলে ফেলে দেয়। স্রোতে ভাসতে ভাসতে সেই পিণ্ডটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি বালক বালিকার জন্ম হয়। একজন ঋষি তাদের জল থেকে উদ্ধার

করে লালন পালন করেন। এই দুটি শিশুর ছবি বা মূর্তিতে কোন প্রভেদ ছিল না বলে তাদের লিচ্ছবি নাম হয়েছিল। এরা বজ্জিতব্ব নামে পরিচিত হয়েছিল। ঋষি যখন এক গৃহস্থকে এই দুটি শিশুর প্রতিপালনের ভার দেন, তখন অন্য শিশুরা এই দুটি পিতৃমাতৃহীন শিশুকে বজ্জিতব্ব বা ফেলনা বলে ডাকতে আরম্ভ করে। এই নামও পরবর্তী কালে প্রচলিত ছিল। লিচ্ছবি শাসিত মিথিলার অধিকাংশ একসময় বজ্জি রাজ্য বলে পরিচিত হয়েছিল।

মনুসংহিতায় লিচ্ছবিদের ব্রাত্য বা সংস্কারহীন ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় যে পরবর্তী কালে তাদের আর ব্রাত্য বলে মনে করা হত না। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে তাদের উপনয়নের কথা আছে। প্রাচীন মূর্তিতেও আমরা যজ্ঞোপবীত দেখতে পাই। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা বিবাহ করেছিলেন, তাঁর মুদ্রায় সেই কথা চিহ্নিত ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞকারী সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে লিচ্ছবি রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র বলে গৌরবান্বিত বোধ করতেন। লিচ্ছবিরা তখনও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় থাকলে এই বৈবাহিক সম্বন্ধ এমন সম্মানজনক হত না।

লিচ্ছবিদের তিনটি প্রধান শাখার কথা শোনা যায়। একটি বৈশালীতে, একটি নেপাল প্রান্তে মিথিলায় ও তৃতীয়টি পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্র অঞ্চলে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কোশল ও মিথিলায় তাদের প্রবল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের অধিকৃত দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হলেও দেশরক্ষার ব্যাপারে এরা সম্মিলিত হত। এরা সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল এবং সম্মিলিত লিচ্ছবি-রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার জন্য বৈশালী নগরীতে ছিল একটি মহাসভা। এই মহাসভার ব্যবস্থাতেই সমস্ত ছোট ছোট রাজ্য পরিচালিত হত।

অনেকক্ষণ থেকে যে আমি কথা বলছিলুম না তা বুঝতে পারলুম শীলার কথায়। সে বলল: আবার আপনি নিজের মনে ভাবছেন!

আমি চমকে উঠে বললুম : এক বিষয়ে বেশি কথা বলা ভাল লাগে না।

মিস্টার বোস বললেন : ভাল কথা কিছুতেই খারাপ লাগে না।

আমি বললুম : শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে মগধের রাজা বিম্বিসার বিবাহ করেছিলেন এক লিচ্ছবি রাজকন্যাকে।

মিস্টার বোস বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : সত্যি নাকি !

বললুম : এর চেয়েও আশ্চর্যের কথা আছে। ইতিহাসে পড়েছেন যে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু তাঁর পিতাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু কেন তাকে হত্যা করেছিলেন সে কথাটি ইতিহাসে নেই। আমাদের মনে হয়েছে যে বোধ হয় রাজ্যের লোভেই অজাতশত্রু এই জঘন্য কাজ করেছিলেন। কিন্তু আসলে তার কারণ অন্য।

মিস্টার বোস অনেক কৌতূহল নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। শীলার চোখেও আমি কৌতূহল দেখলুম। বললুম : লিচ্ছবি রাজকন্যাকে বিবাহের পর গৌতম বুদ্ধ বিম্বিসারকে দুটি জিনিস উপহার দেন। একটি বিরাট হাতী, তার নাম সেচনক ; আর একটি অষ্টাদশ রত্নের মালা। পরবর্তীকালে বিম্বিসার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজত্ব দিয়ে সেই হাতী ও মালাটি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বেহল্লকে উপহার দিয়েছিলেন। অজাতশত্রু ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার এই পক্ষপাতিত্বের জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পিতাকে হত্যা করেছিলেন, আর প্রাণের ভয়ে বেহল্ল বৈশালীতে পালিয়ে গিয়ে মাতামহের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সাগ্রহে শীলা বলল : তারপর ?

বললুম : অজাতশত্রু বেহল্লকে ক্ষমা করেন নি, কিন্তু শক্তিশালী লিচ্ছবিদেরও সহসা আক্রমণ করেন নি। বুদ্ধ তখন রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে বাস করছিলেন, তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন নিজের প্রধান মন্ত্রী ব্রাহ্মণ বিশ্বাকরকে। বুদ্ধকে জানাতে বলেছিলেন যে

তিনি লিচ্ছবি জাতকে সমূলে উৎপাটন করতে চান। এ কথা শুনে বুদ্ধ কী বলেন তাই জেনে আসতে হবে।

কী বলেছিলেন বুদ্ধ ?

বিশ্বাকরকে উত্তর দেবার আগে বুদ্ধ আনন্দকে বলেছিলেন, তুমি জান আনন্দ, এই বজ্জি বা লিচ্ছবিরা সাধারণ সভায় সমবেত হয়ে সব বিষয়ে একতার সঙ্গে মীমাংসা করে। তারা প্রাচীন প্রথার সম্মান করে, সম্মান করে বয়োবৃদ্ধ ও নারীজাতিকে। তারা চৈত্য ও অর্হৎদেরও সম্মান করে। কাজেই তাদের বিনাশ করা সম্ভব নয়। তারপর তিনি মন্ত্রীকে বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি যখন বৈশালীতে ছিলাম তখন এই লিচ্ছবিদের আমি সাতটি উপদেশ দিয়েছিলাম। যত দিন তারা আমার উপদেশ মেনে চলবে তত দিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি হবে, আর কেউ তাদের ধ্বংস করতে পারবে না।

বললুম ঃ শুনে আশ্চর্য হবেন যে অজাতশত্রু এই কথা শুনে দমে গিয়েছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের পূর্বে লিচ্ছবিদের আক্রমণ করেন নি। তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পরে বিশ্বাকরের কূটনীতিতে লিচ্ছবিদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে অজাতশত্রু বৈশালী ধ্বংস করে তিনশো লিচ্ছবিকে সপরিবারে বন্দী করে রাজগৃহে নিয়ে আসেন। বাকি সবাই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। কেউ নেপালে কেউ লাদাখে কেউ বা তিব্বতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

বৈশালীর ইতিহাস এইখানেই শেষ নয়। অল্প কিছু দিন পরেই এই নগরীর সংস্কার হয়। মগধের আর এক রাজা নাগাশোক এক লিচ্ছবি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের পুত্রের নাম সুসুনাগ, পুরাণে এই রাজা শিশুনাগ নামে পরিচিত। শিশুনাগ বৈশালীকে নতুন করে নির্মাণ করেন।

মিস্টার বোস বললেন ঃ এ কি ইতিহাসের কথা ?

বললুম ঃ ভারতের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছে আরও কিছুকাল পরে। এই ঘটনার উল্লেখ আছে বৌদ্ধ গ্রন্থে। শিশুনাগের পুত্র

কালাশোক বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সভাসমিতি আহ্বান করে-
ছিলেন।

ঐতিহাসিক যুগে লিচ্ছবিরা আর পরাক্রান্ত হবার সুযোগ পায় নি। তার প্রধান কারণ একতার অভাব, আর দ্বিতীয় কারণ মগধের প্রতিপত্তি। কখনও কোন লিচ্ছবি মাথা তুলে দাঁড়ালেই মগধের রাজা তার কন্যাকে বিবাহ করে বন্ধুতা স্থাপন করতেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও বিবাহ করেছিলেন লিচ্ছবি রাজকন্যা।

৩২

পাটনা থেকে গয়ার দূরত্ব ষাট মাইলের কম। গয়া ও বুদ্ধগয়া দেখে এক দিনেই ফিরে আসা যায়। সকাল প্রায় সাড়ে ছটার সময় একটা ট্রেন ছাড়ে পাটনা জংসন স্টেশন থেকে, পোনে দশটার আগেই সে ট্রেন গয়ায় পৌঁছয়। ওধার থেকেও একটা ট্রেন বিকেল পাঁচটায় ছাড়ে, সে ট্রেন পাটনায় পৌঁছয় রাত আটটার আগে। গয়া দেখবার জন্য সাত ঘণ্টা সময় যথেষ্ট। মিস্টাব বোস বললেন ঃ গয়া স্টেশনেই একটা টুরিস্ট অফিস আছে, তাদের কাছে স্টেশন ওয়াগন ভাড়া পাওয়া যায় শুনেছি। ট্যাক্সিও অনেক আছে।

আমি জানিয়ে দিয়েছিলুম যে গয়া থেকে আমি আর পাটনায় ফিরব না, সোজা বেনারস যাব।

শীলা বলেছিল ঃ পুলিসে ধরবে বলে ভয় পাচ্ছেন ?

কেন ?

আপনার বন্ধুরা জেগে উঠে নিশ্চয়ই পুলিসকে খবর দিয়েছেন।

হা হা করে হেসে উঠে মিস্টার বোস বলেছিলেন ঃ ছেলেধরা বলে যে পুলিস আমাকেও ধরবে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেলুম। মিস্টার বোসের ড্রাইভার টিকিট কেটে স্টেশনের পোর্টিকোয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। টিকিটগুলি মিস্টার বোসের হাতে দিয়ে গাড়ি নিয়ে সে ফিরে গেল। ওভারব্রিজ পেরিয়ে আমরা গয়ার ট্রেন ধরলুম।

'গত রাত্রে শীলার দিদি তাঁর বড় ছেলের ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরিপাটি করে সাজানো ঘর। ধবধবে সাদা নরম বিছানায় শুয়েও অনেকক্ষণ আমার ঘুম আসে নি। অনেক

অবান্তর কথা একে একে মনে আসছিল। অনিমেষের পরিবর্তনের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না। এবারে তাকে একটা সম্পূর্ণ অন্য মানুষ মনে হচ্ছে। কেন জানি না, নিজেকে আমি তার এই পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি। অকারণেই মনে হচ্ছে যে আমার উপস্থিতিতেই অনিমেষের এই অস্বাচ্ছন্দ্য। কিছুতেই সে সহজ হতে পারছে না। মনে মনে ঠিক করলুম যে কাল কোন সুযোগে অনিমেষের সঙ্গে একান্তে একবার কথা কইব।

পাশ ফিরে শুয়ে আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু ক্লান্ত চোখে ঘুম এল না। সারাদিন পরিশ্রমের পর দু চোখ ভরে ঘুম নামে। কিন্তু পরিশ্রম বেশি হলে তার ব্যতিক্রম হয়। গত রাত্রে ট্রেনে আমাকে জাগতে হয়েছে, সারা দিন ঘুরে বেড়িয়েছি সবার সঙ্গে। কাল ভোর বেলায় আবার আমাকে উঠতে হবে। কিন্তু অবাধ্য ঘুম এ সব যুক্তির কথা মানল না। শুয়ে শুয়ে আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম।

কাল আমি পাটনা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আবার কবে এখানে আসব জানি নে। হয়তো আর আসব না। কিন্তু পাটনায় এই দিনটির কথা অনেক দিন মনে থাকবে। শীলা আমাকে জোর করে টেনে না নামালে পাটনা আমার দেখা হত না, দেখা হত না অতীতের পাটলিপুত্র।

একটা কথা ভেবে আমার খুব আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। পাটলিপুত্রের মতো সমৃদ্ধ শহর কেমন করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, ইতিহাসে তার কোন উল্লেখ নেই। তবে তার গৌরবের দিনের অবসানের কারণ আমরা অনায়াসেই খুঁজে পাই। ভারতের ইতিহাসে একাধিক চন্দ্রগুপ্ত আছেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টের জন্মের তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেছেন। অশোক তাঁর পৌত্র। গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল খ্রীষ্টের জন্মের তিনশতাধিক বৎসর পর। রাজা হয়ে তিনি গুপ্ত সম্বৎ প্রবর্তন করেন ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে। চন্দ্রগুপ্ত

বিক্রমাদিত্য তাঁর পৌত্র, ইতিহাসে ইনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বলি না, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পিতামহই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের প্রথম রাজা নন। এর পূর্বে আরও দুজন রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের রাজ্য এত ক্ষুদ্র ছিল যে ইতিহাস তাঁদের ভুলে গেছে। চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়ে লিচ্ছবি রাজকুমারী কুমার দেবীকে বিবাহ করলেন, নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে পশ্চিমে প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্যের সীমা বাড়ালেন। তারপরে পাটলিপুত্রে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকেরা তাঁকে প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা বলে স্বীকার করেছেন।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মালব ও সৌরাষ্ট্র অধিকার করেছিলেন। মালবের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনীতে, আর এই উজ্জয়িনীতেই ছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন। ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ছিলেন নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন। কিন্তু অনেকেই বলেন যে বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস একাধিক ছিলেন। রাজারা যেমন গৌরবের জন্য বিক্রমাদিত্য উপাধি নিতেন, তেমনি কবিরাও কালিদাস নাম নিয়ে গৌরব বোধ করতেন। অনেক বিচার করে ঐতিহাসিকেরা স্থির করেছেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাতেই ছিলেন কবি কালিদাস ও তাঁর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনীতে।

এ কথা সত্য হলে মেনে নিতে হয় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। কিছুকাল কনৌজে থেকে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন কিনা তাও ভাববার কথা।

চীন দেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা হিয়েন এদেশে এসেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়। পাটলিপুত্রে তিন বছর কাটিয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা তিনি লিখে রেখে গেছেন। নানা সুরম্য হর্ম্যে নগরীর

তখন পূর্ণ গৌরব, অশোকের নির্মিত প্রাসাদও ছিল অনেকগুলি। এগুলির শিল্পনৈপুণ্য দেখে ফা হিয়েনের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল যে এই নগরী মানুষের তৈরি।

এই ঘটনার প্রায় দুশো চল্লিশ বছর পরে হিউএন চাঙ এসেছিলেন পাটলিপুত্রে। তিনি দেখেছিলেন একটি পরিত্যক্ত শহর। পুরনো অট্টালিকার ভিত্তি ও ভাঙা দেওয়াল দেখেছিলেন কিছু। এত দিনের একটা প্রাচীন শহর এমন সহসা ধ্বংস হয়ে গেল কেমন করে, এ কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়, না শত্রুর আক্রমণে, তা জানবার আর উপায় নেই। ঐতিহাসিকেরা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কথা বলেন না, বলেন হুনদের আক্রমণের কথা। কেউ বলেন বাঙলার রাজা শশাঙ্কের কথা। তিনি বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁর উত্তর ভারত বিজয়ের সময় পাটলিপুত্র ধ্বংস করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল বাঙলার কর্ণসুবর্ণে, কিন্তু তিনি কনৌজ পর্যন্ত জয় করেছিলেন। থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের পর রাজা হয়েছিলেন হর্ষবর্ধন, আর শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে তিনি কনৌজে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেই হিউএন চাঙ পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন।

অষ্টম শতাব্দীতে পালরাজারা চেষ্টা করেছিলেন পাটলিপুত্রকে পুনরায় নির্মাণের। ধর্মপাল ও দেবপাল তাঁদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পাটলিপুত্রের কিছু গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি, রাজধানী সরে গিয়েছিল সেখান থেকে, আর মাটির নিচে চাপা পড়েছিল ভারতের প্রথম রাজধানী।

গয়ার গাড়ি যখন ছাড়ল, প্রভাতের প্রথম রোদে পৃথিবী তখন প্রসন্ন হয়েছে। রেলপথের দু ধারে কিছু ঘর বাড়ি, সে সব ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র। অনেক যত্নে মিস্টার বোস একটা চুরট ধরিয়েছিলেন, খানিকক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করে এইবারে কথা

কইলেন, বললেন ঃ পাটনার সব কিছু আপনাকে দেখাতে পারলুম না।

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম ঃ আরও কিছু বাকি রয়ে গেল নাকি !

মিস্টার বোস তখনই কোন উত্তর দিলেন না, আরও খানিকটা ধোঁয়া মুখে নিয়ে ধীরে সুস্থে বললেন ঃ সবই তো বাকি রয়ে গেল।

শীলা বলে উঠল ঃ সত্যি নাকি !

শীলার দিদি বললেন ঃ কাল সারা দিন তাহলে কী দেখলে !

মিস্টার বোস নির্বিকারে বললেন ঃ সেই কথাই ভাবছি।

বলে আরও অলস ভাবে বললেন ঃ বর্তমান পাটনার প্রতিষ্ঠাতা হলেন শের শাহ সুর। ভাবছি, তাঁর তো কিছুই দেখালুম না। তাঁর দুর্গ, তাঁর মসজিদ, তাঁর—

বাধা দিয়ে শীলার দিদি বললেন ঃ লোকে শের শাহর সমাধি দেখে। কিন্তু সে তো সসারামে।

মিস্টার বোস বললেন ঃ দেখবার জিনিস আরও ছিল, কিন্তু পাটনায় এসে তা দেখে না। ফতেপুর সিক্রি দেখেছ ব্রাদার ?

বলে মিস্টার বোস অনিমেষের দিকে তাকালেন।

অনিমেষ অন্যমনস্ক ছিল, তাই চমকে উঠে বলল ঃ আমাকে জিজ্ঞেস করছেন ?

মিস্টার বোস শীলার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। অনিমেষ লজ্জা পেয়ে বলল ঃ না।

তবে সামনের রবিবার তোমাকে দেখিয়ে আনব।

সবিস্ময়ে শীলা বলল ঃ সে তো অনেক দূর, আগ্রা থেকে যেতে হয় শুনেছি।

মিস্টার বোস বললেন ঃ সেইজন্যেই তো বলছি যে এমন জিনিস দেখাব যে কষ্ট করে ফতেপুর সিক্রি আর যেতে হবে না।

তারপর মানের নামে একটা জায়গার কথা আমাদের বললেন। পাটনা থেকে আঠারো মাইল পশ্চিমে এই জায়গাটি মুসলমানদের একটি পবিত্র তীর্থ। তাদের কাছে এর চেয়ে পবিত্র স্থান সারা বিহারে আর নেই। সুফি সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত ফকির, নাম তাঁর হজরত মখ্‌দুম ইয়াহিয়া মানেরি, এখানে বাস করতেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই মহাপুরুষের নামেই জায়গার নাম হয়েছে মানের, আর তাঁর সমাধি এখন বড়ি দরগা নামে পরিচিত। নিকটে ছোটি দরগাও আছে একটি, সেটি তাঁর শিষ্য শাহ দৌলতের সমাধি। চুনার পাথরে তৈরি এই দরগাটি দেখে বিস্ময়ে সবাইকে অভিভূত হতে হয়। এমন সুন্দর সমাধি সৌধ ভারতে খুব কমই আছে। যেমন নক্‌শা তেমনি খোদাইয়ের কাজ। ঠিক এই রকমের কারুকার্য আছে ফতেপুর সিক্রিতে। সে আরও পরে নির্মিত হয়েছে।

মিস্টার বোস বললেন: বিহারের ইসলাম সভ্যতা শুনেছি এই মানের থেকেই অন্যত্র ছড়িয়েছে। পাল বংশের ধর্মপাল বোধ হয় বিহার শহরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই শহরের নাম হয়েছে বিহার-শরিফ। এখনও এই শহর বিহার-শরিফ নামেই পরিচিত।

তারপরে তিনি আমাদের বিহার-শরিফের কথা শোনালেন। পাটনা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রাজগির যাবার পথে এই শহরেও অনেক কিছু দেখবার আছে। এক সময় এইখানে থেকেই বিহারের মুসলমান শাসনকর্তারা রাজ্য পরিচালনা করতেন। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই শহরই ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। মখ্‌দুম শাহ শরিফউদ্দিন নামে একজন জনপ্রিয় ফকিরের সমাধি আছে এইখানে। ভারতের নানা স্থান থেকে আসে মুসলমান যাত্রী। এই ফকির মারা গিয়েছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে, কিন্তু তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা আজও তাঁকে অমর করে রেখেছে।

এই মখ্‌দুম শাহর নাম আমি রাজগিরে শুনেছিলুম। সেখানেও তাঁর নামে একটি কুণ্ড আছে। রাজগিরও মুসলমানদের কাছে পবিত্র স্থান।

এর পর সসারামের কথা। সসারাম পাটনার কাছে নয়, গয়া ছাড়িয়ে মোগলসরাইএর পথে সসারাম স্টেশন। প্রথমে শোন নদী পেরতে হয় ডেহরি অন শোনে, সেখান থেকে বিশ মাইল পশ্চিমে শের শাহর সসারাম। পাটনার কাছে আরা স্টেশন থেকে একটা খেলনার মত ছোট লাইন সসারাম পর্যন্ত এসেছে। তার নাম আরা সসারাম লাইট রেলওয়ে। কিছু দিন আগে বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগির পর্যন্ত এই রকমেরই গাড়ি চলত। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আরা থেকেও বড় লাইনের গাড়ি সসারামে আসবে।

আরা শহর থেকে একটি সুন্দর রাস্তা শোন নদীর খালের ধারে ধারে ডেহরি অন শোন পর্যন্ত এসেছে। এই শহরেরই একাংশের নাম হয়েছে ডালমিয়া নগর। সেখানে সিমেণ্ট কাগজ আর চিনির কারখানা বসেছে।

ভারতের সব চেয়ে বড় পুল এখানকার শোন নদীর উপরে। লম্বায় তা এক হাজার বাহান্ন ফুট। বিলেতের টে নদীর পুল শুনেছি এর চেয়ে শ পাঁচেক ফুট বেশি, আর সেইটেই পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা পুল।

এখান থেকে আর একটি জায়গা খুব কাছে। তার নাম রোটাসগড়। ডেহরি রোটাস লাইট রেলওয়ে মাত্র চব্বিশ মাইল। আকবর বাদশাহর সেনাপতি এই রোটাসগড়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে নির্মিত প্রাসাদটি এখনও দেখবার মতো। আয়না মহল দেখে লোকে এখনও আনন্দ পায়।

মিস্টার বোস বললেন: শের শাহর সমাধি ট্রেন থেকেই দেখতে

পাওয়া যায় শুনেছি। সসারাম স্টেশন পেরবার সময় একটু সজাগ থাকবেন।

আমি হেসে বললুম: দিনের আলো থাকলেই হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে।

এ কথা বলেই মনে হল যে অতীতের অন্ধকারেও শের শাহ হারিয়ে যান নি, ইতিহাসের পাতায় এখনও তিনি বেঁচে আছেন সগৌরবে। শের শাহের মতো বাদশাহ এ দেশে সত্যিই বুঝি কম আছে।

আনুমানিক ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদ নামে একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল দিল্লীর নিকটে। তার পিতামহ ইব্রাহিম সুর তক্তি সুলেমান পর্বতের উপত্যকা ছেড়ে জীবিকার জন্য এ দেশে এসেছিলেন, আর পিতা হাসান জায়গীর পেয়ে সপরিবারে এসেছিলেন সসারামে। হাসানের চারজন স্ত্রী ও আটটি পুত্র, ফরিদ সব চেয়ে বড়। পিতৃস্নেহে বঞ্চিত বালক বিমাতার দুর্ব্যবহারে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল পনরো বছর বয়সে, জৌনপুরে গিয়ে লেখাপড়া শিখেছিল। এক সময় সন্তুষ্ট হয়ে পিতা তাকে নিজের জায়গীর পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন, কিন্তু অল্প দিন পরেই তার বিমাতার কথায় সেই সুযোগ কেড়ে নিয়েছিলেন। তেত্রিশ বছর বয়সে ফরিদ আবার জীবিকার জন্য পথে বের হল।

প্রথমে সে আগ্রায় গিয়েছিল, তারপর বাহার খানের অধীনে একটা চাকরি পেয়ে ফিরে এসেছিল বিহারে। একদিন বাহার খানের সঙ্গে শিকারে গিয়ে একটা বাঘ মেরে উপাধি পেল শের খান।

চল্লিশ বছর বয়সে শের খাঁ মুঘল বাদশাহ বাবরের অধীনে চাকরি পান, আর বাদশাহর অনুগ্রহেই নিজের পৈতৃক জায়গীর উদ্ধারে সমর্থ হন। বিহারের শাসনকর্তা তখন নাবালক, তিনি তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। তারপরেই চুনার দুর্গের মালিক মালিকা

নামে এক বিধবাকে বিবাহ করে এই দুর্গের অধিকার তিনি লাভ করেন।

বাবরের মৃত্যুর পরে তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয় হুমায়ুনের সঙ্গে। পাঠান সামন্তরা যখন বিদ্রোহ করে, হুমায়ুন তাদের পরাস্ত করেন। চুনার দুর্গ অবরোধ করে শের খাঁকেও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁকে দাবিয়ে রাখতে পারেন নি। পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহ ও পূর্বাঞ্চলে পাঠান নায়ক শের খাঁ হুমায়ুনকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত শের খাঁর হাতে দুবার পরাজিত হয়ে হুমায়ুন দেশ থেকেই পালিয়ে যান। তিপ্পান্ন বছর বয়সে দিল্লীর মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনকে পরাস্ত করে বিহারের পাঠান নায়ক শের খাঁ হলেন শের শাহ। তার রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বছর, কিন্তু এই পাঁচ বছরেই তিনি মধ্যযুগের একজন আদর্শ রাজা বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

হুমায়ুনের সঙ্গে শের শাহর প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল বক্সারের নিকট চৌসায়। হুমায়ুন যখন চুনার দুর্গ অবরোধ করে বসে আছেন, শের শাহ তখন রোটাস দুর্গ জয় করে গৌড় অধিকার করে ফেলেছেন। হুমায়ুন চুনার অধিকার করে যখন গৌড়ে পৌঁছলেন শের শাহ তখন চুনার পুনরধিকার করে বিহার ও বারাণসী জয় করে জৌনপুর ও কনৌজ পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন। আগ্রা হাতছাড়া হবার ভয়ে হুমায়ুন দ্রুত এগিয়ে এলেন। আর শের শাহ তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন চৌসায়। চৌসার ময়দানে যুদ্ধ হল এক দিন প্রভাতে, অতর্কিতে আক্রমণ করে শের শাহ হুমায়ুনকে বিশ্রী ভাবে পরাস্ত করলেন। আত্মরক্ষার জন্য হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। একজন ভিস্তি তাঁর দুরবস্থা দেখে তাঁকে রক্ষা করল, জল বইবার মশক হাওয়ায় ফুলিয়ে তারই সাহায্যে বাদশাহকে গঙ্গা পার করে দিল। মুঘল সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, হুমায়ুনের বেগম ও অন্যান্য জেনানারা বন্দী হয়েছিল।

শের শাহ এই মহিলাদের অবমাননা করেন নি, সসম্মানে সবাইকে হুমায়ুনের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার দুজনের যুদ্ধ হয়েছিল কনৌজের নিকটে। হুমায়ুন হেরে গিয়ে লাহোরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শের শাহ সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। বাংলা দেশ থেকে মালব পর্যন্ত ভূভাগ তাঁর পদানত হয়। কিন্তু রাজপুতানা জয় করে ফেরার পথে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। কালঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় একটা বোমা এসে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে শের শাহর মৃত্যু হয়।

সামান্য অবস্থা থেকে বাদশাহর পদাধিকার শের শাহর সব চেয়ে বড় কীর্তি নয়, তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি প্রজাসাধারণের অধিকার স্বীকার। শের শাহর রাজত্বকালেই তারা জমিদারদের কাছ থেকে জমির সীমানা ও দেয় খাজানার প্রথম দলিল হাতে পায়। যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এখন ভারতের এক প্রান্তকে যুক্ত করেছে অপর প্রান্তের সঙ্গে তা শের শাহরই অন্যতম কীর্তি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু না হলে এই প্রজাবৎসল বাদশাহ আরও অনেক উন্নতি-বিধান করতে পারতেন।

গভীর ভাবে মিস্টার বোস চুরট টানছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন: পাটনা হল শের শাহের শহর। অনেক শতাব্দী পরে তিনি পুরনো পাটলিপুত্রের উপরেই নতুন পাটনার পত্তন করেছিলেন আর সসারামে নির্মাণ করেছিলেন নিজের সমাধি।

শীলা আশ্চর্য হয়ে বলল: সে কি! নিজের সমাধি কেউ নিজে নির্মাণ করে!

মিস্টার বোস বললেন: এ কোন নতুন জিনিস নয়, অনেকেই এ রকম করেছেন।

তার পরে সেই সমাধির কথা শোনালেন আমাদের।

হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য পদ্ধতিতে নির্মিত এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ সুন্দর সমাধি সৌধ এ দেশে কম আছে। প্রায় এক হাজার ফুট বাহুবিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণীর মাঝখানে এই সমাধিটি প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু ভিত্তির উপরে স্থাপিত। বাঁধানো পথ আছে সেখানে পৌঁছবার জন্য। তিনতলার উপরে গম্বুজ এবং গম্বুজের উপরে মন্দিরের মতো চূড়া। প্রতিটি তলায় চারিধারে আছে ছোট ছোট গম্বুজ। মাঝখানের বড় গম্বুজটি আগ্রার তাজমহলের চেয়েও বড়।

নিজের এই সমাধি শের শাহ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, যে সামান্য কাজ বাকি ছিল তা শেষ করেছেন তাঁর পুত্র সেলিম শাহ। সেলিম শাহরও সমাধি আছে সসারামে। গোয়ালিয়র থেকে তাঁর মৃতদেহ এনে এইখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। এই সমাধিও একটি বিরাট পুকুরের মাঝখানে তৈরি করা হচ্ছিল, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয় নি। এক মানুষ পর্যন্ত গাঁথা হয়ে পড়ে আছে।

শের শাহ তাঁর পিতা হাসান খান সুরের সমাধিটি সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বিরাট একটি অঙ্গনের ভিতরে এই সমাধি। এর পশ্চিমে একটি পুরনো মসজিদ ও দক্ষিণে একটি মাদ্রাসা আছে। এই সব মিলিয়ে একটি গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

সহসা শীলা বলে উঠল: দরকার নেই আমাদের গম্ভীর পরিবেশের। সসারামের সবই তো সমাধির ব্যাপার দেখছি।

মিস্টার বোস হেসে উঠে বললেন: কতকটা তাই। তবে সমাধি ছাড়াও দেখবার জিনিস আছে।

শীলার দিদি বললেন: চন্দন পীর পাহাড়ের কথা বল।

মিস্টার বোস বললেন: তার আগে পাঠানদের কথা শেষ করি—কিলা ঈদ্‌গা আর টার্কিশ বাথের কথা।

ঈদ্‌গা আমরা কোথায় দেখেছিলাম বল তো!

বলে শীলা অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল।

মিস্টার বোস বললেন: আগ্রা অঞ্চলে একটি ছোট স্টেশনের নাম ঈদ্‌গা।

আমি বললুম: ঈদের সময় নমাজ পড়বার জায়গাকে বলে ঈদ্‌গা। ঈদ্‌গা নিশ্চয়ই অনেক আছে।

মিস্টার বোস বললেন: ওই রকমই কিছু হবে। আর কিলা হল শের শাহর পৈতৃক বাড়ি, এখন তার ভগ্নদশা।

টার্কিশ বাথ কী?

একটা স্নানের জায়গা। রেললাইন বসবার আগে যাত্রীরা যখন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যাতায়াত করত, তখন তারা এইখানে স্নান করে একটা খাতায় প্রশংসা লিখে রাখত।

শীলা বলল: সেই খাতা আপনি দেখেছেন নাকি!

মাথা নেড়ে মিস্টার বোস বললেন: না, শুনেছি লোকের মুখে।

আর কিছু?

একটা পাহাড়ের নাম চন্দন পীরের পাহাড়। তার নিকটে একটা গুহায় নাকি অশোকের শিলালিপি আছে। শুধু এইখানে নয়, গয়া থেকে রাজগিরের পথেও আছে শুনেছি। এ সবে আমার বিশেষ কৌতূহল নেই বলে ভাল করে জানবার চেষ্টা করি নি। এখন আপসোস হচ্ছে।

কেন?

পুরনো জিনিস আপনি এমন ভালবাসেন জানলে অনেক কিছু জেনে নিতুম।

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: অশোকের শিলালিপি মানেই তো বৌদ্ধ অধিকার।

মিস্টার বোস বললেন: সসারামের লোক কিন্তু অন্য কথা বলে। অবশ্য মুসলমানেরা। তারা ওই গুহাকে চন্দন পীরের

চিরাগদান বলে। চিরাগ মানে বোঝেন তো। বাতি। চিরাগদান মানে বাতির আধার। চন্দন পীরের সমাধি আছে পাহাড়ের উপর, একটা দরগাও আছে।

আমি বললুম: গয়া থেকে রাজগিরের পথে কী আছে বললেন?

মিস্টার বোস বললেন: নিজে দেখি নি, শুনেছি লোকের মুখে। এ লাইনে বেলা নামে একটা স্টেশন থেকে মাইল ছয়েক যেতে হয়, গয়া থেকে বোধ হয় মাইল কুড়ি-বাইশ পথ। পাহাড়ের গায়ে গুহা তৈরি হয়েছিল বোম্বাই অঞ্চলের মতো। বারাবার ও নাগার্জুন নামের বৌদ্ধ গুহা। পাহাড়ের উপরে একটা শিবের মন্দিরও আছে বলে শুনেছি।

শীলার দিদি আমাকে বললেন: কয়েক দিন আমাদের কাছে থেকে সব দেখে নিন না।

বড় আন্তরিক অনুরোধ। সহসা প্রত্যাখ্যান করা যায় না, আবার রাজী হওয়াও চলে না। হেসে বললুম: সব কিছু জানবার ও দেখবার সৌভাগ্য কি সবার হয়!

মিস্টার বোস বললেন: কেন হবে না! দু একদিন থাকুন পাটনায়। তারপরে দেখতে পাবেন। শুধু বৌদ্ধ গুহা নয়। বিশ্বামিত্রের আশ্রমও আপনাকে দেখিয়ে আনব।

সে আবার কোথায়?

মিস্টার বোস সংক্ষেপে বললেন: বক্সারে।

শীলা বলল: বক্সারের জেলখানার কথা শুনেছি। ইংরেজের আমলে বড় বড় দেশনেতারা সেখানে বন্দী ছিলেন।

মিস্টার বোস বললেন: আর আছে সিপাহী বিদ্রোহের নেতা কুমার সিংহের দুর্গ। কিন্তু গোপালবাবুর ভাল লাগবে গঙ্গার ধারে রামলেখা ঘাট। শহর থেকে পাকা রাস্তা এসেছে গঙ্গা পর্যন্ত। এক ধারে শিবের মন্দির, অন্য ধারে বিশ্বামিত্র আশ্রম। যেখানে

তাড়কা বধ হয়েছিল আর যেখানে অহল্যা উদ্ধার হয়েছিলেন, সে দুটি জায়গাও বেশি দূরে নয়। অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে বিশ্বামিত্র মুনি রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে এই পথে গিয়েছিলেন মিথিলার জনক রাজার সভায়।

আমার দিকে তাকিয়ে শীলা বলল: তবে তো আপনাকে যেতেই হবে সেখানে।

আমি এ কথার উত্তর দিলুম না।

৩৩

আমি বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলুম খানিকক্ষণ, শীলার কথায় আমার খেয়াল হল। শীলা জিজ্ঞেস করেছিল : এ কোন্ নদী আমরা পেরিয়ে এলুম জামাইবাবু ?

মিস্টার বোস বললেন : এই সেই বিখ্যাত পুন্‌পুন্ নদী।

পুল পেরবার আওয়াজ বোধ হয় শুনেছিলুম, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি নি। কত চওড়া নদী, আর কত জল তাতে, তা আমার দেখা হল না। আপসোস হল নিজের অন্যমনস্কতার জন্য।

শীলা বলল : বিখ্যাত কেন ?

মিস্টার বোস বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : বিখ্যাত নয়! এই নদীর জন্যে আমরা মোটরে না এসে ট্রেনে চেপেছি, এই নদীর দাপটে এক সময় সরকারকে শহর রক্ষার জন্যে দেওয়াল গাঁথতে হয়েছিল রাস্তার ধারে ধারে। কুম্‌হ্রারের পথে দেখ নি সেই দেওয়াল!

দেখেছি তো।

আর—

আর কী ?

পুন্‌পুনের তীর্থমাহাত্ম্য গোপালবাবুকে জিজ্ঞেস কর।

বলে মিস্টার বোস সহাস্যে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : কেন, আমি কি গয়ার পাণ্ডা নাকি!

এ কথার উত্তর না দিয়ে মিস্টার বোস বললেন : গয়ায় পিণ্ডদান করতে হলে পুন্‌পুন্ নদীতে আগে স্নান করতে হবে। যাঁরা দিল্লী আগ্রা বেনারস থেকে মোগল সরাইএর উপর দিয়ে আসেন, তাঁরা নামেন অনুগ্রহ নারায়ণ রোড স্টেশনে, আর পাটনা থেকে এলে পুন্‌পুন্ স্টেশনে নামতে হবে। দু জায়গাতেই আছে পুন্‌পুন্ নদী,

স্নান করে গয়ায় এলে নির্ঝঞ্ঝাট। তা না হলে পাণ্ডারা ফেরত পাঠিয়ে দেবে পুনপুন্ নদীতে স্নানের জন্যে। বাংলা দেশের যাত্রীরা কেউ সোজা আসেন হাজারিবাগের উপর দিয়ে, কেউ আসেন কিউল হয়ে। তাঁদের ভারি দুর্দশা। পাণ্ডার খপ্পরে পড়লে পুনপুন্ নদীতে স্নান করতেই হবে।

বলে হেসে উঠলেন।

আমি একখানি পুরনো বই-এ পড়েছিলুম যে গয়ায় পিণ্ড দিতে এলে পুরো একটি বছর সময় লাগে। দিনে একটি করে তিনশো ষাট জায়গায় পিণ্ড দিতে হয়।

আমাব কথা শুনে শীলা চমকে উঠল, বলল : সত্যি নাকি।

মিস্টার বোস বললেন : এখনও নাকি পঁয়তাল্লিশটি বেদী আছে। ভক্তিমান যজমান পেলে এখনও পাণ্ডারা পঁয়তাল্লিশ জায়গায় পিণ্ড দেওয়ায়। দেবে নাই বা কেন। ফল যে এখানে হাতে হাতে পাওয়া যায়। মা জানকীর হাত থেকে রাজা দশরথ হাত বাড়িয়ে পিণ্ড নিয়েছিলেন।

অনিমেষের চোখে ছিল অবিশ্বাসের দৃষ্টি। তাই দেখে মিস্টাব বোস বললেন : বিশ্বাস হল না ব্রাদার!

অনিমেষ কোন উত্তর দিল না।

মিস্টার বোস বললেন : বিষ্ণুপাদ মন্দিরের পাশ দিয়ে বইছে ফল্গু নদী। নদী পেরিয়ে ওপারে যেও সীতাকুণ্ডে। মন্দিরের ভিতর দেখবে কালো পাথরের হাত, তা রাজা দশরথের।

শীলা বলল : অবিশ্বাস্য কথা।

আমি বললুম : ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাসের ওপরে, বিশ্বাস না থাকলে ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই।

মিস্টার বোস বললেন : দাঁড়ান দাঁড়ান, কথাটা একবার ভেবে দেখি।

চোখ বুজে ভদ্রলোক যেন অনেক কিছু ভাবলেন, তারপরে

বললেন ঃ কথাটা মিথ্যে নয়, ভগবান নিজেই যখন বিশ্বাসের বস্তু, তখন ধর্ম জিনিসটাও বিশ্বাসের। আমরা না মানলে সত্যিই ধর্মের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

আপত্তি জানাল অনিমেষ, বলল ঃ না, ধর্ম না মেনেও পৃথিবীর কোন লোক ধর্মকে মুছে ফেলতে পারে নি। সব মানুষের মনে বিবেক বলে এমন একটা জিনিস আছে যে ন্যায় অন্যায় ও ধর্ম অধর্মকে সারাক্ষণ আলাদা করে রেখেছে।

শীলার দিদি বললেন ঃ তর্কের কথা থাক, গয়া কেন এত বড় তীর্থ হল, সেই গল্প বল।

বলে মিস্টার বোসের দিকে তাকালেন।

মিস্টার বোস বললেন ঃ সে গল্প গোপালবাবু আমার চেয়ে ভাল বলবেন।

শীলা আমার মুখের দিকে তাকাল। আর তার দিদি বললেন ঃ বলুন না ভাই।

আমি আর দেরি না করে বললুম ঃ গয়া মাহাত্ম্য আছে বায়ুপুরাণে। গয়াসুরের গল্প। জাতে অসুর হলেও তার আচরণ ছিল ধার্মিকের মতো। একবার সে কোলাহল পর্বতে উঠে তপস্যা করতে বসল। কঠোর তপস্যা।

দেবতারা দেখলেন মহা বিপদ। একে ধার্মিক, তার উপর এই তপস্যা। এ তো স্বর্গরাজ্য থেকে দেবতাদের তাড়াবে না, নিজেই দেবতা হয়ে বসবে, আর দেবতারা বঞ্চিত হবেন নিজ নিজ অধিকারে। কী করা যায়! ইন্দ্র বললেন, চল পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, বিষ্ণুর কাছে চল। বৈকুণ্ঠে সভা বসল। অনেক চেঁচামেচির পর ভোটে একটা রেজলিউশন পাস হল, তপস্যা শেষ হবার আগেই গয়াসুরকে বর দিয়ে দেওয়া যাক।

তারপর দেবতারা সবাই গিয়ে কোলাহল পর্বতে উঠলেন।

বললেন, বৎস, আমরা তোমার তপস্যায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর নাও।

গয়াসুর বললেন, তবে এই বর দাও প্রভু যে আমার দেহ যেন পৃথিবীর পবিত্রতম বস্তু হয়।

দেবতারা বললেন, এ আবার এমন কী বর! দিয়ে দাও, দিয়ে দাও।

তথাস্তু বলে সবাই বিদায় নিলেন।

এদিকে গয়াসুর তার দেশে ফিরে বুক ফুলিয়ে রাস্তা দিয়ে বেড়াতে লাগল। যত পশুপাখি পাপীতাপী তার পবিত্র দেহ দেখে উদ্ধার হয়ে যেতে লাগল। একেবারে সোজা স্বর্গবাস। নরক শূন্য হয়ে গেল। যমরাজের কাজকর্ম নেই, বিচার কার করবেন, আর কাকে শাস্তি দেবেন! গয়াসুর এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাচ্ছে, এক নগর থেকে অন্য নগরে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। জীবের মুক্তির জন্য সে দিশেহারা। আর তার দর্শন পেয়েই সবাই স্বর্গে যাচ্ছে। স্বর্গে হল স্থানাভাব, পঙ্গপালের মতো উদ্বাস্তুর চাপে স্বর্গে তিষ্ঠান দায় হয়ে উঠল।

আবার দেবতাদের সভা বসল। অনেক পরামর্শ, অনেক চেঁচামেচি, হাতাহাতির পর স্থির হল, গয়াসুরকে নিশ্চল কর, ও যেন নড়তে না পারে।

দেবতারা অমনি গিয়ে গয়াসুরকে বললেন, যজ্ঞের জন্য তোমার দেহের দরকার। আমরা তোমার পবিত্র দেহের উপরে যজ্ঞ করব।

গয়াসুর বলল, সে তো আমার সৌভাগ্য প্রভু।

গয়ায় মাথা উড়িষ্যার যাজপুরে নাভি ও অন্ধ্রের পীঠাপুরমে পা রেখে গয়াসুর শুয়ে পড়ল। এইবারে তার দেহের উপরে যজ্ঞ আরম্ভ হবে।

প্রথমেই তাকে নিশ্চল করার চেষ্টা হল। ব্রহ্মা যমরাজকে বললেন, ধর্মশিলাটি তার দেহের উপরে রাখতে। সমস্ত দেবতারা

সেই ধর্মশিলার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু গয়াসুর নিশ্চল হল না। তখন বিষ্ণুও তার উপর উঠলেন। গয়াসুর নিশ্চল হয়ে বলল, আমাকে নিশ্চল করবার জন্য আপনাদের এত কষ্টের কী দরকার ছিল! আমাকে একবার বললেই তো পারতেন!

দেবতারা স্বীকার করলেন, সত্যিই তো। তাহলে তুমি আর একটি বর নাও।

গয়াসুর বলল, আমার নিজের জন্য আমি কিছুই চাই না। আপনারা এই বর দিন যে যত দিন পৃথিবী থাকবে আর আকাশে উঠবে চন্দ্রসূর্য, আপনারা সকলেই এই শিলায় অবস্থান করবেন, আর এই স্থান একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হবে।

দেবতারা বললেন, তথাস্তু।

গয়াসুরের নামে এই তীর্থের নাম হল গয়া।

চলতি ট্রেনে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়, তা না হলে সবাই শুনতে পায় না। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে বেশ ক্লান্তি বোধ করেছিলুম। কিন্তু আমি থামতেই মিস্টার বোস বললেন: ধর্মশিলার গল্পটা বলবেন না?

আমি বললুম: সে গল্প জানি নে তো!

মিস্টার বোস বললেন: গয়ার পাণ্ডারা বলে সেও বায়ুপুরাণের গল্প।

শীলা বলে উঠল: বলুন না গল্পটা।

মিস্টার বোস বললেন: আমি কি গোপালবাবুর মতো বলতে পারি!

কেন পারবেন না!

মিস্টার বোস আর কোন তর্ক করলেন না, বললেন: ব্রহ্মার পুত্র মরীচি মুনির কথা। পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়াবার সময় তিনি একটি যুবতী কন্যাকে দেখলেন কঠোর তপস্যারত। প্রশ্ন করে মরীচি তাঁর পরিচয় জেনে নিলেন—রাজা ধর্মের কন্যা ধর্মব্রতা,

বিশ্বরূপা তাঁর মা। ঋষি বললেন, কী জন্যে এই কঠিন তপস্যায় নিজের যৌবন ক্ষয় করছ?

সলাজে ধর্মব্রতা বললেন, পতিব্রতা হবার জন্যে।

মরীচি বললেন, আমিও যে এমনি এক পতিব্রতাকে পাবার জন্যে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাকে তুমি বিবাহ কর, আমার মতো পতি তুমি পাবে না।

ধর্মব্রতা বললেন, আমার পিতার কাছে এই প্রস্তাব করুন।

মরীচি তাই করলেন এবং দুজনের বিবাহ হয়ে গেল।

শীলা জিজ্ঞাসা করল: এ কী রকম ধর্মশিলার গল্প?

সে গল্প আছে অগ্নিপুরাণে।

শীলার দিদি বলে উঠলেন: পুরাণের নাম ঠিক বলছ, না আন্দাজে?

মিস্টার বোস বললেন: বায়ুপুরাণেও বোধ হয় আছে।

আমি বললুম: আপনি গল্পটা এবারে বলুন।

এ গল্প স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়ার, দুজনেই দুজনকে শাপ দিলেন অতি তুচ্ছ কারণে। মরীচি তাঁব স্ত্রীকে পদসেবার আদেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙলে দেখলেন যে স্ত্রী নেই, কোলের উপব থেকে পা নামিয়ে রেখে কখন এক সময় তিনি উঠে গেছেন। আর যায় কোথা কিছু জানতে না চেয়েই শাপ দিলেন যে তুমি শিলা হও। ধর্মব্রতা অকারণে উঠে যান নি। তাঁর শ্বশুর ব্রহ্মা এসেছিলেন বেড়াতে, তাঁরই অভ্যর্থনার জন্য তাঁকে উঠে যেতে হয়েছিল। স্বামীর এই অন্যায় শাপে ধর্মব্রতাও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন যে এর জন্য শিব মরীচিকে শাপ দেবেন। কিন্তু ধর্মব্রতার দুঃখ তাতে ঘুচল না, দেবতাদের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন যে স্বামীর অভিশাপ তো খণ্ডাবার নয়, তাই তিনি যে শিলায় পরিণত হবেন তা যেন পবিত্র হয় তীর্থের মতো। দেবতারা বললেন যে তাই হবে, কিন্তু পরে গয়াসুরের দেহের উপরে স্থাপন করে দেবতারা যখন তার উপরে

উঠবেন, তখন তা পবিত্র হবে, আর সেই শিলার উপরে পিণ্ড দিলে মুক্তি হবে পূর্বপুরুষের।

শীলা বলল : মরীচিকে শিব কী শাপ দিয়েছিলেন ?

মিস্টার বোস বললেন : জানি নে। তবে আরও একটা গল্প শুনেছিলুম পাণ্ডাদের কাছে। বিষ্ণু এখানে গদাধর কেন, সেই গল্প। গল্পটা ভাল লাগে নি বলে এখন আর মনে নেই।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন : এই সব গল্পের আড়ালে কি কোন্ সত্য নেই ?

অনেক দিন আগে আমি এ নিয়ে একটা আলোচনা পড়েছিলুম, সেই কথাই তাঁকে বললুম : গয়াসুরের কাহিনী নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক কিছু বলেন। আমাদের রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন যে এই গল্প দিয়ে বৌদ্ধধর্মের উপরে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। গয়াসুরের মতো অসুরেরাও ধার্মিক, কিন্তু সনাতন ধর্মের অনুকূল নয় বলে তাকে বিনাশের প্রয়োজন হয়েছিল। ডক্টর কানে অন্য কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন যে খ্রীষ্টের জন্মের অনেক শতাব্দী আগে থেকেই পিতৃতার্থরূপে গয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পুরাণকাররা এই সব কাহিনী রচনা করে পুরনো ধারণারই সমর্থন করেছেন।

মিস্টার বোস বললেন : পুরাণও তো এ যুগের রচনা নয়, সেও অতি প্রাচীন কালের।

আমি বললুম : গয়ার মতো প্রাচীন নয়।

কী রকম ?

সাধারণ ভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচনা। কালের হিসাবে সাড়েচার হাজার বছরের পুরনো, কেন না কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় আমাদের মোটামুটি ভাবে জানা আছে। কিন্তু এখন আমরা যে সংস্কৃত গ্রন্থগুলি পাই তা নিশ্চয়ই বেদব্যাসের রচনা নয়। অনেক পণ্ডিতের মতে সেগুলি মহাকবি কালিদাসেরও পরবর্তীকালের রচনা।

মিস্টার বোস বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : সত্যি নাকি!

হেসে বললুম : সত্যি মিথ্যে তো জানি নে, পণ্ডিতদের ধারণা যে পুরাণগুলি চতুর্থ শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত হয়েছে। বায়ুপুরাণটিই প্রাচীনতম বলে অনেকে মনে করেন, এটির রচনাকাল চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। তার আগে—

মিস্টার বোস বললেন : বলুন।

লজ্জিত ভাবে বললুম : পণ্ডিতদের কচকচি আপনাদের ভাল লাগবে না।

অভিভাবকের মতো গম্ভীর স্বরে ভদ্রলোক বললেন : বলুন না আপনি।

তার আগে নাকি গয়া বৌদ্ধদের তীর্থ ছিল। হাণ্টার ও বাকিংহাম সাহেবের মতো রাজেন্দ্রলাল মিত্রও মনে করেন যে বৌদ্ধ যুগের আগে গয়া হিন্দুতীর্থ ছিল না। কিন্তু এ কথা আমার মানতে ইচ্ছা করে না। বাল্মীকির রামায়ণেও যে আমরা গয়ার উল্লেখ পেয়েছি। মহাভারতেও আছে এই তীর্থের উল্লেখ। রাজর্ষি গয় এখানে একটি বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলেই এই স্থানের নাম হয়েছে গয়া। হরিবংশে আবার অন্য কথা আছে। মনুর এক পৌত্রের নাম গয়, এই গয় গয়া পুরীতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। গয়া একটি পবিত্র স্থান ছিল বলেই রাজকুমার গৌতম এখানে তপস্যার জন্য এসেছিলেন। তিনি বুদ্ধ হবার পর এটি বৌদ্ধ তীর্থে পরিণত হয়েছে। তার মানে এই নয় যে গয়া হিন্দুতীর্থ হয়েছে পরবর্তী কালে।

শীলার দিদি আমার দিকে আশ্চর্য ভাবে তাকালেন। আমি লজ্জা পেলুম সেই দৃষ্টির সামনে। বাহিরের দিকে তাকিয়ে বললুম : আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি, তাই না!

মিস্টার বোস বললেন : এখনও অনেক পথ বাকি আছে। আপনি বলুন।

কিন্তু আমি আর কিছু বলতে পারলুম না। এর বেশি আমার জানাও ছিল না।

সামনের দিকে বসে উসখুস করছিল অনিমেষ। আমরা থামতেই বলে উঠল: এ লাইনের গাড়ি দেখছি দৌড়য় না, পায়ে পায়ে হাঁটে।

মিস্টার বোস বললেন: খাঁটি কথা ব্রাদার, সেই দুঃখেই এ দিকে আসি না। সাতান্ন মাইল পথ পেরতে আড়াই ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। গাড়িতে বসে বসেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

শীলা বলল: এর চেয়ে বোধ হয় মোটরে আসা ভাল।

মিস্টার বোস হেসে বললেন: তাহলে আর সাতান্ন মাইল নয়, এক দিনে ফেরাও হয়তো সম্ভব হবে না।

এদিকের স্টেশনগুলো ছোট ছোট, প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায়, আবার চলে। লোকজন ওঠানামা করে। কিন্তু এ কম্পার্টমেণ্টে কেউ উঠছে না। তাইতেই বোধ হয় বিরক্তি বোধ হচ্ছে বেশি।

আমাদের দিকে তাকিয়ে শীলার দিদি হাসলেন। উঠে গিয়ে একটা ঝুড়ির ভিতর থেকে একটা কাগজের ঠোঙা বার করলেন। তারপর অনিমেষের হাতে দিয়ে বললেন: এইবারে সময় কাটবে।

অনিমেষের দু চোখে আমি পুলক দেখলুম। অনেক উদ্যম পেয়েছে সে। হাসিমুখে সবার সামনে সে ঠোঙাটি এগিয়ে ধরতে লাগল। আমার সামনেও এল। এক ঠোঙা চিনেবাদাম, আর কোন ভাবনা নেই। এই চিনেবাদাম শেষ হবার আগেই আমরা গয়ায় পৌঁছে যাব।

শীলার দিদি বললেন: ফ্লাস্কে চাও আছে।

১৪

গয়া স্টেশনটি বেশ বড়। পাটনার মতো বড় না হলেও একে ছোট কোনমতেই বলা চলে না। মস্ত দোতলা বাড়ি, নিচের তলায় অফিস ঘর, বিশ্রামগৃহ ও রিফ্রেশমেন্ট রুম। ফার্স্ট ক্লাসের ওয়েটিং রুম রিটায়ারিং রুম ও রেস্তোরাঁ উপর তলায়। স্টেশনেই একটি টুরিস্ট অফিস আছে।

এখানে ট্রেন আসে চার দিক থেকে। কলকাতা ও দিল্লীর দিক থেকে, আর শাখা লাইন আসে পাটনা ও কিউল থেকে। আমাদের গাড়ি স্টেশন বিল্ডিঙের উল্টো ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমরা ওভার-ব্রিজের উপর দিয়ে এলুম সদর প্ল্যাটফর্মে। তারপরে বেরবার মুখে ডান হাতে দেখলুম টুরিস্ট অফিসটি খোঁজ খবর নিতে গিয়েই জানা গেল যে তাদের একখানা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর জন্য। মিস্টার বোস আর দেরি করলেন না, বললেন: গাড়িটি আমাদের চাই।

স্টেশনের বাইরে রিক্স ও ট্যাক্সিও ছিল অনেক। কিন্তু তিনি বললেন: ট্যাক্সিতে চাপাচাপি হবে, আর দেখছেন তো, মিটার নেই কারও। দরাদরি করার চেয়ে সরকারী রেট দেওয়া ভাল।

আমি এক নজরে এই শহরের সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেবার চেষ্টা করলুম। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড় দেখে মনে হল যে এই শহরটাই বোধহয় এমনি পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড়ের মাথায় মাথায় শাদা মন্দিরও দেখতে পাচ্ছি। স্টেশনের এলাকাটি বেশ পরিচ্ছন্ন। রৌদ্র তখনও প্রখর হয় নি বলে আবহাওয়াটি ভালই লাগল।

টুরিস্ট অফিসের গাড়িতে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

কিন্তু বেশিক্ষণ আমাদের এই প্রসন্নতা রইল না। স্টেশন এলাকা পেরিয়ে শহরের আবহাওয়া একেবারে অন্য রকম। পথ ঘাট অপরিচ্ছন্ন, মেরামতের অবহেলায় অসমতল। তবু মন্দ লাগছে না, নতুন শহর দেখার আনন্দে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চললুম।

মিস্টার বোস বললেন: এখানকার সব পাহাড়ের নাম জানা আছে তো?

কাকে জিজ্ঞাসা করলেন জানি না, কিন্তু উত্তর আমি দিলুম, বললুম: না।

মিস্টার বোস বললেন: গয়া জেলার দক্ষিণ সীমানায় কৌলেশ্বরী নামে এক পাহাড় আছে, তার উপরে কৌলেশ্বরী দেবীর মন্দির। এ দিকের লোকে কী বলে জানেন? বলে, মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার নগর ছিল সেখানে। একটা পুরনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে বলে যে তা বিরাট রাজারই দুর্গ। কৌরবদের সঙ্গে বিরাট রাজার যুদ্ধ নাকি ঐখানেই হয়েছিল।

আমি বললুম: বাঙলার দিনাজপুরেও এই রকমের গল্প প্রচলিত আছে।

মিস্টার বোস বললেন: থাকবেই। আমাদের বর্তমান তো গৌরবের নয়, তাই আমরা প্রাচীন ঐতিহ্য আঁকড়ে বাঁচতে চাই।

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলুম না। মিস্টার বোস বললেন: গয়া শহরে পাহাড় আছে তিনটি—রাম শিলা প্রেত শিলা ও ব্রহ্ম যোনি পাহাড়।

আমরা যাচ্ছিলুম বিষ্ণুপাদ মন্দিরের দিকে। পথে যেতে যেতেই ভদ্রলোক আমাদের পাহাড়ের গল্প শোনালেন।—

বিষ্ণুপাদ মন্দিরটি ঘিরেই গয়া শহরটি গড়ে উঠেছে। মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে খানিকটা দূরে সূর্য কুণ্ড নামে একটি মস্ত পুকুর। তার দক্ষিণ দিয়ে একটি পথ ব্রহ্ম সরোবরের দিকে গেছে। সূর্যকুণ্ড থেকে উত্তর মানস প্রায় মাইল খানেক। এরই কাছে সাহেবগঞ্জ

চক। এইখান থেকেই একটা পথ রাম শিলা পাহাড়ের দিকে গেছে।

আমি হেসে বললুম ঃ এই অঞ্চলটা সম্বন্ধে একেবারে পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল।

মিস্টার বোস লজ্জিত ভাবে বললেন ঃ এর চেয়ে ভাল করে বোঝাতে আমি পারব না।

বললুম ঃ তার দরকার নেই, আপনি রাম শিলার কথা বলুন।

ভদ্রলোক বললেন ঃ প্রথমে পাবেন দুঃখ হরণ দেবী, তারপরে রেলের পুলের নিচে দিয়ে যাবেন। কাকবলী দেবীর মন্দিরে দেখবেন যাত্রীরা পিণ্ড দিচ্ছে। বিষ্ণুপাদ মন্দির থেকে এই জায়গার দূরত্ব হবে মাইল তিনেক। তারপরে রাম শিলা পাহাড়। পাহাড়ের উপরে আপনি পাতালেশ্বর শিব ও রামলক্ষ্মণের মন্দির দেখবেন।

শীলা বলল ঃ পাহাড়ের উপরে আমাদের উঠতে হবে নাকি ?

মিস্টার বোস আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ অত কষ্ট কি তোমাকে দিতে পারি! প্রেত শিলা পাহাড়েও তোমাকে উঠতে বলব না।

সেখানে কী দেখবার আছে ?

মিস্টার বোস বললেন ঃ পাহাড়ের নিচে ব্রহ্মকুণ্ড, আর ওপরে একটা মণ্ডপের নিচে পাথরের গায়ে স্বর্ণরেখা, লোকে বলে ব্রহ্মার লিপি।

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ভদ্রলোক বললেন ঃ রাম শিলা থেকে ছ মাইল দূরে এই প্রেত শিলা, কিন্তু উঁচু বেশি নয়, শ চারেক মাত্র সিঁড়ি।

শীলা আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ চার শো !

মিস্টার বোস বললেন ঃ যাত্রীদের ওপরে না উঠলেও চলে। পিণ্ড দিতে হয় নিচে, ব্রহ্মকুণ্ডের বাঁধানো ঘাটের ওপর। গয়ায় এসে প্রথম পিণ্ড দিতে হয় প্রেত শিলায়, তারপর রাম শিলায়। অপঘাতে মৃত্যু হলে প্রেত শিলায় পিণ্ড দিতেই হবে, তা না দিলে বুঝতেই পারছ।

বলে শীলার দিকে তিনি ফিরে তাকালেন।

শীলা বলল: বুঝেছি, ভূত হয়ে নিশ্চয়ই ঘাড়ে চাপবে।

ব্রহ্ম যোনি পাহাড়ের কথা আমাদের শোনা হল না, তার আগেই আমাদের গাড়ি একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তাটি নূতন তৈরি মনে হল, দুধারে ঘরবাড়ি নেই, লোকজনও কেউ হাঁটছে না। দুতিনখানা রিক্স শুধু দাঁড়িয়ে ছিল।

মিস্টার বোস ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন: এখানে দাঁড়ালেন কেন?

ড্রাইভাব গাড়ি থেকে নেমে আমাদেব দরজা খুলে ধবেছিল। তাই দেখে আমরা সবাই নেমে পড়লুম। একজন ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গ নিল, বলল যে আমরা বিষ্ণুপাদ মন্দিরের দরজাতে পৌঁছে গেছি।

আমি শুনেছিলুম যে এই মন্দিরের দরজা পর্যন্ত কোন গাড়ি ঘোড়া যায় না। তাই আমি আশ্চর্য হয়ে চারি দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। ব্রাহ্মণ আমার বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পেরে বলল: কিছু দিন আগে মোটর গাড়িতে এলে শ্মশান ঘাটে নামতে হত। নয়া খড়ির ফটক দিয়ে হেঁটে আসবার পথ।

মিস্টার বোস বললেন: এমনি করে গাড়িতে চেপে মন্দিরের দরজায় এসে নামলে মন্দিরে এসেছি বলেই মনে হয় না। আগে যখন সঙ্কীর্ণ অলি গলি ধরে আসতে হত তখন মনটাও বোধহয় তৈরি হয়ে যেত। কাশীতে বিশ্বনাথ গলির ঠ্যালাঠেলিতে কিংবা বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরের গলিতে পাণ্ডাকে বলতে হয় না যে মন্দিরের দরজায় পৌঁছে গেছি।

ব্রাহ্মণ আমাদের হাতছানি দিয়ে এগোচ্ছিলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলুম।

একটি মস্তবড় এলাকার মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি মন্দির।

ব্রাহ্মণ বললেন : আসুন, আগে ফল্গু নদীতে স্নান তর্পণ সেরে নিন, তারপর ক্রিয়াকর্ম হবে।

মিস্টার বোস এক ধমক দিলেন, বললেন: স্নান তর্পণ ক্রিয়াকর্মের জন্যে আমরা আসি নি। আমরা দেখতে এসেছি।

কিন্তু নির্বিকার ভাবে আমাদের ব্রাহ্মণ এগোতে লাগলেন। এ রকমের কথা তাঁরা কটূক্তি বলে মনে করেন না। গয়ার পাণ্ডাদের কথা আমি একখানা পুরনো বইএ পড়েছিলুম। এই পাণ্ডাদের গয়ালী ব্রাহ্মণ বলে। এক সময় নাকি তাঁরা নিরীহ যাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে অনেক পয়সা রোজগার করেছেন, তারপর নিজেরা আর যাত্রী ধরতে বেরোন না। সে কাজের জন্য অন্য ব্রাহ্মণ আছে, তারা যাত্রী ধরে ক্রিয়াকর্ম করায়। শেষ কাজ সুফলটি তাঁরা নিজে দেন প্রাপ্য দক্ষিণাটি আদায় করবার পর। উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থেই পাণ্ডাদের জুলুম কিছু না কিছু ছিল। নিরীহ যাত্রীদের উপরেই জুলুমটা বেশি হয়। এই অবস্থার প্রথম প্রতিবাদ যাত্রীরা করেন নি, করেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীরা। যাত্রীদের রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে তাঁরা নিগৃহীত হয়েছেন, সফলও হয়েছেন অনেক পরিমাণে। শুনেছি যে গয়াতেও তাঁদের ভাল ব্যবস্থা আছে। সেখানে উপস্থিত হলে পিণ্ডদানের সমস্ত সুব্যবস্থা তাঁরাই করে দেন। কিন্তু ঠকবারও ভয় আছে শুনলুম। রিক্সওয়ালারা ভুল জায়গাতেও যাত্রীদের পোঁছে দেয় এবং তারা ভুল পরিচয় দিয়ে যাত্রীদের ঠকাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে মন্দির প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে আমরা একসময় ফল্গু নদীর সামনে এসে উপস্থিত হলুম। তীরে বলব না, তীর এখান থেকে অনেক নিচে, বহু সিঁড়ি নেমে আমাদের ফল্গু নদীর শুকনো বালির উপরে পোঁছতে হবে। মনে হল যে এই নদীর তীরে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

শীলা বলল : এ নদী কোথায়, এতো শুধু বালি !

সত্যিই তাই। প্রশস্ত নদীর বুকে শুধু বালি, আর ক্ষীণ একটি জলের ধারা এঁকে বেঁকে ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। মিস্টার বোস বললেন : ফল্গু যে অন্তঃসলিলা। দেখছ না যাত্রীরা বালি খুঁড়ে জল বার করছে।

ফল্গু কেন অন্তঃসলিলা হল সে গল্পটি আমি ভুলে গেছি। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য মা জানকী ফল্গুকে শাপ দিয়েছিলেন, আর বর দিয়েছিলেন অক্ষয় বটকে। সে সত্যি কথা বলেছিল।

ব্রাহ্মণ বললেন : নদীর ওপারে সীতাকুণ্ড দেখুন। মন্দিরে দশরথের হাত আছে। তিনি মা জানকীর হাত থেকে পিণ্ডগ্রহণ করেছিলেন।

বালির উপরে আমরা খানকয়েক নৌকো দেখতে পেলুম। বোধহয় বর্ষার সময় এই নৌকোয় পারাপার করতে হয়। যাত্রীবা এখন জলের উপর দিয়ে হেঁটেই ওপারে চলে যাচ্ছে।

মিস্টার বোসকে আমি বললুম : পাহাড়ের গল্পটা আপনার শেষ হয় নি।

মিস্টার বোস বললেন : রাম শিলা ও প্রেত শিলার কথা বলেছি, বাকি আছে ব্রহ্ম যোনি পাহাড়ের কথা। বুদ্ধগয়া যাবার পথে সে পাহাড় দেখতে পাবেন, এখান থেকে মাইল খানেক দূরে।

ব্রাহ্মণ বললেন : চারশো চব্বিশটি সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হবে।

কী আছে দেখবার ?

দুটি সংকীর্ণ গুহা আছে, তার নাম মাতৃ যোনি। কিন্তু যাবার পথে অক্ষয় বট ও মঙ্গলা গৌরী দর্শন করে যাবেন। রুক্মিণীকুণ্ডে স্নান করে অক্ষয়বটের নিচে শেষ পিণ্ড দানের বিধি। পাণ্ডারা সেইখানেই সুফল দেন।

শীলা জিজ্ঞাসা করল : সুফল কী ?

ব্রাহ্মণ বললেন : যাত্রীরা এই সুফলের জন্যেই তো আসে। শ্রাদ্ধ শান্তি পিণ্ডদানের পর যাত্রীরা বটগাছের নিচে বসে পাণ্ডাকে দক্ষিণা দেন, আর পাণ্ডা দেন সুফল। মানে, যাত্রীকে বলেন, তোমার গয়াকার্য সফল হল। ঐ অক্ষয় বট তো আজকের গাছ নয়, মা জানকীর বরে ত্রেতাযুগ থেকে অক্ষয় হয়ে আছে। সে সাক্ষী রইল।

অক্ষয় বট থেকে কিছু দূরে আদি মায়া মঙ্গলা গৌরীর মন্দির একশো পঁচিশটি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়। উত্তরে জনার্দনের মন্দির।

মিস্টার বোস তখন পিছন ফিরে মন্দিরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। আমরাও তাঁর পিছনে চললুম। মিস্টার বোস আমাকে বললেন : এখানে আকাশগঙ্গা নামে একটি পবিত্র স্থান কোথায় আছে জানি নে। একজন বলেছিলেন যে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ সেখানে কিছুকাল সাধনা করেছিলেন।

প্রথমে আমরা গয়েশ্বরী দেবীকে দেখলুম। শক্তি মূর্তি, অন্ধকার ঘরে তাঁর উজ্জ্বল চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। শিব অন্যত্র আছেন।

পূর্বদিকের সদর দরজার সামনেই হনুমানের বিশাল মূর্তি। উত্তরে রাণী অহল্যা বাঈএর মূর্তিও আছে। ইন্দোরের রাণী অহল্যা বাঈ ভারতের সকল তীর্থে প্রাতঃস্মরণীয়া হয়ে আছেন। বিষ্ণুপাদ মন্দিরটিও তিনি নির্মাণ করে দিয়েছেন। এত বড় পাথরের মন্দির এ অঞ্চলে আর নেই। মূল মন্দির সংলগ্ন সভামণ্ডপটিও সুন্দর। প্রাঙ্গণের একটি বৃক্ষের নিচে যাত্রীরা সারি সারি পিণ্ডদানে বসেছে। পুরুষ ও বিধবা নারীদের মন্ত্র পড়াচ্ছেন ব্রাহ্মণেরা। আমরা তাঁদের পাশ দিয়ে মূল মন্দিরের দরজায় এসে উঠলুম।

বিষ্ণুপাদ মন্দিরে বিষ্ণুর পদচিহ্ন, তারই উপরে মন্দির। কোন মূর্তি নেই, কোন চিত্র নেই, শুধু দুটি পায়ের চিহ্ন। দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে আমি তাকিয়ে দেখছিলুম আর ভাবছিলুম সেই

বিরাট পুরুষের কথা, যাঁর পায়ের চিহ্ন দেখবার জন্য শত সহস্র যাত্রী ঐ বেদীর উপরে নিত্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

একদিন বাঙলার ছেলে নিমাইও পিতার পিণ্ড দিতে এসে এই মন্দিরের দরজায় এমনি করে দাঁড়িয়েছিলেন। সম্মোহিত হয়েছিলেন। সম্মোহিত হয়েছিলেন এই বিষ্ণু পাদপদ্ম দেখে। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পূর্ণ তাঁর যৌবনের ঔদ্ধত্য এখানে ফুরিয়ে গেল, মাথা নোয়ালেন তিনি, দীক্ষা নিলেন ঈশ্বর পুরীর নিকটে। জীবের দুঃখ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর থেকে। নিমাই হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

তারপর?

তারপর আর একজনের কথা মনে এল। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কথা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে আমি সেই কথা পড়েছিলুম। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি শেষ করবার পর ক্ষুদিরাম সেই অলৌকিক স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই শ্রীপাদপদ্মের সামনে তিনি যেন পুনরায় পিণ্ডদান করছেন, আর তাঁর পূর্বপুরুষেরা এসেছেন সেই পিণ্ড গ্রহণ করতে। এমন সময়ে এক নবদূর্বাদলশ্যাম জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি, এবারে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে তোমার সেবা গ্রহণ করব।

আনন্দে ও বিষাদে কেঁদে ক্ষুদিরাম বললেন, না না প্রভু, তার দরকার নেই। আমি দরিদ্র, আপনার সেবা আমি করতে পারব না।

সেই দিব্যপুরুষ বললেন, ভয় নেই ক্ষুদিরাম, তোমার সামান্য সেবাই আমি তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করব।

আনন্দ ও বেদনায় ক্ষুদিরাম এ কথার জবাব দিতে পারেন নি। তারপরেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আমাকে জাগিয়েছিল শীলা, বলেছিল: ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি!

গয়া স্টেশন থেকে বুদ্ধগয়া সাত মাইল পথ। যান বাহনের কোন অভাব নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে সাইকেল রিক্স একা টাঙ্গা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে, সরকারী বাসও যাতায়াত করে। সাইকেল রিক্স যাতায়াত করে সাড়ে তিন টাকা চার টাকায়, কিন্তু ট্যাক্সি পনর-ষোল টাকার কমে যেতে চায় না। বাসের ভাড়া আট আনা, বুদ্ধ গয়ায় নামিয়ে দিয়েই ফিরে আসে। বাসে ফিরতে হলে পরের বাসে ফিরতে হয়।

পথঘাট খুব সুন্দর। যে পথে আমরা যাচ্ছিলুম তা ফল্গু নদীর ধারে ধারে গেছে। গাছপালা ও পরিবেশ দেখে মন ভরে যায়। ড্রাইভারের কাছে শুনলুম যে আরও একটা পথ আছে, সেটা খুবই প্রশস্ত, খানিকটা তফাতে সেটা, বাঁ দিকে ঘুরে বুদ্ধগয়ায় আসতে হয়। পথ দীর্ঘতর হলেও যানবাহন কম চলে বলে সময় কম লাগে।

গয়া ও বুদ্ধগয়ায় বাসস্থানের অভাব নেই। স্টেশনে রিটায়ারিং রূম আছে, শহরে আছে সার্কিট হাউস। অনেকগুলো ধর্মশালা আছে ঝুনঝুনওয়ালার, স্টেশনের কাছে আছে, মন্দিরের কাছে আছে, প্রেত শিলা পাহাড়েও আছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘেও যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও পাণ্ডার বাড়ি ও দিশী হোটেল তো আছেই। বুদ্ধগয়ায় থাকবার জায়গাগুলি অন্য ধরনের। সরকারী রেস্ট হাউস ও ডর্মিটরি আছে, পি-ডব্লু-ডি রেস্ট হাউস আছে। তা ছাড়া আছে মহাবোধি রেস্ট হাউস বার্মিজ রেস্ট হাউস চাইনিজ রেস্ট হাউস টিবেটান রেস্ট হাউস ও জৈন রেস্ট হাউস। বেনারসের যাত্রী যেমন সারনাথ দেখে ফেরে, তেমনি গয়ার যাত্রী

বুদ্ধগয়া না দেখে ফেরে না। পাণ্ডারা নাকি বুদ্ধগয়াতেও পিণ্ড দিতে বলে।

যে নদীর ধারে বুদ্ধগয়া তার নাম শুনেছি নৈরঞ্জনা। দু আড়াই মাইল দূরে ফল্গুর সঙ্গে মিলেছে। বুদ্ধগয়ায় নৈরঞ্জনা নদী আমি দেখি নি, ভুলে গিয়েছিলুম এই নদীর কথা। ছায়াশীতল আম-বাগানের ধার দিয়ে যাবার সময় এই নদীর কথা মনে ছিল, মনে ছিল না বুদ্ধগয়ায় পৌঁছবার পরে। এক রকমের বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম।

বুদ্ধগয়ার মন্দিরের ছবি আমি অনেক জায়গায় দেখেছি। বড় বড় গাছের আড়ালে একটি অপরূপ সুন্দর মন্দির। আমি ভেবেছিলুম যে একটা বনময় পরিবেশের মধ্যে এই মন্দিরটি দেখতে পাব, একটি পরিত্যক্ত মন্দির। কিন্তু যা দেখলুম তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। আমরা যেন ছোটখাট একটা শহরে পৌঁছে গেলুম। ঘর বাড়ি বাজার হাট থানা পোস্ট অফিস্ সব আছে। একটি ছোট শহর। ছোট ছোট দোকান পাটে কেনা বেচা চলছে, রিক্স দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো, লোকজন কোলাহলে কোন অরণ্যের চিহ্ন দেখতে পেলুম না। আমাদের গাড়ি একটু উঁচুতে উঠে কয়েকটা গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। সেখানেও ছোট ছোট দোকান, চা কফির জন্যে যাত্রীদের তারা ডাকছে।

মিস্টার বোস বললেন: এক এক পেয়ালা কফি বোধহয় মন্দ লাগবে না, কী বল ব্রাদার!

শীলার দিদি বললেন: বড় নোংরা যে!

মিস্টার বোস তখন এগিয়ে গিয়ে কফির অর্ডার দিয়ে ফেলেছেন।

আমি গিয়েছিলুম রাস্তার অন্য ধারে। এই ধারেই বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত মহাবোধি মন্দির। কিন্তু ঠিক পথের উপরেই নয়, অনেক-গুলো সিঁড়ি নেমে একটা বিরাট সমতল প্রাঙ্গণে পৌঁছতে হবে।

তার ভিতর শুধু এই মন্দিরটিই নয়, আরও অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে। এক ধারে যে সুন্দর ক্ষুদ্র মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে, তার নাম শুনেছি অনিমেষ-লোচন মন্দির। এই মন্দিরটি খানিকটা উঁচুতে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। মহাবোধি মন্দিরের এ ধারটায় অনেকগুলি স্তূপ, নানা আকার ও আকৃতির। অন্য ধারে বোধিদ্রুমের শাখা দেখতে পাচ্ছি।

কেন জানি না পিরামিডের কথা আমার মনে এল। এই মন্দিরের আকারের সঙ্গে কি পিরামিডের কোন সাদৃশ্য আছে! এই রকমের চতুষ্কোণ মন্দির বুঝি আর কোথাও দেখি নি। নিচের চারিধার বোধহয় সমান মাপের, ক্রমেই সূক্ষ্ম হয়ে উপরে উঠেছে, মিলেছে একটা বিন্দুতে। পিরামিডও বোধহয় এই রকম। কিন্তু দেখতে থ্যাবড়া। উচ্চতায় একটা ধারের চেয়ে বেশি নয় বলেই থ্যাবড়া দেখায়। কিন্তু এই মন্দির সূক্ষ্ম হয়ে যেন আকাশ স্পর্শ করেছে। চারি দিকে একই ভিত্তির উপরে ছোট ছোট আর চারিটি শিখর একই আকৃতির। পিরামিডের গায়ে কোন কারুকার্য নেই, কিন্তু এই মন্দিরে এক রকমের অদ্ভুত কারুকার্য। উড়িষ্যার মতো নয়, দক্ষিণ ভারতের মতোও নয়, খাজুরাহোর সঙ্গেও মেলে না। সে সব মন্দিরে নানা রকমের মূর্তি ও লতাপাতা ক্ষোদিত, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটি কারুকার্য দেখতে হয়। এখানে যেন জ্যামিতির নক্সা, নিচে থেকে উপর পর্যন্ত একই রকম। উঁচু নিচু বলে স্থানে স্থানে আলো পড়ে নি, যে ধারটায় রোদ পড়েছে আলোছায়ায় তা ঝকমক করছে।

মিস্টার বোস আমাকে ডাকলেন, বললেনঃ কফিটা খেয়ে যান।

পিছন ফিরে আমি দেখলুম যে পেয়ালা হাতে তিনি আমার দিকেই আসছেন। লজ্জিত ভাবে আমি এগিয়ে গেলুম।

শীলার দিদি বললেনঃ অনেক দিন আগে একবার এইখানে

এসেছিলাম। একটা পুকুরের ধারে পিকনিক করেছিলাম বলে মনে পড়ছে।

মিস্টার বোস কৌতুক করে বললেন : তোমার স্মরণশক্তি খুবই প্রখর। সে পুকুরের নাম লোটাস ট্যাঙ্ক, এই মন্দিরের ঠিক পিছনেই দেখতে পাবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি আরও অনেক কিছু দেখতে লাগলুম। পথ এখানে শেষ হয়ে যায় নি, সামনের দিকে এগিয়ে ঘুরে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। পথের ধারে ধারে আরও অনেক ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সেগুলি নিশ্চয়ই বাসগৃহ নয়, মন্দির বা তার সংলগ্ন ধর্মশালা বা রেস্ট হাউস হবে। অনেক কিছু দেখবার আছে বলে কফি শেষ করতে আমাদের দেরি হল না।

তারপরে আমরা রাস্তা পেরিয়ে ধাপে ধাপে নেমে এলুম মহাবোধি মন্দিরের মস্ত প্রাঙ্গণে। মাঝখান দিয়ে বাঁধানো পথ মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। বামের উঁচু জমির উপরে অনিমেষ-লোচন মন্দির। কিন্তু সরাসরি ওঠা যায় না, বাঁ হাতের অন্য পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ি আছে। আমরা প্রথমে মূল মন্দিরটি দেখবার জন্যে সোজা এসে দরজায় দাঁড়ালুম। মন্দিরের দ্বার খোলা ছিল, জুতো খুলে আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লুম।

গেরুয়া পরিহিত একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী একপাশে একখানা চেয়ারে বসে ছিলেন, তাঁর সামনে একখানা কাঠের টেবিল। সন্ন্যাসী মনোযোগ দিয়ে কিছু পড়ছিলেন, কিন্তু আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন।

কয়েক পা এগিয়েই আমরা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। মন্দিরের গর্ভগৃহে বিরাট বুদ্ধমূর্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় স্থাপিত। কিন্তু তারই সামনে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করে গেছেন কোন পুরোহিত ব্রাহ্মণ। মহাবোধি মন্দিরে শিবের পূজা দেখেই আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম।

শীলার দিদি তাঁর কৌতূহল প্রকাশ করে ফেললেন, বললেন ঃ এ কী রকম ব্যাপার গোপালবাবু ?

আমি দু পা পিছিয়ে এসে সন্ন্যাসীকে নমস্কার করলুম। তিনি আমাদের বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পেরেছিলেন। ইংরেজীতে আমাদের সব বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা মন্দিরের ইতিহাস জানলুম। এখন এই মন্দির আছে হিন্দু ও বৌদ্ধদের যুক্ত তত্ত্বাবধানে। সন্ন্যাসী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এখানে আসবার পথে বুদ্ধগয়ার মোহান্তের গদি দেখেন নি ?

বললুম ঃ না।

সন্ন্যাসী বললেন ঃ তাঁরা বলেন যে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য এই গদি স্থাপন করেছিলেন।

শঙ্করাচার্যের সংঘর্ষ হয়েছিল বৌদ্ধবাদের সঙ্গে। ভারতবর্ষের সর্বত্র তিনি বৌদ্ধদের পরাজিত করে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এখানেও তিনি এসেছিলেন ও বৌদ্ধ তীর্থে হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এ কথা অবিশ্বাস করার মতো যুক্তি নেই। কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে এ আলোচনা অপ্রীতিকর হবে মনে করে আমি বুদ্ধদেব সম্বন্ধেই কিছু বলবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলুম।

সন্ন্যাসী বললেন ঃ মন্দিরের পিছনে বোধিদ্রুম দেখেছেন ?

আমি বললুম ঃ এখনও ওদিকে যাই নি।

সন্ন্যাসী বললেন ঃ সম্রাট অশোক যখন মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন, তখন তিনি বুদ্ধভক্ত ছিলেন না, বরং একটা হিংসার ভাব মনে পোষণ করতেন। তিনি শুনেছিলেন যে এইখানে একটি পিপুল গাছের নিচে তপস্যা করে গৌতম বুদ্ধ হয়েছেন, মানে যে জ্ঞানের জন্য গৌতম নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন তা পেয়েছেন এইখানে ঐ বোধিদ্রুমের নিচে। অশোক ভাবলেন যে ঐ গাছটিই ধ্বংস করতে হবে। লোকজন সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি এখানে এসে দেখলেন যে শুধু একটি গাছ আছে এখানে, আর কিছু নেই।

সেই গাছটি গোড়া থেকে টুকরো টুকরো করে কেটে এক জায়গায় স্তূপাকৃতি করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! কাছে দাঁড়িয়ে অশোক নিজের চোখে দেখলেন যে সেই আগুনের ভিতর থেকে দুটি কচি পিপুল গাছের জন্ম হচ্ছে। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অনুতাপে অশোক প্রায়শ্চিত্ত করলেন। যে বজ্রাসনে বসে বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন তারই উপবে একটি সুন্দর মন্দিব নির্মাণ করে দিলেন। তার আগে—

ইতিহাসে আমি একথা পড়ি নি। তাই সাগ্রহে বললুম: বলুন।

সন্ন্যাসী বললেন: অশোক সহসা এখান থেকে ফিরে যেতে পারেন নি। রাজকার্য ফেলে তিনি এখানে শিশুবৃক্ষের পরিচর্যায় লেগে রইলেন। তাঁব বানী দেখলেন বিপদ। তিনি তাঁর এক সখীকে বললেন নতুন গাছটিও কেটে ফেলতে। গাছটি কাটা হল, কিন্তু পুনরায় তা বেঁচে উঠল।

শীলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল: এ কি সত্য ঘটনা গোপালবাবু?

সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই বাঙলা বোঝেন। সহাস্যে উত্তব দিলেন ইংরেজীতে: এ আমার নিজের কথা নয়, সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন চাঙ লিখে গেছেন এই কথা। অশোক অবদান নামে আর একটি গ্রন্থে অশোকের বানীর কথা আছে। আর আছে এখানে একটি চৈত্য নির্মাণের কথা। উপগুপ্তের কাছে দীক্ষা নেবার পর অশোক একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন এখানকার চৈত্য নির্মাণের জন্য। আর দশ ফুট উঁচু একটা দেওয়াল দিয়ে এই গাছটি ঘিরে দিয়েছিলেন। হিউএন চাঙ এসে এই দেওয়ালটি দেখতে পেয়েছিলেন। আর এই বোধিদ্রুমটিও দেখেছিলেন চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু। তার আগে বাঙলার রাজা শশাঙ্ক এসে গাছটি আবার গোড়া থেকে কেটেছিলেন, আর মগধের রাজা পূর্ণবর্মা এই দুর্দশা দেখে দুঃখ করেছিলেন।

গাছের গোড়ায় তিনি একহাজার গরুর দুধ ঢেলেছিলেন, তার ফলে এক রাতেই গাছ দশ ফুট বেড়ে ওঠে। পূর্ণবর্মা তার পরে এই গাছের চারি দিকে চব্বিশ ফুট উঁচু একটা দেওয়াল তুলে দেন।

এ সব অলৌকিক ঘটনা সকলের বিশ্বাস হয় না, তাই আমি একটি সরল প্রশ্ন করলুম: আপনি কি মনে করেন যে সেই প্রাচীন গাছটিই আজও বেঁচে আছে?

সন্ন্যাসী সরল ভাবে এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না, বললেন: তার তো সাক্ষী কেউ নেই। তবে মনে হয় যে সেই প্রাচীন গাছেরই চারা একই জায়গায় গজিয়েছে।

তারপরে একটি ঐতিহাসিক কথা শোনালেন: অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা এই গাছেরই চারা নিয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন। সেই গাছ আজও আছে সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুরে। তাব বয়স হয়েছে দুহাজার বছরের বেশি। সে গাছের চারাও আমবা এখানে এনেছি।

শীলার দিদি বললেন: এই মন্দিরের ভিতর শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা কবে হল সেই কথা জেনে নিন না।

সন্ন্যাসী বললেন: এ কথা জানতে হলে ইতিহাসের কথা কিছু জানতে হবে। আজ যে মন্দির আমরা দেখছি এ নিশ্চয়ই অশোকের তৈরি মন্দির নয়। এ মন্দির অন্য কেউ তৈরি করেছেন, এবং এর বয়স তেরশো বছর বলে অনেকে অনুমান করেন। তাব মানে হিউএন চাঙ এসে এই মন্দিরই দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনাব সঙ্গে অনেক কিছুই মিলে যায়। পঞ্চাশ ফুট ভিত্তির উপরে একশো ষাট থেকে সত্তর ফুট উঁচু বলে তিনি লিখেছিলেন। অনিমেষ-লোচন মন্দিরের কথাও তাঁর লেখায় আছে। সে সময়ে ঐ মন্দিরে দশফুট উঁচু দুটি রূপোর মূর্তি ছিল—একটি অবলোকিতেশ্বরের, অন্যটি মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের। আর একটি ঘটনার কথা আমরা তাঁর লেখায় পাই। সেটি হচ্ছে ফল্গুর বন্যার কথা। সেই বন্যার জলে বালি

এসে এই মন্দির প্রাঙ্গণ আড়াই ফুট উঁচু হয়েছিল এবং বজ্রাসনটি ঢেকে গিয়েছিল বালির নিচে।

সন্ন্যাসী একটু থেমে বললেন ঃ মনে হয় যে এর দুশো বছর পরে রাজা ধর্মপালের সময়ে এই মন্দিরে শিবের প্রতিষ্ঠা হয়, চতুর্মুখ শিব। এই মন্দিরের নামে জায়গার নামও বোধহয় তখন মহাবোধি ছিল। কানিংহাম সাহেব তাই এই জায়গাকে বোধি-গয়া বলেছেন।

এই গল্প শীলার ভাল লাগছিল না, জিজ্ঞাসা করল ঃ ঐ যে দু ধারে সিঁড়ি দেখছি, ওকি ওপরে যাবার জন্যে ?

সন্ন্যাসী সংক্ষেপে বললেন ঃ হ্যাঁ।

শীলা আর দেরি করল না, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অন্য সকলেও এগিয়ে গেলেন তার পিছনে। আমি কিন্তু সন্ন্যাসীকে ছেড়ে যেতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম ঃ তারপর ?

সন্ন্যাসী বললেন ঃ ওপরটা আপনি দেখবেন না ?

বললুম ঃ পরে দেখব

খুশী হয়ে সন্ন্যাসী বললেন ঃ আমার কী মনে হয় জানেন! ফল্গুর বালিতে এই গোটা মন্দিরটা দীর্ঘ দিন ঢাকা ছিল! সমস্ত এলাকাটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বালি সরিয়ে এই মন্দির এখন বার করা হয়েছে, তাই চারিদিকের রাস্তা পথঘাট এখনও উঁচু।

আমি চিন্তিত ভাবে বললুম ঃ তাই কি!

সন্ন্যাসী বললেন ঃ কেন সন্দেহ হচ্ছে বলুন তো!

আমি বললুম ঃ অনিমেষ-লোচন মন্দিরটি তো অনেক উঁচুতে।

সন্ন্যাসী বললেন ঃ তা বটে। কিন্তু হিউএন চাঙ ওটাকে দোতলা মন্দির বলেছেন। এখন আমরা একতলাই দেখতে পাচ্ছি।

মাটি খুঁড়লে আর এক তলা পাওয়া যাবে এ কথা আমার বিশ্বাস হল না। তবু আমি সন্ন্যাসীর কাছে আরও কিছু ঐতিহাসিক কথা জেনে নিলুম।

ব্রহ্ম দেশের রাজারা এই মন্দিরের অনেক সংস্কার ও উন্নতি বিধান করেছেন। প্রথম রাজার নাম পাওয়া যায় রাজা সাডোর, বর্মী ভাষায় থাডো মেঙ্গ। ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। তারপর বাঙলার রাজা শশাঙ্ক এই মন্দিরের ক্ষতি করবার পর একাদশ শতাব্দীতে আবার তাঁরা সংস্কার করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে শিবালিক বা কুমায়ুনের রাজা অশোকবল্লও মন্দিরের সংস্কার করেন।

মুসলমান আমলে এই মন্দির বোধহয় সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয়। তার জন্যেই আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে লিখেছেন, গয়া হিন্দুর তীর্থ, হিন্দুরা একে ব্রহ্ম গয়া বলে।

বর্মীরা কিন্তু এই মন্দিরের আশা কোন দিনও ছেড়ে দেয় নি। গত শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রহ্মরাজ আবার তাঁর লোকজন পাঠিয়েছিলেন এই মন্দিরটি উদ্ধারের জন্য। তাঁরা এসে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন, কানিংহাম সাহেবও আগে কিছু চেষ্টা করিয়েছিলেন। এর দু বছর পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখলেন বুদ্ধগয়ার উপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। সবার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। কানিংহাম সাহেব নিজে এসে বই লিখলেন, তারপরেই অবিভক্ত বাঙলার ছোট লাট এই মন্দির খুঁড়ে বার করবার দায়িত্ব নিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ বৌদ্ধদের নিকট একটি স্মরণীয় বৎসর। আজ আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, মাটির নিচে থেকে সেদিন সব উদ্ধার করা হয়েছে।

শীলারা উপর থেকে নেমে আসছিল। তাই দেখে আমি বললুম: ওপরটা আমি এবারে দেখে আসি।

সন্ন্যাসী বললেন: আসুন।

৩৬

দেখবার মতো উপরে কিছু ছিল না। চারিধার ঘিরে একটা খোলা বারান্দা। মন্দিরের চূড়া উঠেছে সেখান থেকেই। স্থাপত্য-শিল্পের সামান্য নমুনা তাড়াতাড়ি দেখেই নিচে নেমে এলুম। অনিমেষরা তখন মন্দিরেব বাহিরে বেরিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সন্ন্যাসীকে আমি বললুম ঃ এখানকার দ্রষ্টব্যগুলি আপনি দেখিয়ে দেবেন না ?

আমি !

প্রথমটায় তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন, তারপরে বেরিয়ে এলেন। বললেন ঃ মন্দিরের সামনে ঐ তোরণটি দেখুন। কারুকার্য দেখবেন—মৃগ সিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট মূর্তি। এটি খুবই প্রাচীন তোরণ বলে পরিচিত—চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর।

তারপরে আমরা উত্তর দিকে চলে এলুম। ছোট বড় নানা রকমের স্তূপ এই দিকে। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের স্মৃতির জন্য রাজা ও ধনীরা এইসব নির্মাণ করে দিয়েছেন। বালি ও কালো পাথরের স্তূপগুলি নানা আকার ও আকৃতির। হাজার দু হাজার বছরের পুরনো এই স্মৃতিচিহ্নগুলি এখনও সুন্দর আছে। এরই মধ্যে রত্নাগর নামে একটি ছোট মন্দিরের ছাদ নেই। সন্ন্যাসী বললেন ঃ বুদ্ধ এখানে সাত দিন তপস্যারত ছিলেন এবং সেই সময় তাঁর শরীর থেকে নীল হলদে লাল সাদা ও কমলালেবুর রঙ বার হত। তাইতেই এদেশের ও সিংহলের বৌদ্ধ পতাকায় এই রঙগুলি দেখতে পাবেন।

মূল মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালে আমরা আর একটি

প্ল্যাটফর্ম দেখেছিলুম, তার নাম চংক্রমণ পথ। এটি তিন ফুট উঁচু আর লম্বায় ষাট ফুট। বুদ্ধ এর উপরে সাত দিন সাত রাত পায়চারি করেছিলেন। তাঁর পায়ের ছাপে পথ আঁকা আছে।

তারপরে আমরা পশ্চিম দিকে চলে এলুম। বিখ্যাত বোধিদ্রুমটি এই দিকেই। বিশাল বৃক্ষ, পুরাকালের পবিত্র প্রহরী আজও নিঃশব্দে ছায়া বিস্তার করে এক মহৎ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। এরই নিচে বুদ্ধের বজ্রাসন, এই বজ্রাসনে বসে তপস্যা আরম্ভ করবার আগে বুদ্ধ বলেছিলেন, ইন্দ্রিয়ের জাল ধ্বংস করবার সময় এসেছে। এই দেহ শুকিয়ে অস্থি মাংস ত্বক মিলিয়ে যাক, বুদ্ধত্ব লাভ না করে আমি এই আসন ত্যাগ করব না।

বুদ্ধ বসেছিলেন পূর্ব দিকে মুখ করে, তাঁর পিঠ ছিল এই গাছেব দিকে। বুদ্ধ হবার আগে তিনি সত্যিই ওঠেন নি। তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তার জন্যই লোক এই আসনের নাম দিয়েছে বজ্রাসন, সাহেবরা বলে ডায়মণ্ড থ্রোন।

দেওয়ালের গায়ে আমরা বুদ্ধের পদ্মাসীন মূর্তি দেখলুম, দেখলুম বজ্রাসন দেবীর মূর্তি। আরও নানা মূর্তি ও কারুকার্য দেখে আমরা উত্তর দিকে এগিয়ে গেলুম।

এ ধারটা ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার নয়। এ ধারের প্রধান দ্রষ্টব্য হল প্রাচীন প্রাচীর। যে প্রাচীর সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন, এ বোধহয় তারই ধ্বংসাবশেষ। প্রস্তর স্তম্ভগুলি সংগ্রহ করে নতুন করে গেঁথে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একে প্রাচীর বলা সঙ্গত হবে না, ইংরেজী রেলিং শব্দটি ব্যবহার করলে বুঝতে সুবিধা হবে। পাথরের উপরে নানা রকমের কারুকার্য আছে—ফুল লতাপাতা পশুপক্ষী অবাস্তব প্রাণী ও বাস্তব জীবনের চিত্র। এই সব কারুকার্য খুবই প্রাচীন বলে স্বীকৃত, সুঙ্গ রাজাদের সময়কার বলে অনেকে মনে করেন।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা আরও দক্ষিণে যাবার পথ

পেলুম। সুন্দর বাগানের মধ্য দিয়ে পথ গেছে কমল সরোবরের দিকে। চতুষ্কোণ পুষ্করিণী এটি, বুদ্ধদেব এখানে স্নান করতেন বলে জনশ্রুতি। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে আরও একটি সরোবর আছে, তার নাম মুচলিন্দ লেক। বুদ্ধের তপস্যার সময় যখন ঝড় ও শিলাবৃষ্টি নেমেছিল, তখন নাগরাজ মুচলিন্দ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

সেখান থেকে ফিরে আমরা মন্দিরের পূর্ব দিকে চলে এলুম। সন্ন্যাসী আমাদের কখন ছেড়ে গিয়েছিলেন দেখতে পাই নি। এবারে আমরা নিজেরাই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। এক সময়ে অনিমেষ-লোচন মন্দিরে উঠবার সিঁড়ি দেখতে পেয়ে উপরে উঠে গেলুম। ছোট মন্দির, মহাবোধি মন্দিরের মতোই তার বাহিরের কারুকার্য। আলোয় উদ্ভাসিত অপরূপ সুন্দর মন্দির।

শীলা প্রশ্ন করল: এ মন্দিরের নাম অনিমেষ-লোচন কেন হল?

মিস্টার বোস আমার মুখের দিকে তাকালেন।

সন্ন্যাসী নেই, কাজেই উত্তর দিতে হল আমাকেই। বললুম: বুদ্ধ হবার পর সিদ্ধার্থ এসে এইখানে দাঁড়িয়েছিলেন, আর অনিমেষ লোচনে তাকিয়েছিলেন বোধিদ্রুমের দিকে। যে গাছের নিচে বসে তিনি বুদ্ধ হলেন সেই গাছটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলেন না, চোখের পলকও পড়ছিল না। ভক্তরা তাই এইখানে এই ছোট মন্দিরটি নির্মাণ করে সেই সামান্য ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন।

সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ ঝক ঝক তক তক করছে। ফুল ও পাতার গাছে অপরূপ হয়ে আছে পরিবেশ। শীলার দিদি বললেন: আর কী দেখবার আছে?

বললুম: আমি জানি নে।

মিস্টার বোস বললেন: আমিও ভুলে গেছি।

একজন বাঙালী যাত্রী পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন: এই পথ ধরে এগিয়ে যান, সামনে সাধুদের সমাধি ক্ষেত্র দেখতে পাবেন।

পূর্ব দিকেই আমরা এগিয়ে গেলুম। মন্দির এলাকার বাহিরে এই সমাধি ক্ষেত্র। এখানে নানা আকারের সমাধি সৌধ—ছায়াচ্ছন্ন গম্ভীর নিরানন্দ। সংকীর্ণ পথ ধরে জন কয়েক যাত্রী ফিরছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন করে জানলুম যে এই স্থানটি মোহান্তের অধীন, শঙ্করাচার্যদের সমাধি স্থান বলে পরিচিত।

ভিতরে না গিয়ে আমরা বাহিরে বেরিয়ে এলুম। রাস্তায় ফিরে এসে আমরা গাড়িতে উঠলুম। আরও অনেক কিছু এখানে দেখবার আছে, বেলাও হয়েছে অনেক। কাজেই বাকি দর্শনীয় স্থানগুলি আমাদের তাড়াতাড়ি দেখতে হবে।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি এখান থেকে দূরে নয়। সবচেয়ে কাছে হল তিব্বতী মন্দির। কোন যান বাহনে যাবার দরকার নেই, হেঁটেই এই পথটুকু অতিক্রম করতে ভাল লাগে। মোটরে চেপে আমরা একেবারে মন্দিরের দরজায় এসে নামলুম।

মন্দির ও ধর্মশালা একই সঙ্গে। দোতলা মন্দির। নিচে ধর্মচক্র, উপরে উপাসনার গৃহ। ধর্মচক্র আমাদের চোখে নতুন। বিরাট একটি পিতলের ঢাক উপুড় করা আছে একটি দণ্ডের উপরে। এটি ঘোরাবার নিয়ম, পুণ্য হয় তাতে। একজনেই ঘোরানো যায়, কিন্তু প্রথমটায় খুবই জোর লাগে। একবার ঘুরলে সহজেই ঘোরানো যায়। যে তিব্বতী লামা এই ঘরের তত্ত্বাবধানে আছেন, তিনি বললেন যে এই ধর্মচক্রের অনেক মণ ওজন। উপরে উঠে আমরা উপাসনার ঘরটিও দেখে এলুম।

এর পরে চীনা ও বর্মী মন্দির দেখে নিলুম। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। দেখলুম থাই মন্দিরটিও। এটি নূতন হয়েছে, নূতন ধরন। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। তারপরে আছে রেস্ট হাউস আর ডর্মিটরি। এই সড়কটিই নাকি অনেক দূর গিয়ে বড় রাস্তায়

পড়েছে। ডান হাতে গয়া শহরে যাবার দ্বিতীয় পথ, বাম হাতে কিছু দূর এগিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

ফেরার পথে আমরা যাদুঘরটি দেখলুম। ছোট যাদুঘর, কিছু মূর্তি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছেই হয়তো এর আদর, আমাদের মতো সাধারণ যাত্রী এক নজরে দেখেই বেরিয়ে আসবে। বেলা অনেক হয়েছিল। শীলার দিদি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। গাড়িতে বসেই বললেন: এত বেলায় কিছু খেতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

এই আশঙ্কার কথা শুনে মিস্টার বোস হাসলেন, বললেন: সত্যি তো, খাবার কথা আমাদের একেবারেই মনে ছিল না।

যে রকম গম্ভীর ভাবে ভদ্রলোক এ কথা বললেন তাতে বুঝতে কষ্ট হল না যে তিনি কোন ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন। অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বললেন: বুঝলে ব্রাদার, আমাদের বদনাম কোন দিন ঘুচবে না।

আমি বললুম: সুনামের জন্য সংসার ছাড়তে হয়।

শীলা হেসে উঠল, বলল: সেই জন্যেই আপনি বুঝি সংসার করেন নি!

আমিও হেসে বললুম: একটু ভুল হল। সংসার না করলে কেউ জানতে পারে না, সংসার ছাড়লে জানে সবাই। আমাদের মহাপুরুষদের কথা জানেন তো! সবাই সংসার ত্যাগ করে মহাপুরুষ হয়েছেন।

মিস্টার বোস বললেন: আমাদের কি আপনি সংসার ত্যাগ করতে বলছেন?

শীলার দিদি বললেন: সে বড় কঠিন কাজ ভাই, সবাই পারে না।

সাধারণ মানুষ সত্যিই পারে না, পারে মহাপুরুষে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ পেরেছিলেন। সংসারে বীতরাগ হয়ে নয়, সংসারের প্রয়োজনেই তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন।

প্রজ্ঞা লাভের জন্য তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে গেছেন, এক গুরুর কাছ থেকে আর এক গুরুর কাছেই উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু যা জানতে বেরিয়েছেন তার সন্ধান পান নি। নিজের রাজ্য থেকে এসেছিলেন বৈশালী, বৈশালী থেকে রাজগৃহ, রাজগৃহ থেকে উরুবিল্ব। উরুবিল্ব এই বুদ্ধগয়ারই প্রাচীন নাম।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বুদ্ধ কোনোদিন উপেক্ষা করতে পারেন নি। এই সুন্দর শ্যামল দেশে এসে তিনি দাঁড়ালেন, দেখলেন দুটি ছোট ছোট নদী, নাম মোহনা ও লীলাজন, দুইএ মিলে ফল্গু নামে প্রবাহিত হয়েছে। নৈরঞ্জনারই নাম ছিল লীলাজন। এই নদীতে স্নান করেই তিনি তাঁর ভিক্ষাপাত্র জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন যে প্রজ্ঞালাভ যদি তাঁর ভাগ্যে থাকে তো ঐ ভিক্ষাপাত্র যেন উজান স্রোতে এগিয়ে যায়। সত্যিই তাই হয়েছিল। সানন্দে তিনি তাঁর অনুচরদের বলেছিলেন, বন্ধুগণ, সত্যিই এটি বড় রমণীয় স্থান, তপস্যার জন্য আমরা এইখানেই বাস করব।

বুদ্ধ এই গ্রামে ছ বৎসর বাস করেছিলেন। উপবাসে কৃচ্ছ্র সাধনে ও তপস্যায় তাঁর দেহ এমন শীর্ণ ও দুর্বল হয়েছিল যে একদিন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই পড়ে গেলেন। এই খবর গেল গ্রাম-প্রধানের কন্যা সুজাতার কানে। বুদ্ধকে সুজাতা ভক্তি করত এবং এই সর্বত্যাগী পুরুষকে কিছু খাওয়াবার বাসনা ছিল তার অনেক দিনের। সেদিন সুজাতা পায়স রেঁধেছিল, তাই এক বাটি নিয়ে সে এল বুদ্ধের কাছে। বুদ্ধ তা গ্রহণ করেছিলেন।

তারপরে তিনি শেষ তপস্যায় বসলেন। বোধিদ্রুমের নিচে বজ্রাসনের উপরে এক মুঠো ঘাস বিছিয়ে পূর্বমুখে তিনি বসলেন। নিজের কথা মানুষের কথা পৃথিবীর কথা তিনি ভুলে গেলেন। তাঁর মনে রইল শুধু একটি কথা—কেমন করে এই জগতের দুঃখ দূর হবে। তাঁর সংকল্পের কথাও আমার মনে পড়ল—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে" ॥

এইখানে আমার শরীর শুকিয়ে অস্থিমাংস ত্বক মিলিয়ে যাক। বুদ্ধত্ব লাভ না করে আমি এই আসন ত্যাগ করব না।

তাঁর তপোভঙ্গের জন্য মারের চেষ্টার কথা বুদ্ধচরিতে লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থে মার শয়তানেব মতো। অনেক চেষ্টা সে করেছিল, অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত নিজের তিন কন্যা রতি তৃষ্ণা আরতিকে নিয়োগ করেছিল বিভ্রম ঘটাতে। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর সংকল্পে অটল ছিলেন, নির্ভয়ে নির্ভীক চিত্তে তিনি সকল বিঘ্ন জয় করলেন।

রাত্রি প্রথম প্রহবে তিনি পূর্ব জন্মেব কথা জানলেন, দ্বিতীয় প্রহরে তাঁর দিব্য চক্ষু লাভ হল, তৃতীয় প্রহরে তিনি কার্য কারণের বিষয় অবগত হলেন ও শেষ প্রহবে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান হল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ হলেন বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ। বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল নেপালে, বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হল বিহারে বুদ্ধগয়ায়।

৩৭

বিকেল পাঁচটার ট্রেনে সবাই পাটনায় ফিরে যাবেন, আমি কাল ভোরের ট্রেনে যাব বারাণসী। মিস্টার বোস আমাকে পাটনায় যাবার জন্য জোর করেছিলেন, বলেছিলেন কাল ভোরে পাঞ্জাব মেল ধরবেন।

আমি বলেছিলুম: আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, বিদায় এখানেই দিন।

তাঁদের ট্রেন ছাড়তে বেশি দেরি ছিল না। তবু সবাই আমার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলেন। সহসা শীলার দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল, দু চোখ তার বেদনায় থমথম করছে। আমি তাকাতেই সে প্রশ্ন করল: আজ রাতে আপনি কোথায় থাকবেন?

আমি!

নিঃশব্দে শীলা আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হল যে তার দৃষ্টি এখন বর্ষার মেঘের মতো সজল। এ কি সেই শীলা! অনেক দিন আগের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেদিন অন্ধকার রাতে আমি তাদের মাইথনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম তারই কথা শুনে। সেদিন সে একবারও ভাবে নি, রাতে আমি কোথায় থাকব। আর অনিমেষ বোধহয় যন্ত্রণায় কেঁদেছিল। আজও সে কি শীলাকে ক্ষমা করতে পারে নি!

আমি আর দেরি করতে পারলুম না। হাত ধরে অনিমেষকে টেনে আনলুম এক ধারে। বললুম: তুই কি আজও আমাকে ক্ষমা করতে পারিস নি?

অনিমেষ বোকার মতো তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে, তারপর দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিল: তুই কি পাগল হয়েছিস!

কতক্ষণ সে আমাকে বুকে জড়িয়ে রেখেছিল বুঝতে পারি নি। যখন ছেড়ে দিল তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে শীলার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, কিন্তু মুখের হাসিটি হয়েছে আরও মিষ্টি।

সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

ভ্রমণের আনন্দ চিরন্তন—নতুন দেশ দেখার বাসনা একটা নেশার মতো। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের কাছে তো অপরিহার্য; যাঁরা ভ্রমণ না করেও ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁরাও রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর রম্যাণি বীক্ষ্যর পর্বগুলি পর পর পড়ে যান। ভ্রমণের শখ তাঁদের অনেকাংশে মিটবে।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, রম্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই কথা। আর বাস্তবিক, রম্য-দর্শনই হল রম্যাণি বীক্ষ্যর মূল সুর, তার বিস্তার অতীতের ঐতিহ্য আলোচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, পৌরাণিক কাহিনী ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। এতে সমগ্র ভারতের বিচিত্র দর্শনীয় স্থানগুলির সবিস্তার বর্ণনার সূত্র ধরে লেখক তাদের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট আলোকিত কুঠরীতেও যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তীর্থমাহাত্ম্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্যের বা সংশ্লিষ্ট তীর্থ ও জনপদের বর্তমান পরিচয় দানেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তার অতীত কাহিনী কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে বিবৃতি হয়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ—নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টির সমক্ষে।

শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। রম্যাণি বীক্ষ্যর একটিমাত্র খণ্ডও যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে এ বইয়ে ভ্রমণ-কাহিনীর পাশে পাশে একটি রম্য কাহিনীও গ্রথিত আছে। এই জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনী বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। এতে শুধু যে কাহিনীই

জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাই নয়, ভ্রমণের রসের ভিতর উপন্যাসের রসেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভ্রমণে যাঁরা ততটা উৎসাহী নন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাঁরা প্রাণরসের সন্ধানী, একমাত্র উপন্যাসের রসের আকর্ষণেই তাঁরাও যে রম্যাণি বীক্ষ্যর প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন তা অসংশয়ে বলা যায়। ভ্রমণরসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাসরসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী, মামী ও তাঁদের অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত। তাঁরা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ধরতে এসেছেন। স্টেশনে তাঁদের ভৃত্য নিখোঁজ, আর এই সময় প্লাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগ্‌নে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। কিন্তু পদ-মর্যাদা বা সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মাপকাঠিতে গোপালের বাজারদর যাই হোক, সঙ্গী হিসাবে তার মতো রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ও জ্ঞানান্বেষী যুবককে সঙ্গে পাওয়া আনন্দের কথা। মামা তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন আর গোপালও স্বাতির চোখের তারায় আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। ফলে সেও হল দক্ষিণ ভারতের যাত্রী।

প্রথম গ্রন্থ **দক্ষিণ ভারত পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ধরা দেবার মত সহজ পাত্রীও সে নয়। সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। মাদ্রাজে, মহাবল্লীপুর ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি ও রামেশ্বরে আমরা দুজনকে পাশাপাশি দেখি। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে এক অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **দ্রাবিড় পর্ব**। তাদের ঘরে ফেরার পালা। কেরালা রাজ্য থেকে মহিসুর রাজ্য। হালেবিদ বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে এল হায়দ্রাবাদ রাজ্যে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই দ্রাবিড় পর্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

• তারপর যখন যবনিকা উঠল তখন গোপালকে দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও

আগ্রা অঞ্চলে ভ্রমণরত দেখা গেল। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়। মামা অঘোর গোস্বামী গোপালকে গরিব জেনেও জামাই করতে পারতেন, কিন্তু মামীর তাতে গভীর আপত্তি। গোপালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজেদের ধনী মানী সমাজে মুখ দেখাতে তিনি ভয় পান।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি চতুর্থ গ্রন্থ **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লা থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা। গোপাল ও স্বাতির সম্পর্ক আগের মতোই সহজ রইল।

রাজস্থান থেকে সৌবাষ্ট্র। এই অঞ্চলের বিখ্যাত তীর্থস্থান দ্বারকা সোমনাথ ও জুনাগড়ের কথা **সৌরাষ্ট্র পর্বে** বিবৃত হয়েছে। একদা এই রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্যস্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি স্বাতিকে এরই হাত সমর্পণ করবেন বলে কৃত-সংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি, ষষ্ঠ গ্রন্থ **মহারাষ্ট্র পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুণা ভ্রমণে ব্যস্ত। তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা, মাণ্ডু, বিদিশা ও উজ্জয়িনী, ঝাঁসি সাঁচী খাজুরাহো, নাগপুর ও জব্বলপুর।

সপ্তম অষ্টম ও নবম গ্রন্থ **উৎকল মগধ ও উত্তর ভারত পর্বে** সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ। পুরীর সমুদ্রবেলায় ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল শূন্যতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। মগধ পর্বে শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে একসঙ্গে।

তারপরে আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। তারপর বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তারা বিবাহ করে সুখী হয়েছে। গোপালকে দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা। হিমালয়ের শৈলাবাস ও তীর্থস্থানগুলির পরিচয়ও আছে উত্তর ভারত পর্বে।

দশম গ্রন্থ **হিমাচল পর্বে** গোপাল আবার মামা-মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান।

অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীর গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ! শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। একদিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্যদিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে যাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রম্যাণি বীক্ষ্যর একাদশ গ্রন্থ **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা ববৃত হয়েছে।

দ্বাদশ গ্রন্থ **কামরূপ পর্বে** সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা নাগারাজ্য ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্প-পরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীর আশ্চর্য পরিচয়।

বাকী রইল বাঙলার কথা।

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক